বাবা সাহেব

ড: আম্বেদকর

রচনা-সম্ভার

বাবা সাহেব

ড. আম্বেদকর রচনা-সম্ভার

বাংলা সংস্করণ

অষ্টাদশ খণ্ড

বাবা সাহেব ড. আম্বেদকর

জন্ম : ১৪ এপ্রিল, ১৮৯১ মহা-পরিনির্বাণ : ৬ ডিসেম্বর, ১৯৫৬

'জাতীয় স্তরে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও ড. আম্বেদকরকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক-চিহ্ন বহন করতে হয়েছে। অস্পৃশ্যদের কিছু অভাব-অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য গঠিত সমিতির সদস্য হিসাবে তিনি খান্দেশ জেলার চালিশগাঁও গেলে স্থানীয় মাহার সম্প্রদায়ের মানুষরা তাঁকে স্বাগত জানায়। স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি টাঙায় করে মাহার বস্তি মাহারওয়াদার দিকে রওনা হন। কিছুদূর যাওয়ার পরেই টাঙাওয়ালার অপটু চালনার জন্য তিনি একটা সেতুর সামনে ফুটপাতের পাথরে ছিটকে পরে গুরুতর আহত হন। তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, অস্পৃশ্য একজনের পক্ষে টাঙা পাওয়া খুব-ই কঠিন এবং অন্য কোনও টাঙাওয়ালা টাঙা চালাতে রাজি না হওয়ায় একজন মাহার টাঙা চালাতে গেল—তার নেতার বিপদের সম্ভাবনার কথা না ভেবে।'

ড. ভীমরাও আম্বেদকর

'ড. বি. আর. আম্বেদকর : একটি জীবনী' থেকে

AMBEDKAR RACHANA - SAMBHAR
(Collected works of Dr. Ambedkar in Bengali)
Volume - 18
Total No. of Pages : 374

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০০০
First Published : December, 2000

প্রচ্ছদ : বিশ্বনাথ মিত্র

প্রকাশক :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক,
ভারত সরকার,
নতুন দিল্লি

Published by
Dr. Ambedkar Foundation.
Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India.
New Delhi.

লেজার টাইপ সেটিং এবং প্রিন্টিং
ইমেজ গ্রাফিক্স,
৬২/১, বিধান সরণি,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

দাম :
সাধারণ সংস্করণ : ৪০ টাকা (Rs. 40/-)
শোভন সংস্করণ : ১০০ টাকা (Rs. 100/-)

বিক্রয় কেন্দ্র :
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন,
২৫, অশোক রোড,
নতুন দিল্লি - ১১০ ০০১

পরিবেশক :
পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটি,
সি-এফ, ৩৪২, সেক্টর-১,
সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা ৭০০ ০৬৪

পরামর্শ পরিষদ

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার ঃ অষ্টাদশ খণ্ড

সংকলন : ইংরেজি ভাষায়

বসন্ত মুন

অনুবাদ : বাংলা ভাষায়

দেবাশিস সেনগুপ্ত

ড. সজল বসু

সন্তোষ দেবনাথ

সত্যজিৎ দত্ত

অনুমোদন : বাংলা ভাষায়

আশিস সান্যাল

মুখবন্ধ

ভারতের অসম সমাজ-ব্যবস্থা, পরাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার অসঙ্গতি, রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত, সব কিছুই বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি যে-সব সমস্যাকে দেশের অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করেছেন, সেই সব সমস্যার মূল কারণ পর্যালোচনা করে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন। দেশের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির যেমন তিনি প্রয়াস করেছেন, তেমনি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন একটি আন্তর্জাতিক রূপ। বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে শ্রম-দফতরের দায়িত্ব নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে যে-সব মন্তব্য করেছিলেন, তা ভারতের শ্রমিক-ও সামাজিক আন্দোলনের দলিল হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।

আশা করি, এর বাংলা ভাষান্তর বাঙালি পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হবে।

মেনকা গান্ধী

শ্রীমতী মানেকা গান্ধী
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী
ভারত সরকার

নতুন দিল্লি
ডিসেম্বর, ২০০০
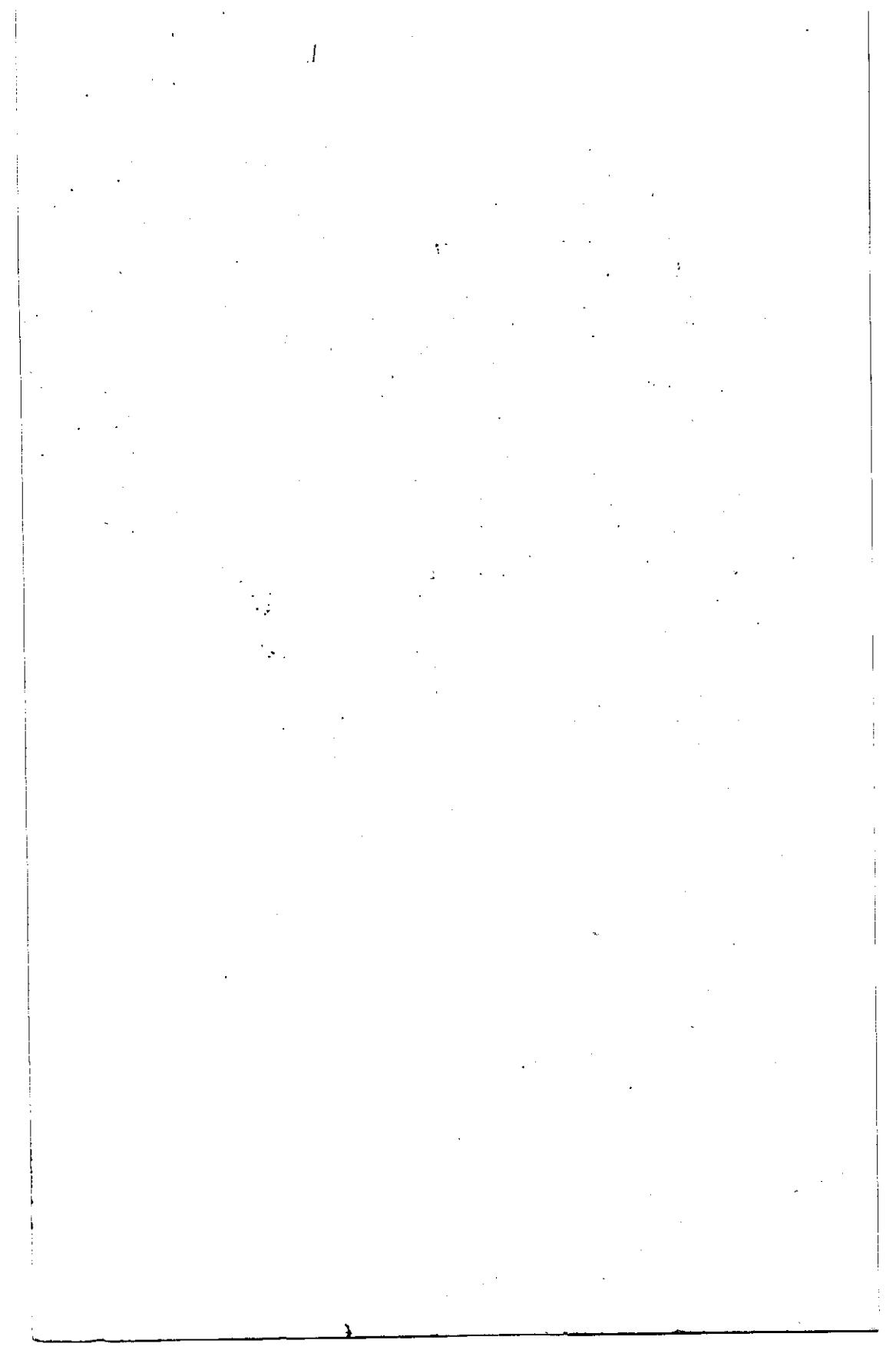
সদস্য সচিবের কথা

বাবা সাহেব ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের অবদান ভারতের নব-জাগৃতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। যুগ যুগ ধরে শোষিত ও দলিত মানুষদের সামাজিক-আর্থনীতিক উন্নতির জন্য তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। শোষিত ও দলিত মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারেও তাঁর প্রয়াস ছিল নিরলস। দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাবা সাহেবের স্বপ্নকে মূর্তরূপ দেবার জন্য ভারত সরকার 'আম্বেদকর ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেছেন নিচে উল্লিখিত কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত করতে।

(১) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুস্তকালয়, (২) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, (৩) ড. আম্বেদকর বিদেশ-ছাত্রবৃত্তি, (৪) ড. আম্বেদকরের নামে অধ্যাপকপদ সৃষ্টি, (৫) ভারতীয় ভাষায় বাবা সাহেব ড. আম্বেদকরের রচনা ও বক্তৃতার অনুবাদ প্রকাশ, (৬) ড. আম্বেদকর আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং (৭) ড. আম্বেদকর রাষ্ট্রীয় স্মারক (২৬, আলিপুর রোড, দিল্লি)।

এই কার্যক্রম ও প্রকল্পগুলি রূপায়িত করে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় মাননীয় কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ মন্ত্র শ্রীমতী মানেকা গান্ধী এবং ভারত সরকারের উক্ত মন্ত্রকের সচিব আশা দাস বিভিন্ন সময়ে অমূল্য পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁদের কাছে প্রকাশ করছি আমার কৃতজ্ঞতা।

বাবা সাহেবের রচনা-সম্ভার হিন্দি সহ অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবার এই জাতীয় মহত্ত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদক, অনুমোদক, সম্পাদক ও মুদ্রক নির্বাচনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ার জন্য ভারতীয় ভাষায় বিভিন্ন খণ্ড প্রকাশে কিছুটা দেরি হয়েছে। এজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

বাংলায় অষ্টাদশ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি খুব-ই আনন্দিত এবং এর জন্য সম্পাদক শ্রী আশিস সান্যালকে অভিনন্দন জানাই। এ-ছাড়াও অনুবাদক, অনুমোদক এবং আরো যাঁরা এই কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমার অভিনন্দন।

ফাউন্ডেশন এর মধ্যেই ড: আম্বেদকরের যে সব রচনা-সম্ভার প্রকাশ করেছে, সেগুলি প্রশংসিত হওয়ায় আমি আনন্দিত। সব শেষে জানাই, রচনা-সম্ভার সম্বন্ধে পাঠকের মতামত সাদরে গৃহীত হবে।

ডি. কে. বিশ্বাস
সদস্য সচিব
ড: আম্বেদকর ফাউন্ডেশন

ডিসেম্বর, ২০০০
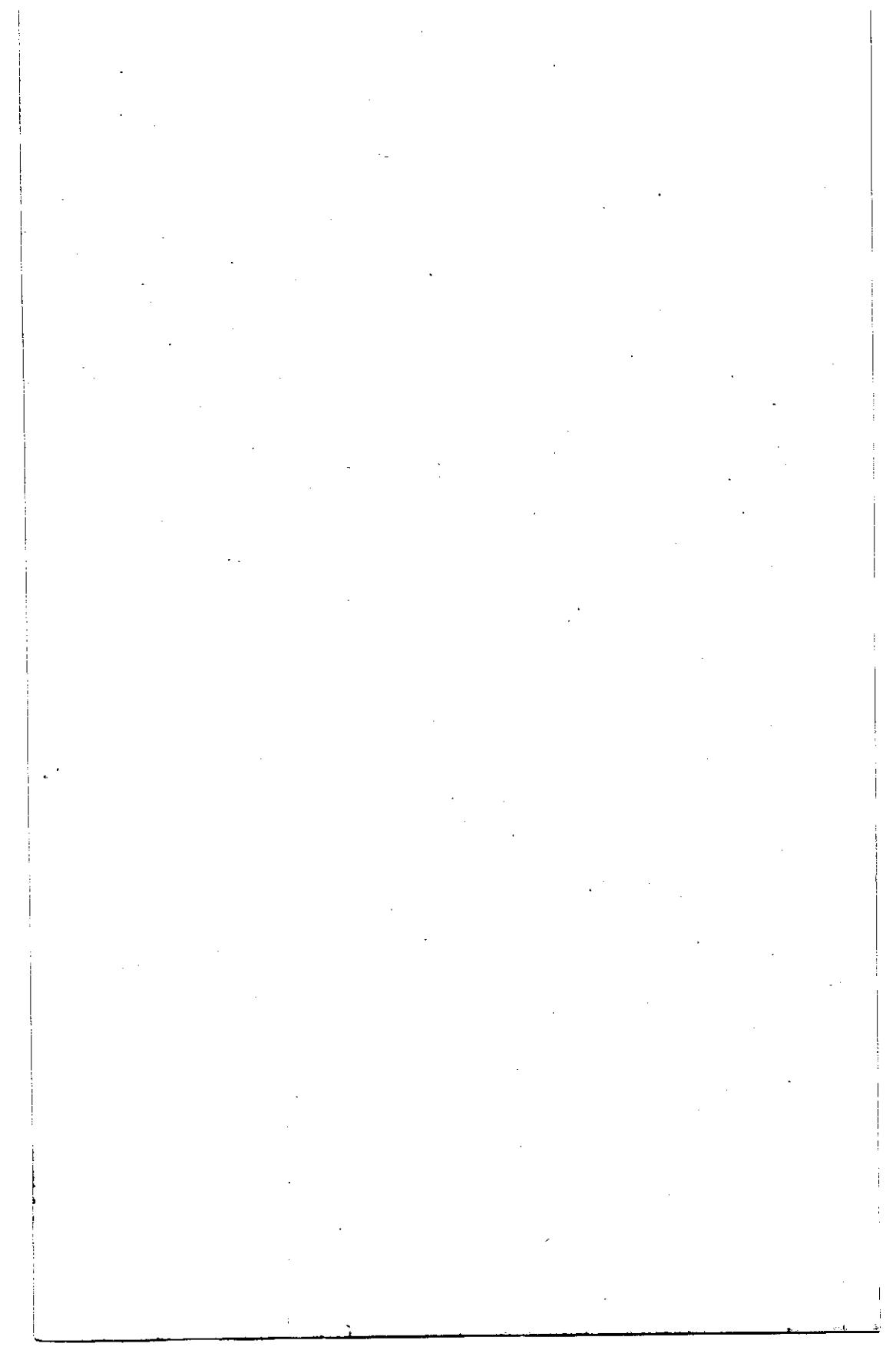
সম্পাদকের নিবেদন

আধুনিক ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বাবা সাহেব ড. বি আর আম্বেদকর একটি বিশিষ্ট নাম। দলিত শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অপরিসীম। দলিত শ্রেণীর সমস্যাসমূহ তিনি যে-ভাবে অনুধাবন করেছেন, তার তুলনা নেই। বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তাদের যাবতীয় সমস্যা। শোষিত, অবদমিত, লাঞ্ছিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চল্লিশের দশক খুব-ই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই দশকের প্রথম কয়েকটি বছর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী দাবদাহে ভয়ঙ্কর মাত্রায় চঞ্চল। দ্বিতীয়ার্ধের বছরগুলি পুনর্নির্মাণের প্রত্যাশায় কর্মব্যস্ত। ড. আম্বেদকর এই সংকটময় মুহূর্তে বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদের শ্রম-সদস্য হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করেছেন, তা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে।

বর্তমান খণ্ডে সেই সময়ে ড. আম্বেদকর কর্তৃক প্রদত্ত বেশ কিছু বক্তৃতা সংকলিত হয়েছে। সেই সব বক্তৃতার কিছু কেন্দ্রীয় আইনসভায় এবং কিছু বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত হয়েছে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় ড. আম্বেদকর যে সর্বদাই চিন্তিত ছিলেন, তা এই সব ভাষণ থেকে উপলব্ধি করা যাবে। এ-ছাড়াও এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে ড. আম্বেদকরের একটি আত্মকথামূলক রচনা: 'ড. বি আর আম্বেদকর : একটি জীবনী'। ড. আম্বেদকরের ব্যক্তি-জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য এই রচনা থেকে পাওয়া যাবে।

এই খণ্ডে সংকলিত অনেক রচনাই এতদিন পর্যন্ত গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ছিল। ভারত সরকারের 'ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন' ছাড়া এগুলি আর কোথাও প্রকাশিত হয়নি। পুণের 'গোখলে ইনস্টিটিউট অব্ পলিটিক্যাল সাইনস অ্যান্ড ইকনমিকস্'এর গ্রন্থাগার থেকে উক্ত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে সেই সব রচনা উদ্ধার করে মহারাষ্ট্র সরকারের শিক্ষা-বিভাগ প্রকাশ করে। বাংলা অনুবাদ সেই ইংরাজি রচনা থেকেই করা হয়েছে।

অন্যান্য খণ্ডের মতো এই খণ্ডের অনুবাদেও যতদূর সম্ভব বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধীর সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই খণ্ড প্রকাশ সম্ভব হত না। এই সুযোগে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এ-ছাড়াও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ড. আম্বেদকর ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত আধিকারিকদের সহযোগিতার জন্য। অনুবাদকদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। অন্যান্য খণ্ডের মতো যদি এই খণ্ডটিও পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হয়, তাহলে নিজের শ্রম সার্থক মনে করবো।

কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০০

অধ্যাপক আশিস সান্যাল
সম্পাদক

সূচিপত্র

বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে
শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে
এবং
বিভিন্ন সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতাবলী

১
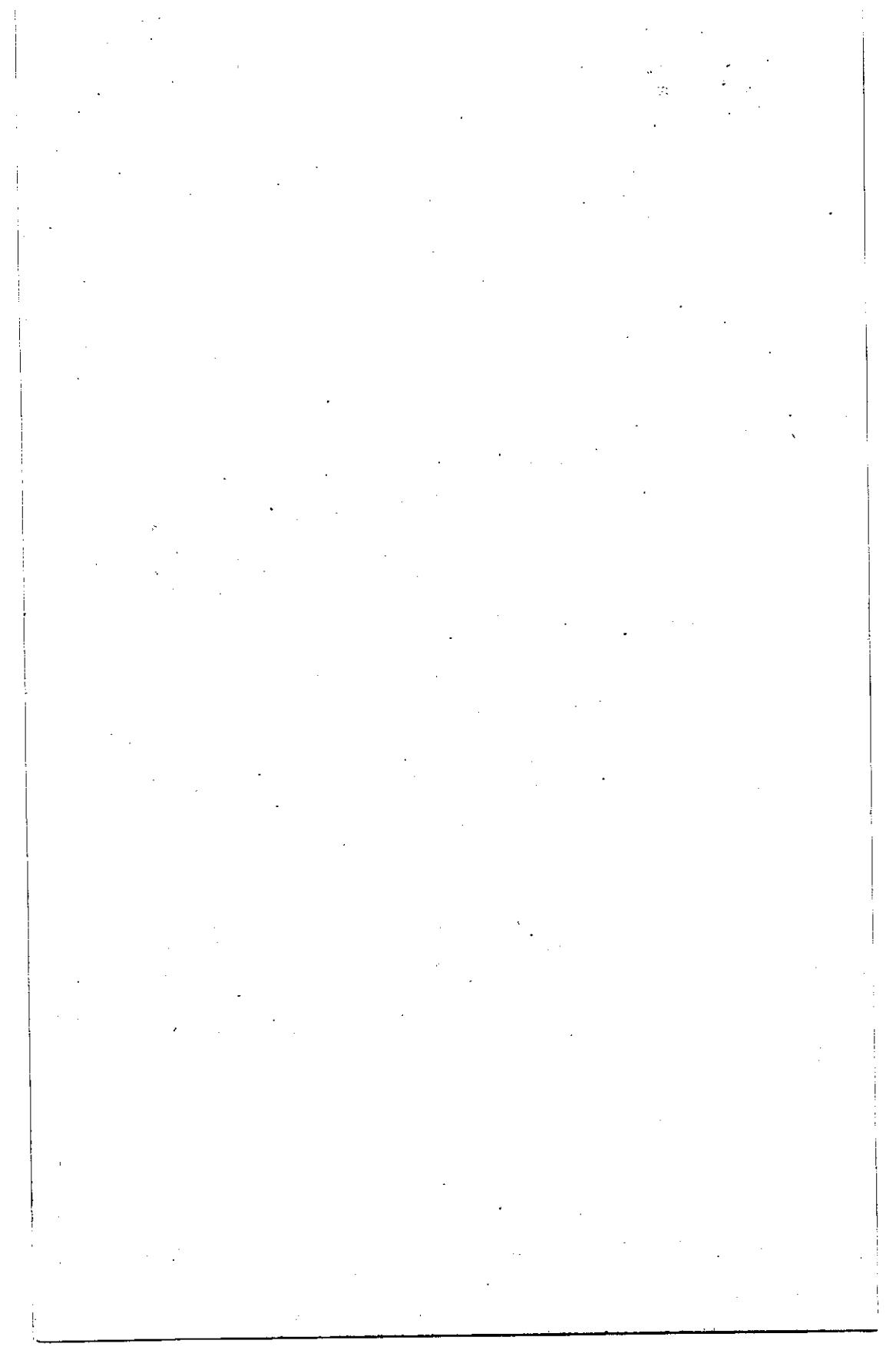
ড. বি আর আম্বেদকর একটি জীবনী

বড়লাটের শাসন পরিচালন পর্ষদের প্রত্যেকের অবস্থা বা প্রভাব সমন্ধে*

ত্রিশ বছর আগে একজন মাহার যুবক, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সুবর্ণ পথ উন্মুক্ত দেখেছিল এবং স্থির করেছিল যে, তাঁর জীবনের কাজ হবে, যে সমাজ ব্যবস্থা তাকে এবং তার জাতভাইদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে এবং যাদের ছায়ার নৈকট্য পর্যন্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দূষিত করে, তার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবে, আজ, সেই যুবক, ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, বড়লাটের শাসন পরিচালন পর্ষদের (Viceroy's Executive Council) শ্রম দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত। সে আজও মনে করে, তার প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে ভারতের লক্ষ লক্ষ তথাকথিত অবদমিত শ্রেণীর প্রতি এবং কোনও ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা ইচ্ছা সেই অবদমিত শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রামের পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

যারা তাঁর হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ এবং হিন্দু নেতাদের সঙ্গে তাঁর মত-পার্থক্যের কথা জানেন, তাঁরা নিশ্চয়-ই অনুভব করবেন যে, সে একজন তিতিবিরক্ত ব্যক্তি। কিন্তু যে তাঁর জীবন ও জীবনের ঘটনাবলি সম্বন্ধে জানে, তার কাছে আশ্চর্য মনে হবে যে, অস্পৃশ্যতা এবং বহুবিধ অসঙ্গতির বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ এখন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে আগের চেয়ে।

এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে নীচ জাতের অস্পৃশ্য এই লোকটি শিক্ষা-দীক্ষা পেলেন কি করে? এর উত্তরটি কিন্তু সহজ। তিনি যে জাতের লোক সেই মাহার জাতের পেশা মূলত ছিল চাষবাস, গ্রামের মধ্যেই ভৃত্যবৃত্তি আর সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্তি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর বোম্বাই শাখায় ভিড় ছিল এই মাহার নামের নীচ জাতের, ঠিক যেমন কোম্পানির বিহার শাখায় দুসাদদের, মাদ্রাজ শাখায় পারিয়াদের। অবশ্য তখনকার দিনে সেনাবাহিনীর

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, মার্চ, ১৯৪৩; পৃষ্ঠা : ১৯৪-৯৫য় এই প্রবন্ধটি 'পারসোনালিনিস', শিরোমানে প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের নাম ছিল না।—সম্পাদক।

সিপাইদের কোম্পানির তরফে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু ছিল। ড. আম্বেদকরের বাবা সুবেদার রামজী মালোজী আম্বেদকর ছিলেন এইরকমই একটি সেনাস্কুলের শিক্ষক।

প্রারম্ভিক শিক্ষা

১৮৯২ সালে যদি কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে মাহারদের জাতের নিয়োগ বন্ধ হয়ে গেল। না যেত, তাহলে সুবেদার রামজী মালোজি আম্বেদকরের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিত। কিন্তু ঘটনা চলেছিল, অন্য দিকে, অন্য পথে।

শিক্ষক সুবেদার বুঝেছিলেন শিক্ষার মূল্য। পুত্রদের শিক্ষিত করার জন্য তিনি সর্বান্তকরণে সচেষ্ট হলেন। মাহারদের ভর্তি করতে অস্বীকার করল স্কুলগুলি। নিজভূমি রত্নগিরি জেলা থেকে প্রথমে গেলেন সাতারা। সেখান থেকে বোম্বাই। শেষমেষ সেখানেই তিনি থিতু হলেন। পাকাপাকি ঘর বাঁধলেন সেখানে। আর সেখানে এসে তিনি আর একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। দুটি পুত্রকে এক-ই সঙ্গে স্কুলে পাঠাবার সঙ্গতি তাঁর ছিল না। অতএব তিনি ঠিক করলেন যে, কোনও একজনকে তিনি পড়াবেন। তাঁর বাছাইয়ে জয়ী হল ছোট পুত্রটি, দলিত শ্রেণীর নেতা।

জীবন-প্রত্যুষেই এই সুবেদার তনয় শিখে ফেলল অস্পৃশ্যতা বলতে কি বুঝায়। ১৮৯৩ সালে ড. আম্বেদকরের জীবনীকারদের অভিমত অনুযায়ী ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল তাঁর জন্ম, সাতারায় স্কুলের নথি অনুযায়ী যা জানা যায় এবং সেখানে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। মহু নামের এক ছোট জায়গায় এই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়। বেড়ে ওঠে তুলনামূলকভাবে সুস্থ গণতান্ত্রিক পরিবেশে। কারণ পিতার কর্মসূত্রে তার প্রথম শৈশব কাটে এক সেনা আবাসে। কিন্তু শৈশবের স্মৃতির অনেকটাই তেতো। তার মনে আছে, সাতারায় সে যখন স্কুলে যেত, তখন একটা চটের টুকরো নিয়ে যেতে হত। সেটা ক্লাশের একটা কোনে বিছিয়ে তাকে বসতে হত। অন্য সবার সঙ্গে বসার অধিকার তাঁর ছিল না। অস্পৃশ্যতার রূপ এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে, স্কুলের ভৃত্যও সেই চটের টুকরো স্পর্শ করত না। শিশু ভীমরাওর ওপর নিষেধ ছিল পানীয় জলের কল স্পর্শ করার। তৃষ্ণা মিটত তখনই, যখন স্কুলের পিওন তাকে জলের কলটা খুলে দিত। বাড়িতে তার জামাকাপড় কাচার জন্য কোনও ধোবা মিলত না। কারণ অস্পৃশ্যতা। কারণ তারা নীচ জাত। সব কিছু করতে হত তার দিদি বা বোনেদের। এমন কি ভীমরাওদের চুলও বাইরে কাটা যেত না।

একটি ঘটনা তার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। একবার সে এবং তার দাদা আর সম্পর্কিত ভাইপো যাচ্ছিল তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। জায়গাটা ছিল কোনও এক ছোট শহর। রেলস্টেশন থেকে কিছুটা দূরে। গরুর গাড়িতে করে যেতে হয়। কিন্তু কোনও গাড়োয়ানই তাদের নিয়ে যেতে রাজি হল না। শেষমেশ ওই তিন শিশু নিজেরাই গরুর গাড়ি চালাবে বলে ঠিক করল। এই অপরাধে এক গাড়োয়ানকে তাদের দ্বিগুণ মূল্য ধরে দিতে হয়েছিল। মূল্য তাদের আরও দিতে হয়েছিল, যখন তাদের পথের খাবার শুধুমাত্র পানীয় জলের অভাবে নষ্ট হয়ে গেল। খাবার জল তাদের কেউ দিল না। তারা যে নীচ জাতের মাহার।

বরোদারাজের বদান্যতা

যথা সময়ে ভীমরাও স্কুলের গন্ডি পার হল। এলফিনস্টোন কলেজ কিন্তু এবার অন্য বাধা। তাঁর বাবা ছেলের লেখাপড়া আর চালাতে পারছিলেন না। তখন এক বন্ধু তরুণ আম্বেদকরকে নিয়ে গেলেন বরোদারাজ গায়কোয়াড়ের কাছে। বরোদারাজ তাকে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি স্নাতক হলেন।

তিনি গেলেন বরোদারাজের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে আর বরোদারাজ তাকে জিগ্যেস করলেন যে, তিনি উচ্চশিক্ষার্থে সাগরপারে যেতে রাজি আছেন কিনা।

এমন উপহার ভীমরাও লুফে নিলেন। ঠিক হল তিনি নিউ ইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবেন। তিনি যাবেন ঠিক হল। এবার শুধু সময়ের অপেক্ষা। এই অপেক্ষার সময়টুকুও বরোদার গায়কোয়াড় বয়ে যেতে দিতে রাজি নন। তিনি আম্বেদকরকে পিতা-পিতামহের পেশা সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির কাজ নিতে বললেন। বরোদা রাজ্যের সেনাপতির দায়িত্বে তাকে নিয়োগ করলেন।

অবশেষে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন শুরু হল অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনৈতিক এবং নৈতিক দর্শন নিয়ে। শেষ অবধি স্নাতকোত্তর উপাধি এবং ডক্টরেট করলেন দর্শন নিয়ে। ১৯১৭ সালে তিনি পাড়ি জমালেন লন্ডনে। ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগার আর লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকস্ে চলতে লাগল তার গবেষণা। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ছিল গ্রের সরাইখানা।

দেশে ফিরেই তাঁর তিনি হয়ে ওঠার পিছনে যে মানুষটি ছিলেন, সেই মানুষটির অধীনে নিজের জীবিকা নির্বাহের সিদ্ধান্ত নিলেন। নিয়োজিত হলেন বরোদারাজের মহাগাণনিক দফতরে [Accountant General] একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে।

বরোদার অভিজ্ঞতা

বহুদিন বিদেশে থাকার সুবাদে ডঃ আম্বেদকর বহু বন্ধুর সান্নিধ্যে এসেছেন। বন্ধুবান্ধবের এই তালিকায় ভারতীয় আছে, আছে ইউরোপীয়ান, আমেরিকান। এই বান্ধবকুলের সমভিব্যহারে কখনও নিজেকে অস্পৃশ্য বলে তাঁর মনে হয়নি। সত্যি বলতে তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে তিনি অস্পৃশ্য। বরোদায় কাজে যোগ দেবার পর কিন্তু বেদনাজনকভাবে সে-সব ফিরে এল। তিনি তো এক মাহার! কোথায় তিনি থাকবেন? এক পার্শি সরাইখানার মালিককে বলে নিজের থাকার একটা জায়গা করলেন। তাঁর ভাগ্য কিঞ্চিৎ ভাল ছিল যে, ঐ সরাইখানায় সেই সময় অন্য কোনও আবাসিক ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল দশদিন পরে যখন একঝাঁক পার্শি লাঠিসোটা নিয়ে এসে তাকে শাসানি দিলেন। তাদের মূল অভিযোগ, অচ্ছুৎ জাতের লোক হয়ে তিনি নাকি সরাইখানার পবিত্রতা নষ্টই করে ফেলেছেন। বিশেষত ঐ সরাইখানা যখন পার্শিদের জন্য সংরক্ষিত। অতএব তাকে বিদায় নিতে হবে। সেই সন্ধ্যায়-ই।

তিনি থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন তাঁর দুই বন্ধুর কাছে। প্রথমজন হিন্দু, দ্বিতীয়জন খ্রিস্টান। প্রথম জন বললেন, 'তুমি যদি আমার বাড়িতে থাকো, তাহলে আমার ভৃত্যরা চলে যাবে।' দ্বিতীয়জনের প্রত্যাখ্যান একটু ঘুরপথে। তার অজুহাত, তার স্ত্রীর সঙ্গে একটু আলোচনার প্রয়োজন। আর ড. আম্বেদকরের ভালভাবেই জানা ছিল যে, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হিন্দুধর্মের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারজাত এবং জাতপাত বিশ্বাসী। তিনি স্থির করলেন, বোম্বাই ফিরে যাবেন।

বোম্বাই ফিরে, তিনি যোগ দিলেন সিডেনহাম কলেজ অব্ কমার্সে রাজনৈতিক অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক হিসাবে। কিন্তু ইংলন্ডে গবেষণার কাজ শেষ করার তাগিদ অনুভব করেছিলেন মনে। শুরু করলেন অধ্যাপনার বাইরে ব্যক্তিগত উদ্যোগে ছাত্রপড়ানো। আর সেই উপরি আয় থেকে তিল তিল করে জমানো অর্থে গেলেন ইংলন্ডে। দুই বা এক বছর পরে আবার পড়াশোনা শুরু করলেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস্ দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত ডি. এস. সি. অর্জন করেন। "টাকার সমস্যা"র ওপর গবেষণাপত্র জমা দিয়ে হলেন ব্যারিস্টার। তারপর তার বাসনা ছিল কোনও জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে গবেষণা করবেন। রওনা হলেন জার্মানির উদ্দেশে। পৌঁছলেন বন। কিন্তু ফিরে এলেন শূন্য হাতেই। কারণ আন্তর্জাতিক বিনিময় ব্যবস্থার হ্রাসে পাথেয় পুঁজিতে টান পড়ল।

তিনি ঠিক করলেন যে, এবার তিনি ওকালতিকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ

করবেন সরকারি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ না করে। কারণ তাহলে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কাজ করা যাবে।

দলিত শ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

বর্ণ হিন্দু আইনজ্ঞ উকিলেরা তাঁর উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তাঁর জীবনযুদ্ধের প্রাথমিক ভয় এই নবতম পেশাযুদ্ধেও ঢুকে পড়ল। কিন্তু অচিরেই তাঁর এই শঙ্কা দূর হল। তিনি বোম্বাইয়ে উত্তর বিচারের অধিকার সম্পন্ন (appellate practice) আইনজীবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেলেন। তাঁর সাফল্য এমনই হল যে বোম্বাই এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি বোম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয় থেকে তাঁর আইন পরীক্ষার পরীক্ষক হবার ডাক এল। তিনি বোম্বাইয়ের ল' কলেজে দীর্ঘদিন অধ্যাপক এবং পরে অধ্যক্ষের কাজ করেন। রাজনৈতিক টানাপোড়েন থেকে দূরে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন তাঁকে হাতছানি দিচ্ছিল। কিন্তু তিনি ফিরিয়ে দিলেন নির্বিঘ্ন বিচারকার্যে নিযুক্তির হাতছানি।

জীবনের দশটা বছর অস্পৃশ্য জাতের এই ব্যারিস্টার তথা অধ্যাপক ছিলেন বোম্বাই উন্নয়ন নিগমের তৈরি পাঁচতলা বাড়িগুলির একটিতে। এই বাড়িগুলি তৈরি হত সেইসমস্ত দরিদ্রশ্রেণীর মিলশ্রমিকদের জন্য যাদের গড় মজুরি ছিল মাসে পঁচিশ টাকা।

এই পাঁচতলা বাড়িগুলো প্রতি তলায় একটি শৌচাগার আর একটাই স্নানের কল থাকত। কোনও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিলই না। বাস করত প্রায় একশ পরিবার। অর্থাৎ প্রতি পঁচিশটি পরিবারের জন্য একটি শৌচাগার আর একটি স্নানের কল।

এই বসবাসের ফলে ড. আম্বেদকর হাতে কলমে বোম্বাইয়ের মজদুরদের জীবনযাত্রা কেমন হয় সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রচুর নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন হল, যা তাঁর কাছে খুব গর্বের ছিল। তিনি গর্ব করতেন এই বলে যে, শত শত মিলশ্রমিক তাঁকে চেনে এবং তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্যের ওপর নির্ভর করে। এইভাবেই ধীরে ধীরে তিনি প্রচুর শ্রমিকের আস্থা অর্জন করলেন আর এইভাবেই ধীরে ধীরে স্থাপনা হল অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দলিত শ্রেণীর সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্বের ভিত্তি।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে প্রচার

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রচার শুরু হল তার মধ্যে দুটি ঘটনা সুবিদিত।

প্রথমটি কোলাবা জেলার মাহাদে চৌদার পুষ্করিনী সত্যাগ্রহ। এই সত্যাগ্রহে ড. আম্বেদকরের নেতৃত্বে নীচ জাতির মানুষরা দলবদ্ধ বিক্ষোভে সামিল হয় ঐ পুষ্করিনীর জল তাদের ব্যবহার করতে দেবার দাবিতে। জল নিতে গিয়ে অস্পৃশ্যদের মাথা ফাটল এবং ড. আম্বেদকর বাধ্য হলেন পুলিশ ডাকতে। শেষমেশ অস্পৃশ্যদের-ই জয় হল। এই আন্দোলনে পুষ্করিনীর জল ব্যবহারের অধিকার কায়েম করার থেকেও বড় লাভ হল এক যুথবদ্ধ হবার বোধ। এবং অস্পৃশ্যরাও যে মানুষ এই চেতনা। এই বোধ তাদের চালিত করল মানুষ হিসাবে নিজেদের মুক্তির দিকে।

এই সাফল্যে তারা উদ্বুদ্ধ হল নাসিক শহরের পবিত্রতম কালারাম মন্দিরে প্রবেশের অধিকার অর্জনের জন্য। পাঁচ বছর ধরে তারা কালারাম মন্দিরে প্রবেশের জন্য সত্যাগ্রহ চালায়। বার্ষিক মেলা ও উৎসবে যাতে তীর্থযাত্রীরা যেতে না পারে, তার জন্য তাদের বাধা দিতে লাগল এবং তা এত তীব্র হয়েছিল যে, মেলা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। তারা এমন একটি ঘাটে স্নান করল, যে ঘাটে আগে তাদের নামতে দেওয়া হয় নি। এভাবে পবিত্র গোদাবরীর জল অপবিত্র করল। অনেকে, বহু মহিলাসহ, জেল খাটল। অবশ্য সত্যাগ্রহ তুলে নেবার সময় পর্যন্ত তারা মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায় নি। কিন্তু তারা দেখাল যে, তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং বর্ণ হিন্দুদের দেখাল যে, প্রয়োজনে হিন্দুধর্মের সঙ্গে তারা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

অস্পৃশ্য জনগণের নেতা হিসাবে ড. আম্বেদকর ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকেন। ১৯২৬ সালে তিনি বোম্বাই বিধান পরিষদে মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে এবং পরে বোম্বাই বিধানসভায় নির্বাচিত হন তফশিলি জাতের প্রতিনিধি হিসাবে বোম্বাই শহর থেকে। লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে তিন বার এবং যুগ্ম সংসদীয় সমিতিতে, যে সমিতি ১৯৩৫ সালে 'ভারত সরকার আইন'-এর খসড়া প্রণয়ন করেন, সেখানে তিনি তাঁর নিজের লোকদের জন্য দাবি পেশ করেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, নতুন সংবিধানে তফশিলি জাতের স্বার্থরক্ষা নিয়ে শ্রী গান্ধীর সঙ্গে বিরোধিতা। ড. আম্বেদকর তফশিলি জাতের জন্য চেয়েছিলেন কিছু রক্ষাকরচ। ব্রিটিশ সরকার কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে যাওয়ার বিরুদ্ধে গান্ধীজি আমরণ অনশন আরম্ভ করেন। এই সংঘাতে পরিনামে স্বাক্ষরিত হল 'পুনাচুক্তি', যাতে নতুন সংবিধানে

প্রাদেশিক বিধানমণ্ডলের নিম্নকক্ষে অস্পৃশ্যদের সংরক্ষণ-সহ যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী স্বীকৃতি পেল।

নতুন আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ড. আম্বেদকর বোম্বাই ও কিছুটা মধ্যপ্রদেশে তাঁর অনুগামীদের সংঘবদ্ধ করলেন। বোম্বাইতে তাঁর 'ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি' তফশিলি জাতের জন্য সংরক্ষিত ১৫টির মধ্যে ১১টি আসনে জয়ী হয়। রত্নগিরি জেলায় অ-সংরক্ষিত আসনেও তাঁর দলের মনোনীত ২ জন হিন্দু প্রার্থী জয়ী হন। মধ্যপ্রদেশে জয়ী দলিত প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন অ-কংগ্রেসি ও ড. আম্বেদকরের অনুগামী।

অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক-ছাপ

জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ নেতা হওয়া সত্ত্বেও ড. আম্বেদকরকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক-চিহ্ন বহন করতে হয়েছে। অস্পৃশ্যদের কিছু অভাব-অভিযোগের অনুসন্ধানের জন্য গঠিত সমিতির সদস্য হিসাবে তিনি খান্দেশ জেলার চালিশগাঁও গেলে স্থানীয় মাহার সম্প্রদায়ের মানুষরা তাঁকে স্বাগত জানায়। স্টেশনে দীর্ঘ অপেক্ষার পর তিনি টাঙায় করে মাহার বস্তী মাহারওয়াদার দিকে রওনা হন। কিছুদূর যাওয়ার পরেই টাঙাওয়ালার অপটু চালনার জন্য তিনি একটা পুলের সামনে ফুটপাতের পাথরে ছিটকে পরে গুরুতর আহত হন। তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন যে, অস্পৃশ্য একজনের পক্ষে টাঙ্গা পাওয়া খুব-ই কঠিন এবং অন্য কোনও টাঙাওয়াল টাঙা চালাতে রাজি না হওয়ায় একজন মাহার টাঙা চালাতে গেল—তার নেতার বিপদের সম্ভাবনার কথা না ভেবে।

১৯৩৪ সালে ড. আম্বেদকর তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে নিজামের দৌলতাবাদ দুর্গে বেড়াতে গেলেন। এত ধূলি লেগেছিল তাঁদের যে, তাঁরা কোনও চিন্তা না করেই একটি জলাশয়ে গেলেন তা ধুতে। যখন ধোবার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন একজন বৃদ্ধ মুসলমান সেখানে দৌড়ে এসে চেঁচাতে লাগল : একজন ধেদ্ (অস্পৃশ্য মানুষ) জলাশয়টি অপবিত্র করেছে'। ঘটনাটি গুরুতর আকার ধারণ করল এবং ড. আম্বেদকর সেই মুসলমান ব্যক্তিটির আচরণে কুপিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন : 'এই কি আপনার ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে? আপনি কি একজন অস্পৃশ্য মুসলমানকে জলাশয়ের জল স্পর্শ করতে নিষেধ করবেন?' জনতা এতে শান্ত হল বটে, কিন্তু তাদের একজনকে বন্দুকধারী সিপাহীর তত্ত্বাবধানে দুর্গটি ঘুরে ফিরে দেখতে দেওয়া হল, যাতে আর কোথাও কেউ জল অপবিত্র করতে না পারে।

তাঁর জীবনে অভিজ্ঞতায় ড. আম্বেদকর বুঝতে পারনে যে, জাত-পাত বর্ণ হিন্দুদের সৃষ্টি হলেও ভারতের মুসলমান, পার্শি এবং খ্রিস্টানরাও এই বিষয়ে হিন্দুদের থেকে আলাদা নয়। তাঁর দীর্ঘ সংগ্রামে তিনি মূল্যবান সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বাইরের শিক্ষিত মানুষদের সান্নিধ্যে।

লেখালেখি

যাঁরা তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁর বইয়ের আলমারিতে রাখা বিভিন্ন ধরনের অগণিত গ্রন্থ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারতেন না। টেবিলে ছড়ানো ছিটানো থাকত সব ধরনের গ্রন্থ, বিশেষ করে সাংবিধানিক আইন, রাজনীতি, অর্থনীতি বা সমাজতত্ত্বের গ্রন্থ।

তাঁর নিজের রচনাদির মধ্যে আছে 'টাকার সমস্যা' (Problem of the Rupee), 'ব্রিটিশ ভারতে প্রাদেশিক বিত্ত' (Provincial Finance in British India), 'জাতের বিলয়' (Annihilation of Caste), 'যুক্তরাষ্ট্র বনাম স্বাধীনতা' (Federation versus Freedom) এবং 'পাকিস্তান সম্পর্কে ভাবনা' (Thoughts on Pakistan), ইত্যাদি।

রাজনৈতিকভাবে অস্পৃশ্যদের জাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি মারাঠি সংবাদপত্রও চালাতেন। ১৯১৯* সালে 'মূক নায়ক* আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর গবেষণার জন্য ইউরোপ যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯[অ] সালে তিনি প্রকাশ করেন 'বহিস্কৃত ভারত' কয়েক বছর পরে পত্রিকাটির নাম পাল্টে হয়, 'জনতা' (The People)। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, এর আবেদন বহিস্কৃত ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয়।

ধর্ম সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি

ড. আম্বেদকরের 'ধর্ম' সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা দরকার। তিনি অনুভব করেছিলেন যে, হিন্দু-সমাজ যা চারটি বর্ণ এবং, অনেক অবদমিত জাতের সমন্বয়ে গঠিত এবং এই গঠন-ই ভারতের সামগ্রিক ভাবে দুর্বলতার কারণ এবং তার মধ্যে তিনি আটকে থাকতে চাইলেন না।

কয়েক বছর আগে হিন্দু সংস্কারবাদী সংগঠন 'জাত-পাত তোড়ক মণ্ডল' তাঁকে তাঁদের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ জানায়।

---

* হওয়া উচিত ১৯২০ সাল।—সম্পাদক

অ. হওয়া উচিত ১৯২৭ সাল।—সম্পাদক

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিবেশনটি পরিত্যক্ত হয়, কারণ সভাপতির প্রেরিত ভাষণে তিনি লিখেছিলেন যে, হিন্দু হিসাবে এই তাঁর শেষ বক্তৃতা, যা মণ্ডলের পছন্দ হয় নি। পরে সেই ভাষণটি 'জাতের বিলয়' (Annihilation of Caste) নামে প্রকাশ করেন। শীর্ষনামেই জাত সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে।

কিন্তু যখন হিন্দু হিসাবে না থাকতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং বৌদ্ধধর্ম, শিখধর্ম এবং খ্রিস্টানধর্ম সহ অন্য ধর্ম সম্বন্ধে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেন, তখনও তিনি অন্য কোনও ধর্মের ধর্মান্তরিত হবার কথা ঘোষণা করেন নি। তিনি অনুভব করেন, অস্পৃশ্যদের তাকে তখনও প্রয়োজন। তাঁর ধর্মন্তরের প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে পারে। তার এবং তাঁর অনুগামীদের বিশ্বাস এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিগত এবং তিনি তার অনুগামীদের এই বিষয়ে প্রভাবিত করতে চান না। যখন তিনি অস্পৃশ্যদের নেতৃত্বে দেবার অধিকার অন্যদের হাতে তুলে দেবেন এবং কর্মজীবন থেকে অবসর নেবেন তখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন। আপতত তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন।

□ □ □

২

*বড়লাটের মন্ত্রণা-পরিষদ : দায়িত্ব শ্রম-দফতরের

[১৯৪২ সালের ২০ জুলাই ড. বি. আর আম্বেদকর শ্রম-দফতরের দায়িত্ব নিয়ে যোগ দেন বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে। মহামান্য ইংল্যান্ডেশ্বরের অফিস থেকে যে নিয়োগপত্রটি প্রকাশিত হয়। তার বয়ানে বলা হল—সম্পাদক]

জর্জ আর আই

ইংলন্ডের ষষ্ঠ জর্জ যিনি ভগবৎ কৃপায় গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড এবং সাগরপারের তাবৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আস্থা এবং বিশ্বাসের অধীশ্বর, সেই ভারত সম্রাটের এই ঘোষণা।

আমাদের বিশ্বাসভাজন এবং ভালবাসাস্নাত শ্রীযুক্ত ভীমরাও রামজী আম্বেদকর, ডক্টর অব্ সায়েন্স, বার-অ্যাট-ল।

অভিনন্দন!

এতদ্বারা এই বরণপত্রে বিজ্ঞপিত করা হচ্ছে যে আমরা আপনাকে, ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকরকে ভারতের বড়লাটের মন্ত্রণা পরিষদে একজন পারিষদ হিসাবে নিয়োগ করলাম। এতদ্বারা আমাদের পক্ষ থেকে এই নিয়োগে আনন্দও প্রকাশ করা হল।

(II) এই বরণপত্রের প্রকাশের পরবর্তীকালে যেদিন থেকে আপনি আপনার দায়িত্ব বুঝে নেবেন, সেদিন থেকেই আপনার নিযুক্তি লাগু হল বলে ধরে নেওয়া হবে।

এই অধ্যাদেশ আজ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের ৯ তারিখে এবং আমাদের ষষ্ঠ জর্জের রাজত্বের ষষ্ঠবর্ষে আমাদের সেন্ট জেম্‌স্ সভাগৃহে প্রদত্ত হল।

মহামান্য ইংল্যান্ডেশ্বরের
আদেশ এবং অনুমত্যানুসারে সাক্ষর
এল.এস. আমেরি

---

*খেরমোড সি.বি., ড: ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (মারাঠি জীবনী), খণ্ড ; ৯, ১৯৮৭ পৃ: ১১৩।
(মহারাষ্ট্র রাজ্য সাহিত্য সংস্কৃতি মণ্ডল, বোম্বাই, দ্বারা প্রকাশিত)

৩

*শ্রম-আইনে সঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা

[১৯৪২ সালের ৭ অগস্ট ভারত সরকারের শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর নতুন দিল্লির শ্রমসংক্রান্ত যুক্ত অধিবেশনে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই ভাষণটি এখানে তুলে দেওয়া হল]

“এই ত্রিপাক্ষিক শ্রম-বৈঠকে উপস্থিত সবাইকে আমার পক্ষ থেকে সাদর অভিনন্দন। এই বৈঠক আহ্বানে এত তৎপর সাড়া পাওয়াতে আমি এবং ভারত সরকার এতটাই অভিভূত যে, তা অল্প কথায় প্রকাশ করা কঠিন। আপনারা বৈঠকের আমন্ত্রণ রক্ষায় যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা বলাই বাহুল্য।

আমি আশাকরি, তৎপরতার এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেও। অতএব আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই সম্মেলন ফলবতী হবে।

যে সঙ্কট সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি, সেই সঙ্কট সময়ে দাঁড়িয়ে অপনাদের বেশি সময় নিয়ে আমি কালহরণ করব না। কারণ আমি জানি স্ব-স্ব ক্ষেত্রের পদে ফিরে যাওয়ার তাড়া প্রত্যেকেরই আছে। আর সে কারণেই কোনও প্রলম্ব বক্তব্যে আমি যাব না। বরং এই সম্মেলনের তাৎপর্য, এর বিষয়বস্তু এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুটিকয় আলোকপাতের মধ্যে আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য

আপনারা জানেন, এর আগে ভারত সরকারের শ্রম-দফতরের উদ্যোগে তিনটি শ্রম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি ১৯৪০ সালের ২২ এবং ২৩ জানুয়ারি, দ্বিতীয়টি ১৯৪১ সালের ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি এবং তৃতীয়টি ১৯৪২ সালের ৩০ এবং ৩১ জানুয়ারি। বর্তমান সম্মেলনটি অতএব ধারাবাহিকতায় চতুর্থ। এর

*ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৪২।

কতগুলি বৈশিষ্ট্য খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়, যা আগের সম্মেলনগুলির থেকে আলাদা।

প্রথমত যদিও আগের সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতা ছিল, কিন্তু এগুলির পরিকল্পনার কোনও স্থায়িত্ব ছিলনা। সম্মেলন হত, কিন্তু সেই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবনার বা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে কিনা এমন কোনও নিশ্চয়তা ছিল, না। তাতে কল্পনা, পরিকল্পনা এ-সবের বিনাশ ঘটত। শুধু বলা যেতে পারে যে কোনও আইনি ব্যাঘাত ঘটত না।

এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি। যে দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলি ভরা থাকত বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধিতে। শুধু কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিরাই ছিলেন সম্মেলনের অবয়ব। গুরুত্বপূর্ণ এইসব সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রয়োজনীয় যে উপাদান সেই শ্রমসম্পর্কের যাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, সেই মালিক এবং শ্রমিকশ্রেণী ছিল অনুপস্থিত। তাঁদের পক্ষের কোনও প্রতিনিধিকেই এতদিন পর্যন্ত এর আগের শ্রম-সম্মেলনগুলিতে ডাকা হয়নি।

বন্ধু মাননীয় স্যার এ. রামস্বামী মুদালিয়রের কথাই ধরা যাক। তিনি যখন এই শ্রম-দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি কলকাতায় শ্রমিক এবং মালিক দুই পক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এক-ই ভাবে আমার আর একজন বিশিষ্ট সহকর্মী মাননীয় স্যার ফিরোজ খান নুন, তিনি যখন শ্রম-দফতরের দায়িত্বে ছিলেন, তখন সময় সুযোগ পেলেই শ্রমিক মালিক উভয়ের সঙ্গে বসতেন। ঝালিয়ে নিতেন সম্পর্ক। বিনিময় করতেন পারস্পরিক মতামত। এবং আজকের এই শ্রম-সম্মেলন তাঁর কাছে ঋণী।

শ্রম-সম্মেলনের ইতিহাসে এই প্রথম যখন শ্রমিক এবং মালিক উভয় শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন, আমার মনে হয়, সবাই বিশেষ করে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন। আপনারা জানেন, শ্রমিকশ্রেণী স্থায়ী শ্রমপর্ষদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছেন। ওয়াইটলি কমিশনের [Witley Commission] রিপোর্টেও এই পর্ষদের ন্যায্যতা মেনে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কারণে সেই স্থায়ী পর্ষদ আজ অবধি চালু করা যায় নি। কিন্তু আমরা আশা ছাড়িনি। স্থায়ী শ্রম-পর্ষদের ভাবনা এক আদর্শ ভাবনা। আমাদের সম্মেলন আশা করি, সেই আদর্শের দিকে দীর্ঘ পদক্ষেপ।

শ্রম-আইন

এবার আসা যাক এই শ্রম-সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তুতে। আপনারা যারা আগেকার শ্রম-সম্মেলনগুলি সম্বন্ধে অবহিত আছেন, তাঁরা জানেন ঐ সমস্ত সম্মেলনের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তা ছিল, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধরনের শ্রম-আইনের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান।

আমরা জানি, ভারতবর্ষের সরকার এক অবিভাজ্য একক সরকার। সুতরাং সেই সরকারের যে শ্রম, আইন সেই আইনে সঙ্গতি আণয়ন কঠিন নয়। কিন্তু ১৯৩৫ সালের 'ভারত শাসন আইন' অনুসারে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান লাগু হয়েছে। এই সংবিধানে শ্রমকে যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা ওক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। শঙ্কা ছিল, যদি কোনও কেন্দ্রীয় আইন না থাকে, তাহলে প্রতিটি প্রদেশ শ্রম-আইন তাদের মতো করে প্রস্তুত করবে, যা প্রতিবেশী কোনও প্রদেশের থেকে ভিন্ন এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করে প্রাদেশিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে।

মূল উদ্দেশ্য তিনটি

অখণ্ড শ্রম-আইন এবারের শ্রম-সম্মেলনের অন্যতম বিষয়বস্তু। অন্যান্য সম্মেলনের মতো এই সম্মেলনও অপযুক্ত শ্রম-আইনের প্রকরণ এবং প্রণয়নে মতামত বিনিময় করবে। এই সম্মেলনে আমি পূর্ববর্তী তিনটি সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব বাতিল করতে বলছি না। কিন্তু সঙ্গে আরও দুটি উদ্দেশ্য এর সঙ্গে যুক্ত করতে বলছি। এক শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত, দুই সর্বভারতীয় যে কোনও শ্রম ও মূলধন ব্যাপারে সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতে মালিকের মধ্যে আলোচনা।

অর্থাৎ আমাদের এই সম্মেলন তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা চালাবে :—

(১) সারা ভারতব্যাপী এক এবং অভিন্ন শ্রম-আইনের রূপায়ণ এবং প্রণয়ন;

(২) শিল্পসংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসার জন্য এক প্রক্রিয়া বা ধারার প্রবর্তন; এবং

(৩) মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনার প্রস্তাবনা।

সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর মধ্যে প্রথমটি সম্বন্ধে আবারও বলতে হয়, তা আমরা উদ্দেশ্য হিসাবে গ্রহণ করেছি। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে প্রাদেশিক

বহু শাসনের মধ্যে এই সমতা স্থাপন কখনও গুরুত্ব হারাতে পারে না। সুতরাং অতীতের মতো ভবিষ্যতেও তা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

শিল্প বিবাদ

শিল্প-বিবাদ সম্বন্ধে বলতে বলা যায়, আমাদের দেশে শ্রমিক এবং মালিক, যুযুধান দুই পক্ষই ইদানিংকালে আর তেমন সংঘাতে ব্যাপৃত নয়, যেমনটা ছিল আগে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, উভয়পক্ষের মধ্যে দায়িত্ব সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটেছে। কাজে কাজেই শিল্পধর্মঘটের ঘটনা এখন আগের থেকে অনেক কম।

এই বছরের প্রথমদিকেও শিল্পে অশান্তির ঘনঘটা দেখা যাচ্ছিল। এই ঘনঘটা কেটে যাবার লক্ষণ দেখা যেতে লাগল 'ভারতরক্ষা আইনে' ৮১এ-র বিচার নিষ্পত্তি ধারার প্রয়োগ। এই প্রক্রিয়া আমরা আশা করি, নির্ভরশীল প্রক্রিয়া যা যথেষ্ট কার্যকর হবে। আমরা আমাদের এই শ্রম-সম্মেলনে সেই প্রক্রিয়া নিয়েই আলোচনা করব।

আমাদের এই সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর শেষতম বিষয়টি আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে, এপর্যন্ত মালিক এবং শ্রমিক উভয়পক্ষ নিয়ে এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে যে-সব কথাবার্তা হয়েছে সেগুলি বাদ দেওয়া হয় নি। কিন্তু আলোচ্যসূচীর এই তৃতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষ করে বলা যায় যে ভারতবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর শ্রমিক মালিকের যে আলোচনা, সেই আলোচনা যেন শ্রমিকের কল্যাণমুখী বা শ্রমিকের মনোবল বৃদ্ধিকারক হয়। অর্থাৎ শ্রমিক স্বার্থরক্ষার দিকে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে আমরা ইচ্ছুক। সেদিক বিবেচনা করে এই বিষয়টি আলোচ্যসূচীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হতে পারে। যদি তার স্থান সব শেষে। যুদ্ধের প্রয়োজনে এই অন্তর্ভুক্তি সঠিক নয়।

সরবরাহে অশান্তি

বর্তমানের যুদ্ধ হচ্ছে সরবরাহের যুদ্ধ এবং শিল্পে সরবরাহ নির্ভর করে শিল্পে শান্তির ওপর। শিল্পে কিভাবে শান্তি বজায় রাখা যাবে, তা আজকের যুগে বেশ সমস্যার। আমি যদি সঠিক মূল্যায়ন করি, তবে বলতে পারি, শিল্পে শান্তি নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর। প্রথমত শিল্প-বিবাদ দ্রুত সমাধান হয় এমন পরিকাঠামো। দ্বিতীয়ত শিল্পে নিযুক্ত মানুষের মনোবল ক্ষয়কারী শক্তির দ্রুত উৎপাটম।

কিন্তু এই দুই বিষয় ছাড়াও আজকের ভারতবর্ষে এমন অনেক ছোটখাট বিষয় আছে যা বড় ধরনের অশান্তি শিল্পে ঘটতে পারে না। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়গুলির দৌরাত্ম্যে মাঝে, মাঝে শিল্পে অশান্তি নয়, শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের মানসিক অশান্তির কারণ হয়। এইসব দৌরাত্ম্য সাধারণত সামাজিক ব্যাধি নামে পরিচিত। এবং সমাজকল্যাণমূলক কোনও আলোচনায় বিবেচ্য কোনও শিল্প সমাজের বাইরে নয় বরং শিল্পসংস্থাও একটি সামাজিক অঙ্গ। মাঝে-মাঝে এই ব্যাধির প্রাবল্য শিল্পে অশান্তি এনে দেয়। এই অশান্তি, মজার ব্যাপার হল, বড় কোনও শিল্প-বিবাদ নয়—কাজেই ঠিক এই ধরনের কোনও পরিকাঠামোও নেই। কিন্তু এই পরিকাঠামো সৃষ্টি বিশেষ প্রয়োজন। সরকারকে এই বিষয়টি শান্তিপূর্ণও সন্তোষজনক ভাবে কিভাবে সমাধান করা যাবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য এই সরকারকে এই কারনেই এই সম্মেলন ডাকতে বাধ্য করেছে।

আগামী দায়িত্ব

এই হল গিয়ে এই সম্মেলনের তাৎপর্য আর উদ্দেশ্য। এতক্ষণ ধরে কিন্তু আমরা আমাদের আগামী দায়িত্ব এবং কাজ সম্বন্ধে খানিকটা নীরব-ই থেকেছি। তাতে চিন্তার তেমন খোরাক ছিল না। এটা অপ্রতিরোধ্য ছিল। আমরা আপনাদের সামনে কোনও আলোচ্য-সূচি রাখতে পারি নি। আসলে আমরা কতগুলো মূল প্রশ্নের সমাধানে প্রথমেই পৌঁছে গেছি অর্থাৎ আমরা আগামী দিনে এ-রকম সম্মেলনে মিলিত হব কিনা আর দ্বিতীয়ত হলে সম্মেলনের গঠনতন্ত্রের রূপ কি হবে। এইরকম সম্ভাবনা বা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আমরা ঠিক করি যে—

(১) প্রত্যেক বছর আমরা এইরকম শ্রম-সম্মেলনে মিলিত হব, অন্তত বছরে একবার;

(২) এইরকম সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গঠিত হোক স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি [Standing Advisory Committee], যে কমিটির সদস্যরা যখন সরকার প্রয়োজন মনে করবে, তখন মিলিত হবেন এবং সরকারকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ এবং উপদেশ দেবেন; এবং

(৩) সাধারণভাবে এই সব সমিতির গঠনতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করবে।

এই সমস্ত সমিতির গঠনতন্ত্র ব্যাপারে দু চার কথা বলা আমার পক্ষে অশোভন হবে না। আমি ত্রিপাক্ষিক আলোচনার স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই কথা বলব।

পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন

দু'টি সমিতির গঠনের প্রস্তাব আমরা করেছি :—

(১) এক পূর্ণ সম্মেলনের রূপায়ণ এবং

(২) একটি স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি

এই পূর্ণ সম্মেলন সমিতি গঠিত হবে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্যগুলির মালিক এবং শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে। সাধারণভাবে এতে প্রতিনিধিত্ব করবেন প্রতিটি প্রদেশ এবং বড় রাজ্য এবং যে সমস্ত রাজ্য সরাসরি প্রতিনিধি পাঠাতে পারবেন না তাদের যুবরাজের সভাকক্ষের মনোনীত প্রতিনিধি। শ্রমিক এবং মালিক শ্রেণীও মূল সংগঠনগুলি প্রতিনিধি পাঠাবেন। এ-ছাড়াও সরকারের হাতে মনোনয়নের ক্ষমতা থাকবে। সরকার যখন মনে করবেন যে, কোনও বিশেষ মালিক বা শ্রমিকশ্রেণী থেকে যথেষ্ট প্রতিনিধিত্ব এই সম্মেলনে নেই, তখন সরকার ঐ শ্রেণী থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। তবে এই পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনে মালিক শ্রমিকের প্রতিনিধিবৃন্দ সংখ্যায় সরকারি প্রতিনিধিবৃন্দের সমান এমন কোনও ব্যবস্থা নিশ্চয় করা উচিত হবে না।

স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটি

স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির গঠনতন্ত্রের নমনীয়তা একটু কম হবে এটাই কাম্য। আপনাদের সামনে এই উপদেষ্টা কমিটির গঠনের যে খসড়া রাখা হয়েছে, তাতে থাকবে (১) আপনারা দেখতে পাবেন, এই কমিটি গঠিত হবে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (২) প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি। (৩) দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধি। (৪) মালিক শ্রেণীর প্রতিনিধি (৫) শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিনিধি। এই কমিটির সভাপতি থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দফতরের সদস্য।

স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির গঠনতন্ত্র রচনার সময় লীগ অব্ নেশনস্-এর আনুকূল্যে গঠিত অন্যতম সংগঠন 'আন্তর্জাতিক শ্রম-দফতরে'র পরিচালক সমিতির গঠনতন্ত্র যতটা সম্ভব অনুসরণ করা হয়েছে। আমার মনে হয়েছে তিনটি মৌলিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করে 'আন্তর্জাতিক শ্রম-দফতরে'র গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছে। প্রথমত সরকারি ও বেসরকারি তরফের সমান প্রতিনিধিত্ব। সংবিধানটির ধারা ৭ খন্ড-১এ এমন সংস্থানই করা আছে। ৩২জন প্রতিনিধির ১৬ জন সরকারের প্রতিনিধি এবং বাকি ১৬ জন বেসরকারি পক্ষের। এই সংস্থান অনুসরণ করেই আমরা আমাদের এই স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জন সরকারের এবং বাকি ১০ জন শিল্প সংস্থা থেকে অর্থাৎ মোট ২০ জন ঠিক করলাম।

আন্তর্জাতিক শ্রম-দফতরের সংবিধান রচনার দ্বিতীয় নীতিগত লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য শ্রমিক ও মালিকের সমান প্রতিনিধিত্ব। ঐ এক-ই অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে। ১৬টি বেসরকারি প্রতিনিধি আসনে শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষ থেকে সমান প্রতিনিধিত্বের সংস্থান রাখা হয়েছে। ঠিক এই ধারা অনুসরণ করে আমরাও ১০টি বেসরকারি প্রতিনিধি আসনে শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষের সম প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব দিচ্ছি।

তৃতীয় নীতি

তৃতীয় নীতি হল সংরক্ষণের মাধ্যমে কিছু স্বার্থ রক্ষা। এটা করা হয়েছে ধারা-৭ খণ্ড-২-এর মাধ্যমে যাতে ১৬টি সরকারি প্রতিনিধি আসনের মধ্যে ৬টি আসন অ-ইউরোপীয় রাজ্যগুলির জন্য হয়। ঐ এক-ই অনুচ্ছেদের খণ্ড-৪-য়ে বলা হয়েছে, মালিকপক্ষের জন্য নির্ধারিত আসনগুলির মধ্যেও ২টি আসন অ-ইউরোপীয় রাজ্যের প্রতিনিধির জন্য।

এই নীতি গ্রহণের জন্য শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষ—উভয়পক্ষের সংরক্ষিত আসনের মধ্যে একজন করে প্রতিনিধি ভারত সরকারের শ্রম-সদস্যের দ্বারা মনোনীত করার জন্য আমরা প্রস্তাব করেছি। এখানেও সেই সংরক্ষণের বাইরে যে মালিকপক্ষ বা বড় বড় শ্রমিক সংগঠনের শ্রম-গোষ্ঠী—তাদের স্বার্থরক্ষার সংস্থান করা যাবে। আশা করি, আমার প্রস্তাবে পরিচ্ছন্নতা বা স্বচ্ছতা বা ন্যায্যতা আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি।

এইসব কেন্দ্রীয় স্তরে গঠিত হলেও আপনারা ভালই জানেন, শ্রম-বিষয়ক ব্যাপার প্রাদেশিক স্তরেই বেশি প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। স্বাভাবিকভাবেই উঁচুতলায় তৈরি হওয়া একটি সমিতি নিচুতলার সমর্থনে কাজ করবে, এমনটা আশা করব। এই প্রসঙ্গে এই কথা বলে নেওয়া ভাল যদি প্রাদেশিক সরকারগুলি এক-ই পথে এগোয় অর্থাৎ এই এক-ই ধরনের সমিতি তৈরি করে শ্রম-সমস্যা সমাধানের পথে চলে, তবে সমিতি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আমি অন্তত তাদের সাহায্যের আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি দিলাম।

পূর্ণাঙ্গ শ্রম সম্মেলন এবং স্থায়ী কমিটির গঠন

ত্রিপাক্ষিক শ্রম-সম্মেলনে একটি পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের এবং একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জনা পঞ্চাশেক প্রতিনিধি। এঁরা প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের এবং কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের

এবং প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রমজীবি সংগঠনগুলির। মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর এই সম্মেলনের **উদ্বোধন করেন।**

শ্রমিকপক্ষ এবং মালিকপক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিয়ে সহমত পোষণ করেন।

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী ভি. ভি. গিরি এই সম্মেলনের স্থাপনা এবং তার নিয়মাবলী নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তিনি এই আশা ব্যক্ত করেন যে, সম্মেলনের উদ্দেশ্য শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি ঘটানো এবং শিল্পে শান্তি স্থাপনে অগ্রনী ভূমিকা নেবে।

ভারতীয় শ্রম-ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী যমুনাদাস মেহ্‌তা মন্তব্য করেন যে, সম্মেলন বর্তমান সংকট সময়ে শিল্পে শান্তি এবং সন্তোষের পথনির্দেশ করবে।

মালিকপক্ষের দুটি সর্বভারতীয় সংগঠনের সভাপতি যথাক্রমে স্যার এ. আর দালাল এবং শ্রীযুক্ত শ্রী শ্রী রাম মালিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন হায়দ্রাবাদ, বরোদা এবং গোয়ালিয়র রাজদরবারের প্রতিনিধিবৃন্দ। রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিবৃন্দের উপস্থিতি উপস্থিত সকলের হার্দিক সমাদর অর্জন করে।

পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনের গঠন হল ৪৪ জন সদস্য সমন্বয়ে। এর মধ্যে ২২ জন সদস্য বিভিন্ন সরকারের প্রতিনিধি। বাকি ২২ জনের ১১ জন শ্রমিকপক্ষের আর অবশিষ্ট ১১ জন মালিকপক্ষের। এর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করবেন ভারত সরকারের শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য।

একইভাবে স্থায়ী উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি হলেন ভারত সরকারের শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য। এই কমিটির সদস্যসংখ্যা ২০ জন। এর মধ্যে ১০ জন সরকারি প্রতিনিধি এবং বাকি ১০ জন সমভাবে মালিক এবং শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি।

ভারত সরকারের শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্য যিনি সম্মেলনের সভাপতিত্ব করলেন, তিনি ভারত সরকারের তরফে এই সহমতে পৌঁছলেন যে, সম্মেলনে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধি দু পক্ষের সংগঠনের সঙ্গে মত বিনিময়ের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

৪

* ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার উপদেষ্টা সমিতিতে একজন সদস্যের নির্বাচন

মান্যবর ড. বি.আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি এই প্রস্তাব উত্থাপন করছি :

"যে বিধানসভা এমত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোক যার দ্বারা মাননীয় সভার একজন প্রতিনিধিকে মাননীয় সভাপতি ভারতের সরকার বাহাদুর কর্তৃক ভারতীয় ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার কর্মসম্বন্ধীয় সমস্যা নিরসনের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতে নিয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।"

মাননীয় সভাপতি (মান্যবর স্যার আবদুর রহিম) : প্রস্তাব উত্থাপন করা হ'ল :

"বিধানসভা এমত নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোক যার দ্বারা মাননীয় সভার একজন প্রতিনিধিকে মাননীয় সভাপতি ভারতের সরকার বাহাদুর কর্তৃক ভারতীয় ভূতত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার কর্মসম্বন্ধীয় সমস্যা নিরসনের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতে নিয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।"

† মান্যবর ড. বি. আর. আম্বেদকর :

এটা সত্যি যে, আমার মাননীয় বন্ধু আমার প্রথম ভাষণ শোনেন নি। আমি জীবনে অনেক ভাষণ দিয়েছি। কাজেই আমার মনে হয় না যে, এখানে প্রথম ভাষণ দেওয়া আমার কাছে ভীতিপ্রদ হবে।

আমার মাননীয় বন্ধু এমন ইঙ্গিত করেছেন যে, সংশ্লিষ্ট বিভাগ এমন অন্ধকারে পড়ে আছে যে এই সভাকে কোনও আলোকপাত করা যাচ্ছে না। আমি আমার

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), তৃতীয় খণ্ড ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২। পৃ: ৭৬।
† বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), তৃতীয় খণ্ড, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২। পৃ: ৭৬।

মাননীয় বন্ধুবরকে আশ্বস্ত করতে পারি এই বলে যে, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যে, আমি নিজে বা ভারতের সরকার বাহাদুরের লজ্জিত হবার ব্যাপার আছে। আমি যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করলাম তখন এমনটা ভেবেই করেছিলাম যে, সাধারণভাবে এ ধরনের অন্যান্য প্রস্তাবের ক্ষেত্রে যা হয় এক্ষেত্রে তা হবে। আলোচনা চলবে। আমার কাছে এমন যদি বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত থাকত যে আমার বন্ধু এইসব প্রশ্ন তুলবে,ন তবে স্বাভাবিকভাবে আমি আগাম তৈরি হয়ে আসতাম।

[**জনৈক মাননীয় সদস্য:** সভার কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে আপনি অবহিত হবেন এমন আশা করা যায়]

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আমি একজন নতুন সদস্য। আমি এই সভার কাছ থেকে সামান্য বদান্যতা আশা করতে পারি। আমার বন্ধু যে তথ্য জানতে চেয়েছেন তা তিনি অবশ্যই জানতে পারবেন। কিন্তু তাঁর দাবি যদি এমন হয় যে, সভায় এই প্রস্তাব আলোচনার আগেই তথ্য জ্ঞাপন করতে হবে, তবে আমার নিবেদন এই যে, আজকের সভার এই বিতর্ক পরে কোনও দিনের জন্য স্থগিত থাক যেদিন আমি তথ্যজ্ঞাপনের জন্য তৈরি হয়ে আসব।

মাননীয় সভাপতি (মান্যবর স্যার আবদুর রহিম):

মাননীয় সদস্য (শ্রী নিয়োগী) তাঁর প্রশ্নের যা চেয়েছেন, অর্থাৎ সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। আমার মনে হয় যে সভার বোধহয় ইচ্ছা যে আজকের মতো এই প্রস্তাব মুলতুবি থাক। (কন্ঠস্বর : হ্যাঁ)

প্রস্তাব মুলতুবি থাকল।

□ □ □

৫

ভারতবর্ষের পরিস্থিতি

মাননীয় সভাপতি (মান্যবর স্যার আবদুর রহিম) : সভা এখন নিচের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে।

"ভারতবর্ষের পরিস্থিতি"

* * * * * * * * * * * * * * *

*মান্যবর ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য) মহাশয়, গত দু-তিন দিন ধরে একটি প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক চলছে। বিতর্কের এ-পর্যন্ত ফলশ্রুতি সভার সদস্যদের বিবেচনাপ্রসূত দু'টি নির্দিষ্ট মত।

একটি মতে, কংগ্রেস দলের সদস্যের গ্রেফতার করা এবং যে চরমপন্থী আন্দোলন চলছে তাকে দমন করা সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ হয়নি।

অন্য একটি মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ যুক্তিসম্মত।

এমতাবস্থায় সরকার বলতে পারে, এই বিতর্কে ঢুকে পড়া হয়ত প্রয়োজন হবেনা এই কারণেই যে, এই সভাতেই দুই বিরুদ্ধ মত একে অন্যকে বাতিল করতে তৎপর। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, বিশেষ করে যখন আমার মাননীয় সহকর্মী আইন দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বলেন যে, সরকারী সদস্যদের, বিশেষ করে নির্বাহী পরিষদের ভারতীয় সদস্যদের উচিত নয় আলোচনা জিইয়ে রাখা। আমার মনে হয়েছে, এই প্রসঙ্গে সভার একটি অংশের মতামতের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বরং সভার সামগ্রিকভাবে এই ব্যাপারে আলোচনার দায়িত্ব বহন করা, এটা সময়ের প্রয়োজন। সেই হিসাবে আমি আমার দায়িত্ব পালন করব। সভার এক অংশ এই মত পোষণ করেন যে, সরকারের পদক্ষেপ সঠিক হয়নি। এই মতের ওপর আমার বক্তব্য পেশ করব।

এ পর্যন্ত যা সব মতামত এই সভায় উঠে এসেছে, সেগুলোকে স্পষ্টত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু অভিমত প্রকৃতিতে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। কিছু মত

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়). তৃতীয় খণ্ড, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২। পৃ: ২৮১-৮৭।

সাধারণভাবেই গুরুত্বের দাবিদার। আমরা শুধু তাৎপর্যপূর্ণ মতামতের ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব এমনটা হওয়া উচিত নয়। তবুও সময়াভবে একত্মাড়া অভিযোগের মধ্যে কতগুলো বেছে আলোচনা করা যেতে পারে। সরকারের বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ তোলা হয়েছে তার মধ্যে দুটিকে নিয়ে আমি আলোচনা করব।

মহাশয়, সরকারের যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁদের মতে কংগ্রেস দলের সভ্যদের গ্রেফতার করে সরকার সঠিক কাজ করেনি। এই সমস্ত তার্কিকদের যুক্তি আমি প্রনিধান করে থাকি তবে এটুকু বুঝি যে, তাঁদের সওয়ালের প্রতিপাদ্য হল কংগ্রেস দলের অহিংসার নীতি। অর্থাৎ কংগ্রেস হল এমন একটি দল, যার নীতিই হল অহিংসা, যে দল বিশ্বাস করে অহিংসায়। কাজেই কংগ্রেস সভ্যদের যদি গ্রেফতার না করে মুক্ত করে রাখা হত, তবে তাদের কর্মসঙ্কলন এমনভাবে হত যাতে হিংসার বীজের অঙ্কুরোদগম ঘটত না। কিন্তু, আমার মনে হয়, যাঁরা এই ধারার চিন্তা-ভাবনা করছেন তাঁরা গত দু'বছর যাবৎ কংগ্রেস দল এবং তার কর্মসমিতির ক্রিয়াকর্ম এবং অহিংস নীতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত নন। মহাশয়, আমি গত দু'বছর ধরে কংগ্রেসের কর্মসমিতির কার্য-বিবরণ পড়েছি, তাতে আমার যা মনে হয়েছে, কংগ্রেসের অহিংস নীতিবাদে এক সাংঘাতিক রকমের ধস নেমেছে। দ্বিধা না রেখেই বলি অহিংস নীতি কবরস্থ।

এই সভায় কয়েকটি তথ্য পেশ করা যাক। ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর কংগ্রেস প্রথম আইন অমান্যের ডাক দেয়। ১৯৪০ সালের তারিখ ১৯ মার্চ রামগড়ে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশন গান্ধীজিকে সংগ্রাম পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব দেয়— এককথায় গান্ধীজি বৃত হলেন এক অর্থে একনায়ক পদে। প্রস্তাবে গান্ধীজিকে করা হল নিরঙ্কুশ ক্ষমতাসম্পন্ন এক নেতা, সর্বাধিনায়ক। কিন্তু মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই ১৯৪০ সালেরই ২২ জুন গান্ধীজি তাঁর সর্বাধিনায়কত্বর পদ থেকে হলেন প্রায় অপসৃত। কংগ্রেসের কার্যনিবাহি সমিতি তাঁর অহিংস নীতিই লক্ষ্য-নির্ধারিত নীতি বলে মেনে নিতে পারল না। গান্ধীজে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করতে হল।

ড. পি. এন. ব্যানার্জি : (কলকাতা শহরতলী, অ-মুসলমান, পৌর) এই ঘটনা যুদ্ধ সম্পর্কিত ঘটনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : 'দয়া করে আমাকে বাধা দেবেন না। ১৯৪০ সালের ৫ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি' বোম্বাইতে মিলিত

হয় এবং সেখানে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, যার ফলে গান্ধীজিকে পুনর্বার সর্বাধিনায়ক করা হয়। সেখানে তাঁকে অনুরোধও করা হয় সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য। এইভাবে চলল ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর অবধি গান্ধীজিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে বরদলুইতে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহি সমিতির এক সভা বসে এবং সেখানে পুনরায় এক প্রস্তাবে গান্ধীজিকে পদচ্যুত করা হয়।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর ঘটে যাওয়া ঘটনার উল্লেখযোগ্য দিকটি, মনে হয়, এই সভার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। বরদলুইয়ে কর্মসমিতিতে একটা বিরাট ফাটল ধরে। গান্ধীজি এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ছিলেন তাঁরা যাঁদের বিশ্বাস আন্দোলনের যে কোনও স্তরেই অহিংসপন্থাই একমাত্র ও শেষ পন্থা। অন্যদিকে ছিলেন কর্মসমিতির অন্যান্য—সদস্যরা অহিংসপন্থায় যাদের আস্থা নেই। কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্ধা অধিবেশনে বিষয়টিকে ঠেলে দেওয়া হল। এবং আবশ্যিকভাবে কর্মসমিতির সদস্যরা আশা করেছিলেন যে, গান্ধীজি সিদ্ধান্তের জন্য বিষয়টি আলোচনায় তুলবেন এবং এর ফলে বেরিয়ে আসা সিদ্ধান্তটির ওপর নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এমন আশা করা হয়েছিল যে, বরদলুইতে গৃহীত কংগ্রেস কর্মসমিতির সিদ্ধান্ত যদি এই ওয়ার্ধায় খারিজ হয়ে যায় তো ভাল, নচেৎ গান্ধীজির পক্ষে অহিংসনীতির ধ্বজাটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত হবে। অতএব তাঁর পদত্যাগ অনিবার্য। কিন্তু কর্মসমিতির প্রস্তাব যখন অনুমোদনের জন্য ওয়ার্ধা অধিবেশনে পেশ হল তখন অহিংসনীতির নিয়ত প্রবক্তা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে দলত্যাগ তো করলেনই না বরং অনুগামীদের ওপর মত-বিভাগ (division) যাতে না হয় এমন নির্দেশ জারি করলেন। শুধু তাই নয়, কর্মসমিতির সঙ্গে থেকে গেলেন এবং সর্বাধিনায়কের যে আসনে বৃত হয়েছিলেন সেই আসনেই অধিষ্ঠিত রইলেন। মহাশয়, এমনসব ঘটনাই যদি প্রমাণে যথেষ্ট না হয়, যে কংগ্রেস হিংসার দ্বারা পরিপৃক্ত, কংগ্রেসের নাকের ডগায়—শ্রী গান্ধী—আমি জানি না এই বিষয়ে আর কি উপযুক্ত সবুদ দেওয়া যেতে পারে।

আরও একটি বিষয় আছে। সভার মাননীয় সভ্যবৃন্দ যা জানেন না, সেই বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে চাই। কংগ্রেস কার্যনির্বাহি সমিতির প্রায় সব সদস্যেরই অহিংসপন্থায় আস্থা হারিয়েছেন। সমিতির অনেকেই এই নীতি নিয়ে ভাবেন না। কিন্তু এর থেকে আরও বড় কথা হল, কংগ্রেসের মধ্যেই সহিংস আন্দোলনের ছক কাটা হচ্ছে।

সর্দার সন্ত সিং : যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যপার স্যাপার নিয়ে..............

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : দয়া করে আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দেবেন না—

সর্দার সন্ত সিং : আপনি মিথ্যাভাষণ দিচ্ছেন।

কয়েকজন মাননীয় সভ্য : এটা ঠিক নয়। কোনও প্রমাণ আছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বেঠিক ভাষণ দিচ্ছি না। একটি ঘটনার উল্লেখ এখনও এই সভায় করা হয়নি, যার উল্লেখ আমি করতে চাই। দেওলি রাজনৈতিক বন্দী শিবিরে একটি ঘটনা ঘটেছিল। ঐ বন্দী শিবিরে ছিলেন শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ। সভা বোধহয় অবহিত আছে, ঐ বন্দী শিবিরের অধীক্ষক কিছু কাগজ আটকাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাগজগুলি শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ গোপনে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিতে। কিন্তু এই ঘটনা ঘটে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে। যাঁদের কংগ্রেসের ভেতরে এবং তার কার্যনির্বাহি সমিতির মধ্যে কি ঘটছে তা জানার আগ্রহ আছে, তাঁদের কাছে কাগজপত্রের লেখাগুলি সর্বাধিক আকর্ষক বলে মনে করি। কি আছে এই দলিলে? এই দলিলে, আমি যদি ঠিকভাবে পড়ে যেতে পারি, তাহলে দেখা যাবে চার থেকে পাঁচখানা বিষয় পাওয়া যাবে।

প্রথমত—আমি নারায়ণের নিজের বক্তব্য তুলে দিচ্ছি —'সত্যাগ্রহ যা গান্ধীজি প্রয়োগ করছেন বা প্রয়োগ করতে চাইছেন, বেশিরভাগ কংগ্রেসিই মনে করেন সেটা বুদ্ধিহীনের ভাঁড়ামি। এর কোনও অর্থ নেই। দ্বিতীয়ত শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণ মনে করেন, যদি কংগ্রেস তার লক্ষ্য পূরণ করতে চায়, তাহলে নৈতিক জয় অপেক্ষা রাজনৈতিক জয় অর্জনে এগিয়ে যাবে। তা আবার গান্ধীজিকে আঘাত করা হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই দলিলে যা ব্যক্ত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে এমন কিছু রাজনৈতিক আছে, যারা অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাস তো করেই না বরং তারা সহিংস আন্দোলনের শপথ নিয়ে বসে আছে এবং আটক করা কাগজপত্রে সে সমস্ত দলের উল্লেখ আছে। আমি দেখেছি, এই সমস্ত দল কংগ্রেসের মধ্যেই আছে। ভারতের কম্যুনিস্ট দল, বাংলার বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল, কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, হিন্দুস্তান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিকল্পনার যা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে কম্যুনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে অন্যান্য সমস্ত দল একত্রিত হয়ে একটি দলে পরিণত হক এই ছিল সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন। এবং একত্রিত হয়ে কংগ্রেসের মধ্যে-ই থেকেই কাজ করবে, তবে গোপনে। জয়প্রকাশ নারায়ণের

আরও ইঙ্গিত যে এই গুপ্ত দলটি কেবল কংগ্রেসের মধ্যে থাকবে না, অর্থের প্রয়োজনে রাজনৈতিক ডাকাতিও করবে।

বিবেচক সদস্যদের যদি দুটি ঘটনার পর কংগ্রেসের এই কথার কথা অহিংসাবাদে বিশ্বাস করেন, তবে জানি না, এর চেয়ে ভাল তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে। মহাশয়, সরকারের তরফে পদক্ষেপের কারণ বলা যায়।

এবার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ যা আমি নির্বাচন করেছি, আমার এই সভায় প্রথম বক্তৃতার জন্য বিরোধী সদস্যরা বলেছেন যে, সরকার চালাতে গেলে কখনও কখনও দমননীতির প্রয়োজন হয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু গঠনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। গঠনমূলক পদক্ষেপ সম্বন্ধে সভায় বিভিন্ন মতামত উঠে আসায় আমি আশ্চর্য না হয়ে এই মতের মিশ্রণের মধ্যে ছাঁকনি দিয়ে আমি কেবল একটি মত নিয়েই আলোচনা শুরু করি। বলা হয়েছে যে, আজকের সরকার হবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর নতুন ভাবনার এবং কাজ করবে জাতীয় সরকার হিসাবে। এখন, এই সভায় আমার মতামত জানাতে গিয়ে বলতে পারি, এই সরকার যেমন হওয়া উচিত তাই হয়েছে। সভার মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে, 'ভারত শাসন আইন'র ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে সামরিক এবং অসামরিক শাসন সম্বন্ধীয় যাবতীয় কর্ম তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত আছে বড়লাটের পরামর্শ পরিষদ্। আমি কিছুটা সাংবিধানিক আইনজ্ঞ। আমি নিজেকে কখনই বিশেষজ্ঞ মনে করিনা। তবে আমি নিজেকে অবশ্যই ছাত্র বলে মনে করি। ছাত্র হিসাবে এই ধারা ৩৩ নম্বরকে খুঁটিয়ে দেখে এবং অন্যান্য সংবিধানের এই ধারাকে নিরীক্ষা করে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভারতবর্ষের সরকার তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই যে, ৩৩ নম্বর ধারা অনুসারে চালিত এই সরকার দুটি সীমাহীন গুরুত্বের পরিচয় বহন করে। একটি স্বৈরতন্ত্রের মূলোৎপাটন। দ্বিতীয়টি সরকার পরিচালনায় সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা যা ভারতীয় জনগণের হৃদয় থেকে উৎসাহিত........

মাননীয় এক সভ্য : এই পরিচয় কি কাজে দেখা যাচ্ছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি সে-কথায় যাচ্ছি। এই আইনে যথেষ্ট সুযোগ আছে। সরকার চালাবার দায়িত্ব এককভাবে বড়লাটের নয়—দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে সপার্ষদ বড়লাটের।

শ্রী যমুনাদাস এম. মেহতা (মধ্য বোম্বাই : অ-মুসলমান, গ্রামীণ) : স্বরাষ্ট্র সচিবের অনুমতি সাপেক্ষ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সে আলোচনায় আসছি। অবস্থানগত দিক থেকে কার্যনির্বাহি পরিষদের প্রতিটি সভ্যই বড়লাটের সহকর্মী। এই অবস্থান সবসময় মনে রাখা দরকার, ভুলে যাওয়া কখনই উচিত নয়। আর এর-ই পরিপ্রেক্ষিতে আমি নিবেদন করছি যে, ভারতবাসী একটি এমন সরকার চাইছিল, যে সরকার চরিত্রে হবে স্বৈরতন্ত্র থেকে মুক্ত এবং আইনের দ্বারা যা পরিচালিত—চলিত রীতি অনুযায়ী নয়—পরিচালনায় যৌথ দায়িত্ব প্রবর্তন করা হবে যার উদ্দেশ্য। এই সভার কাছে আমার নিবেদন এই যে, এর থেকে ভাল, এর থেকে উজ্জ্বলতর বৈশিষ্ট্যের কোনও সরকার গঠন সম্ভব নয়। যদিও এমন একটি সরকারের সমালোচনায় বলা হয়েছে বা হচ্ছে, এই সরকার যৌথ দায়িত্বের সরকার তবু সে নাকি রাজপ্রতিনিধি (Vicering) এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের (Secretary of State) ভোটের ওপর নির্ভরশীল।

শ্রী যমুনাদাস এম. মেহতা : শুধুই ভোটের ওপর।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ভেটো বলছি। আপনারা বলতে পারেন আদেশ। প্রসঙ্গত সংবিধান আমার বিষয় বলে আমি সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করব........

একজন মাননীয় সদস্য : হোয়াইটহল থেকে এক মাস্টারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হচ্ছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি যা বলতে চেয়েছি তা হল, এই সরকার কোনও স্বাধীন সরকার নয়। এই সরকার আবশ্যিকভাবে রাজপ্রতিনিধি [Viceroy] এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের [Secretary of State] ভেটোর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই রাজ-প্রতিনিধির ভোটোর ব্যাপারে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই যে এই ভেটোর প্রয়োগ শুধু ভারতবর্ষের সুরক্ষা, শান্তি এবং স্থিতির ক্ষেত্রেই করা হয়। এটি সাধারণ ভেটো। দৈনন্দিন শাসন বিষয়ে এই ভেটোর প্রয়োগ হয় না।

সর্দার সন্ত সিং : আমি কি একটি প্রশ্ন করতে পারি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আপনি এখন কোনও প্রশ্ন করবেন না। আমার হাতে সময় খুব অল্প। তর্কের খাতিরে আমি ধরেই নিচ্ছি যে, ভেটো থেকেই যাচ্ছে। আমি অনেক সংবিধান পড়েছি। ভেটো নিয়ে ভয় আমার।

সর্দার সন্ত সিং : আমি একটি আইনি প্রশ্ন করছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আপনি আমাকে প্রশ্ন পরে করবেন। এখন আমার এ বিষয়ে ভাষণ দেবার সময় নেই।

আমি ভেটোর অস্তিত্ব স্বীকারে রাজি আছি। ভেটো আছে। ভেটো নিয়ে বিব্রত মাননীয় সদস্যদের প্রতি আমার প্রশ্ন : ভেটোর বৈশিষ্ট্য কি? ভেটো বলতে কি বুঝায়? পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা যাক। কেননা, দেখছি মাননীয় সদস্যদের মনে এর সাংবিধানিক দিকটি নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। স্বৈরতান্ত্রিক সরকার এবং দায়িত্বশীল সরকারের মধ্যে ফারাকটি কি। জার্মানিতে হিটলারের শাসণাধীনে যে সরকার ছিল, আর গ্রেট ব্রিটেনে যে সরকার আছে? তাদের মধ্যে প্রভেদটা কি?

এর উত্তর খুব সহজ.........(বক্তব্যে ব্যাঘাত)

মাননীয় অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : শান্তি, শান্তি। মাননীয় সদস্যরা এভাবে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর: ....এর উত্তর খুব সহজ। আমি খুব স্পষ্টভাবে বলি, স্বৈরতন্ত্র আর দায়িত্বশীল সরকারের মধ্যে ফারাকটি হচ্ছে— স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভেটো শব্দটির কোনও পরিচয় নেই, যেটা দায়িত্বশীল ব্যবস্থায় আছে। এই সহজ উত্তরটি সহজে বুঝে নেওয়া উচিত। যাঁরা সংবিধান নিয়ে সম্যক জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করেন বা সংবিধান রচনার পরিকল্পনা করছেন, তাঁরা এই ব্যাপারটি মাথায় রাখবেন বলে আশা করি।

মহাশয়, একমাত্র প্রশ্ন বা একমাত্র কলহ— কোথায় ভেটোর প্রয়োগ হবে? এটি কি স্বরাষ্ট্রসচিবের না কি এটি রাজ-প্রতিনিধির অধিকারে থাকবে, না কি অন্য প্রতিষ্ঠান এর ব্যবহার ক্ষমতার অধিকারী হবে? এখানেই মূল বিতর্কটি। অন্তত যাঁরা দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকারে বিশ্বাস করেন, তাঁদের কাছে এটিই বড় জিজ্ঞাসা বলে মনে করি। তাহলে যে প্রশ্নটি আসে, সেই প্রশ্নটি হল : ভেটো ক্ষমতা যদি স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাতে ন্যস্ত না থাকে, তবে কার হাতে ন্যস্ত থাকবে? আমার মনে হয়, যদি স্বরাষ্ট্র-সচিবের হাত থেকে এই ক্ষমতা হস্তান্তর করি, তাহলে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হোক ব্যবস্থাপক সভার হাতে। মনে হয় এটিই সঠিক জায়গা যেখান থেকে ভেটো ক্ষমতার সঠিক ব্যবহার হবে। এছাড়া দ্বিতীয় জায়গায় নেই ভেটোর।

স্যার সৈয়দ রেজা আলি : (যুক্ত প্রদেশের শহর : মুসলমান) : এটি শুনে বেশ ভাল লাগছে যে আমার মান্যবর বন্ধুর অবশেষে ব্যবস্থাপক সভার কথা মনে পড়ল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রশ্নটি তাহলে হল এবং মনে করি খুব সোজা প্রশ্ন। আমরা কি ভেটো ক্ষমতাটি এই ব্যবস্থাপক সভার হাতে তুলে দেব কিনা? (পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রের বাধাদান) আমি আপনাকে সাংবিধানিক আইনের শিক্ষা দিতে পারি না। আমি ক্লাশ খুলতে পারি না। আমার জীবনের পাঁচ বছর ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে আইন কলেজে এই বিষয়ে শিক্ষাকতা করে। ভেটো ক্ষমতা কি ব্যবস্থাপক সভার হাতে হস্তান্তর করতে পারি? আমি প্রশ্নটি ব্যবস্থাপক সভার বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করছি কারণ, দাবি উঠেছে ব্রিটিশ সরকার অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করুক। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেখতে হবে যে, যে আশ্রয় বা আধারে আমরা ভেটো ক্ষমতা রাখতে চাইছি, সেই আশ্রয়টি কতটা উপযুক্ত বা তার উপযোগিতা কতটুকু?

এই ব্যবস্থাপক সভার গঠন বা চরিত্রটি কি? মহাশয়, আমি এই সভা সম্বন্ধে কোনও অসম্মানজনক মনোভাব পোষণ করিনা বা ব্যক্তও করব না তবে এটি খুব সত্যি যে, সময়ের প্রবাহে দেখা যাচ্ছে এই সভা প্রায় মৃত অবস্থায় এসে পৌঁচেছে।

সর্দার সন্ত সিং : এর স্বাভাবিক ঘটনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই সভা নির্বাচিত হয়েছিল তিন বছরের জন্য। কিন্তু তিন বছরের নির্বাচিত সভা চলছে নয় বছর ধরে। এই সভার সভ্যগণ তাঁদের স্ব-স্ব নির্বাচকমণ্ডলীর যে কর্তৃত্বাদেশ (mandate) শিরোধার্য করেছেন সেও বাসি হয়ে গেছে।

আমি এ-বিষয়ে আর কিছু বলব না। বরং সভার গঠন নিয়ে একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

মাননীয় অধ্যক্ষ (মাননীয় আবদুল রহমান) : মাননীয় সদস্যের জন্য নির্দিষ্ট সময় ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (প্রেসিডেন্সি বিভাগ : অ-মুসলমান, গ্রামীন) : মাননীয় সদস্য যা বলেছেন তার সঙ্গে বর্তমান আলোচনার যোগাযোগ নেই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আপনি যদি মনে করেন যে আমার সময় শেষ হয়ে গেছে....

মাননীয় অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুল রহিম): সময়ের এই সীমা নির্দেশ

সমস্ত দলের মিলিত আলোচনার ফল। অতএব আমি এই নির্দিষ্ট নির্দেশ প্রয়োগ করতে বাধ্য।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আমার বক্তব্যের যতি টানছি। আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে বিশ্লেষণ করুন, কর্তৃত্বাদেশ (mandate) অনুসারে এবং সভার বিরোধী সদস্যদের অভিমত অনুসারে বিশ্লেষণ করুন। এর প্রতিনিধিত্বের চরিত্র, নির্বাচকমন্ডলীর চরিত্র বিশ্লেষণ করুন। এ ব্যাপারে আমার সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই সভায় প্রতিনিধিবৃন্দের গঠন এমন নয় যে, কোনও জাতীয় সরকারের ওপর ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য বিবেচিত হতে পারে।

শ্রী যমুনাদাস এম. মেহতা : আপনি এই অধিবেশন কেন ডেকেছিলেন?

(সভায় এরকম আরও বাধাদান)

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকরর : বিষয়টি হল, এই সত্য স্বীকার করে নিতে হবে যে, এই সভার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগের মতো প্রয়োজনীয় প্রতিনিধিত্ব নেই। অথবা আজকের এই যুদ্ধকালিন পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের এই বিধানসভাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে পারি কিনা যেখানে পর্যাপ্ত হিন্দু, পর্যাপ্ত মুসলমান, পর্যাপ্ত নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতিনিধি থাকবেন, যার ফলে এই সভার চরিত্রটি একটি জাতীয় জীবনের প্রতিফলন হয়।

অতএব, আমার নিবেদন, জাতীয় সরকারের জন্য যে দাবি উঠেছে, তা নিশ্চিতভাবেই বিভ্রান্তিকর চিন্তার ফসল। আমি যাতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভাবছি, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক মীমাংসা, তাকে এড়িয়ে যাবার প্রয়াস। যতক্ষণ না সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসা হচ্ছে, ততক্ষণ এই সভার নতুন রূপদান এমন অবস্থায় করা নির্বাহিদের অস্বীকার করে এই সভার হাতে দায়িত্ব অর্পণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, নতুন সংবিধানে যা অন্তর্ভুক্ত হবে। মহাশয়, এ-বিষয়ে নিয়ে আর অগ্রসর হতে পারছি না, যেহেতু আমার সময় শেষ। আমি আসন গ্রহণ করলাম।

৬

*ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার উপদেষ্টা সমিতিতে একজন সদস্যের মনোনয়ন

মাননীয় অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় ড. আম্বেদকর গত সোমবার ১৪ সেপ্টেম্বর যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হোক। ড. আম্বেদকরের সেদিনের অনুরোধ ছিল যে, পেশ করা প্রস্তাবের আলোচনা যেন আজও লাগু থাকে, কারণ তাঁর কিছু তথ্য দেওয়ার আছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য) মহাশয়, আমি কি জানতে পারি, সংশোধনটি নিয়ে আলোচনা কিভাবে চলবে? তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হবে। কারণ মূল প্রস্তাব এবং সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে এক-ইসঙ্গে আলোচনা চালানো যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : আমি মনে করি, মাননীয় সভ্যবৃন্দের যাঁরা সংশোধনী আনতে চাইছেন, তাঁরা তাঁদের সংশোধনী আনুষ্ঠানিকভাবে এখন পেশ করতে পারেন। মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব তাহলে একইসঙ্গে চলতে পারে।

শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ. এসাক সাইত : (পশ্চিম উপকূল এবং নীলগিরি, মুসলমান প্রতিনিধি) : মহাশয়, আমার সংশোধনী—

প্রস্তাবে 'একক প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়েছে।'

আমার সংশোধনী 'চারজনের প্রতিনিধিত্ব।'

অধ্যক্ষ মাননীয় আবদুল রহিম : সংশোধনী আলোচনার জন্য পেশ করা হল। সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী ''একক প্রতিনিধিত্ব, শব্দগুলির বদলে 'চারজনের প্রতিনিধিত্ব।'

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), তৃতীয় খণ্ড, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৪২। পৃ: ৩৩৯-৪২।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (প্রেসিডেন্সি বিভাগ : অ-মুসলমান গ্রামীণ) : আমার সংশোধনী— 'একক প্রতিনিধিত্ব' শব্দগুলি পরিবর্তিত হোক 'তিনজনের প্রতিনিধিত্ব' শব্দসমূহের দ্বারা

অধ্যক্ষ : এই সংশোধনী প্রস্তাবও আলোচনার জন্য গৃহীত হল :

'একজনের প্রতিনিধিত্বর' বদলে হবে 'তিনজনের প্রতিনিধিত্ব'।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, মূল প্রস্তাব এবং সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনায় দুটি প্রশ্ন উঠে আসছে। গতবার যখন আমি প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য পেশ করি, তখন আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী নিয়োগি মহাশয় ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার গঠনতন্ত্র সম্বন্ধে কিছু তথ্য এই সভার কাছে পেশ করতে বলেছিলেন, এই সভার মনে থাকতে পারে যে, ঠিক তার পরের দিন মান্যবর শ্রী নিয়োগি এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছিলাম, সেখানেই সদ্ব্যবহার শাখার ব্যাপারে আমি কিছু তথ্য এই সভায় পেশ করেছিলাম। আমি জানিনা, আমার মান্যবর বন্ধু বা অন্য সভ্যরা এই শাখা সম্বন্ধে আরও কোনও তথ্য দাবি করবেন কিনা। এখন আমার মনে হচ্ছে যে, কিছু তথ্য সম্ভবত দেওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ, এগুলি মূল প্রশ্নের উত্তর হিসাবে দেওয়া যাবে না। আর এ-ছাড়াও মূল প্রশ্নের সঙ্গে যে সম্পূরক প্রশ্নটি এল সেই প্রশ্নটিও বড় অদ্ভুত। এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কারণেও তথ্যজ্ঞাপন করা, হয়ে ওঠেনি। সেদিন যে তথ্যজ্ঞাপন করা হয়ে ওঠেনি সেই তথ্য আজ এই সভায় দেবার প্রস্তাব করছি।

আগের দিন সম্ভবত যা বলা হয়নি আজ তার জানাচ্ছি। সদ্ব্যবহার শাখার কর্তব্য নিজের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই তিনটি কর্তব্য : প্রথম, খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান—এর জন্য বিভিন্ন স্থানে কাজ চালিয়ে যাওয়া ; দ্বিতীয়, অনুসন্ধান ফলবতী হলে পরবর্তী ধাপে, যেখানে প্রয়োজন, সেখানে প্রাথমিক খননকার্য শুরু করা এবং তৃতীয়, প্রয়োজন আরও বাড়লে পরীক্ষা নিরীক্ষা বৃদ্ধি করা। যেমন খনিজ ধাতুকে সুবিন্যস্ত করে তাকে শ্রেণীবদ্ধ করা এবং তাকে পরিষ্কার করে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা। ধাতু গলানো থেকে শুরু করে অন্যান্য কাজও এর মধ্যে পড়ে। সদ্ব্যবহার শাখার এই হল তিন মুখ্য দায়িত্ব।

সদ্ব্যবহার শাখার কর্মের যে অনুক্রম ঠিক হয়ে আছে, সেটি সভার সামনে উপস্থিত করি। অনুক্রম ৬ ভাগে বিভক্ত। (১) মেওয়ারের উদয়পুর প্রদেশে অন্তর্গত জাওয়ারে সীমা এবং দস্তার খনির কাজ আবার শুরু করা; (২)

রাজপুতানা অভ্র খনির উন্নয়ন; (৩) বালুচিস্তানের গন্ধক ভাণ্ডার নিয়ে কাজ; (৪) বাংলা এবং মধ্যপ্রদেশে লৌহ আকরের ওপর কাজ কিছু কিছু আর সম্পদ ভাণ্ডারের ওপর পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালানো এবং (৬) কিছু কিছু খনিজ দ্রব্য, পাথর এবং লবণের অনুসন্ধান চালানো।

তৃতীয় যে প্রশ্নটি যার ওপর আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী নিয়োগি তথ্যানুসন্ধান করছেন সেটি হল, এই সদ্ব্যবহার শাখার সঙ্গে শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের সম্পর্ক। মহাশয়, অবস্থা এইরকম : শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের কারবার তিনটি জিনিস নিয়ে—আবিষ্কার, রসায়ন এবং প্রাকৃতিক লবণ। সদ্ব্যবহার শাখার কারবার খনিজ দ্রব্যের এবং তার সঠিক ব্যবহার। আবিষ্কার দুটিই। একটি উদ্ভাবন [invention] অন্যটি উদঘাটন (discovery)। স্পষ্টতই দুয়ের কাজের ফারাক আছে। একইসঙ্গে দুয়ের পারস্পরিক সম্পর্কও আছে। যেমন ড. ফক্স, যিনি ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার দায়িত্বে আছেন তিনিই আবার শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের অধীন ভারি রাসায়নিকের ওপর যে কার্যনির্বাহিক সমিতি, সেই সমিতির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করছেন। অন্যদিকে শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পর্ষদের অধিকর্তা ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার সদ্ব্যবহার শাখার উপদেষ্টা সমিতির সভ্য। সভার সামনে তাহলে এটি খুব পরিষ্কার যে, এই ব্যবস্থাপনায় দুটি বিভাগের সব কিছুরই আদান-প্রদান ব্যবস্থা ঠিক করা আছে।

আরও দু'টি প্রশ্ন রয়েছে, যা আমার মান্যবর বন্ধু উল্লেখ করেছেন। তা অবশ্যই সরকারের সমালোচনার আঙ্গিকেই হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতের খনিজ সম্পদের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। তাঁর মতে সদ্ব্যবহার শাখার সৃষ্টিই নাকি হয়েছে বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থানের জন্য। এখন আমার মান্যবর বন্ধুর প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে আমি একমত। ভারতের খনিজ সম্পদের বিকাশে যতটা কাজ এখন হচ্ছে, ততটা কাজ আগে হয়নি। কিন্তু আমার মাননীয় বন্ধু আশা করি বুঝতে পারবেন যে, এই কাজে কয়েকটি অসুবিধা বিদ্যমান। এই সত্য স্বীকার করে নেওয়া ভাল, এখনও পর্যন্ত যা কার্যকলাপ দেখা যাচ্ছে তাতে প্রমাণ হচ্ছে, ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার হাতে যোগ্যতাসম্পন্ন যথেষ্ট খনিকর্মী নেই। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, ভারতীয় ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার কার্মিক পরিকল্পনা এবং রূপায়ন ইংলন্ডের ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার অনুসারি। এক-কথায় বলা যায়, খনিজ সম্পদ বিকাশে যত না যত্নশীল তার থেকেও বেশি যত্নশীল একটি খনিজ সম্পদ পরিদর্শকের কার্যালয় হিসাবে কাজ করতে। দ্বিতীয় অসুবিধা হচ্ছে, খনিজ সম্পদ ব্যবহারের গোড়ার কথা—খনন। এই খননে ঝুঁকি

প্রাথমিক শর্ত। প্রাথমিক এই শর্তকে মুখোমুখি মেনে নিয়ে ভীরুতা জয় করার ব্যাপারে একটা অনীহা অনুভূত হচ্ছে। ভারতে খনিজ সম্পদ অব্যবহারের দীর্ঘদিনের অভ্যাসে একটি বিশ্বাস অতি প্রচলিত হয়ে গেছে। বিশ্বাসটি এইরকম : ভারতের খনিজ সম্পদ বলতে শুধু ম্যাঙ্গানিজ আর অভ্র-যে দুটি রপ্তানিযোগ্য। এই বিশ্বাসের প্রতিপক্ষে নতুন বিশ্বাস জন্মানো অর্থাৎ নতুন নতুন খনিজ সম্পদের উন্নয়নের কাজ আরও করা উচিত ছিল। সভার কাছে এবং আমার মাননীয় বন্ধুর কাছে আমার এই সব তথ্য রাখছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার এই নিবেদনও রইল যে, এটি তো অবশ্য স্বীকার্য যে, একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়া ভাল।

এবার বর্মা থেকে আগত উদ্বাস্তু সম্বন্ধে বলছি। এদের নিয়োগ নিয়ে যে কথা উঠেছে তার উত্তরে মান্যবর বন্ধুদের ও সভাকে জানাতে চাই যে, এছাড়া কোনও উপায় ছিল না। আমার বন্ধুদের যা বলেছি অর্থাৎ খনি সংক্রান্ত কাজ জানা লোকের আমাদের খুব অভাব। বর্মাই একমাত্র জায়গা, যেখানে খনি সংক্রান্ত কাজ যেমন, দস্তা ও সীসার কাজ, ব্যাপকভাবে চলে। বর্মাই একমাত্র জায়গা, যেখানে খনি প্রযুক্তিবিদদের (mining engineer) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ফলস্বরূপ, বর্মার উদ্বাস্তুদের নিয়োগের জন্য এই শাখার উন্মোচন হয়েছে না বলে, আমি মনে করি, সঠিক বক্তব্য হল একথা বলা যে, আমরা বর্মার উদ্বাস্তুদের সঠিক প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছি, যা এই প্রকল্প রূপায়ণে কেবল যুদ্ধ-প্রস্তুতি ছাড়াও হতে চলেছে ভবিষ্যৎ ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান।

মহাশয়, সংশোধনী প্রস্তাবগুলির দিকে ফিরে তাকিয়ে একটি বিষয়ে বলতে চাই যে, এই সংশোধনীগুলি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে দেখে আমি আনন্দিত। এখন আমি বলতে পারি, সদ্ব্যবহার শাখার যে হিসাব আমি পেশ করেছি, তা এতই বিশ্বাসযোগ্য যে যাঁরা এসেছিলেন উপহাস করতে, তাঁরা পূজা করতে শুরু করেছেন। কিন্তু মন্দিরটি খুব ছোট এবং যাঁরা পূজা করতে চান, তাঁদের উৎসাহকে আমি স্বাগত জানাই। তবু এই ছোট মন্দিরে অতিরিক্ত ভিড়ের অনুমতি আমি দিতে পারি না, যাতে দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি দুঃখিত যে, সংশোধনীগুলি গ্রহণ করতে পারলাম না।

স্যার সৈয়দ রেজা আলি (যুক্তপ্রদেশের নগর : মুসলমান) : আপনি কি মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দুঃখিত যে, এই সংশোধনীগুলির আমাকে বিরোধিতা করতে হচ্ছে। সভাকে আমি এই নীতি নির্ধারনের সঠিক কারণ জানাব। যে সব মাননীয় সদস্য এই সংশোধনীগুলি এনেছেন, তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই। একথা মনে রাখতে হবে যে এই কমিটি কোনও কার্যনির্বাহিক কমিটি নয়। এটি এমন কমিটি নয়, যা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। অতএব, এই সভায় গৃহীত কোনও কিছু এই সভাকে কোনও ভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না। এটি সম্পূর্ণভাবেই একটি উপদেষ্টা সমিতি। দ্বিতীয় বিষয়, যা আমার বিচারে প্রথম কারণের চেয়ে অধিকতর জোরালো, তা এই কমিটির উদ্দেশ্য থেকে উদ্ভূত। কমিটির উদ্দেশ হল, শিল্প ও বাণিজ্যের বিশেষজ্ঞ একত্রিত করা। আমি মাননীয় সদস্যদের এই কমিটির গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যা এই বিশেষ কমিটির মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদনের দিকে লক্ষ্য রেখেই পরিকল্পিত হয়েছে। মহাশয় এই কমিটি বর্তমানে কল্পিত হয়েছে সর্বমোট ১৬ জন সদস্য নিয়ে। সভা লক্ষ্য করবেন, এই কমিটিতে রয়েছে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ এবং সঙ্গে পাঁচ জন শিল্প ও বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধি। প্রথমেই আছেন, ভূ-তত্ত্ব পর্যবেক্ষণ সংস্থার নিদেশক (Director of Geological Survey), বিজ্ঞান ও গবেষণা পরিষদের নিদেশক (Director of the Board of Scientific and Industrial Research), খনি ও ধাতুবিদ্যা পরিষদ্ (Mining and Metallurgical Institute) থেকে একজন প্রতিনিধি ভারতীয় খনি সংস্থা (Indian Mining Association) থেকে একজন প্রতিনিধি, এবং ভারতীয় খনি সংঘের (Indian Mining Federation) প্রতিনিধি। তাঁরা বিশেষজ্ঞ হিসাবে কমিটির সদস্য। শিল্প ও বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিদের মধ্যে ভারতীয় বণিক সভাগুলি (Federation of Indian Chambers of Commarce) থেকে দুই জন প্রতিনিধি রয়েছেন কমিটিতে। ইস্পাত শিল্প থেকে দুই জন এবং বাণিজ্য দফতরের (Department of Commerce) সচিবকে রাখা হয়েছে এই কমিটিতে। বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধিত্বের জন্য এর থেকে এই সভা দেখবেন যে, কমিটির উদ্দেশ্য সত্যই বিশেষজ্ঞদের সংযুক্ত করে শিল্পপতি ও বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিদের বলা, কি ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে আমাদের এবং কিভাবে বাণিজ্যিক দিক থেকে তার সদ্ব্যবহার করা যায়।

এখন, মহাশয়, যদি এই সভা কমিটির মুখ্য উদ্দেশ মেনে নেয়, তাহলে সাধারণ মানুষের মতামত নেবার সুযোগ থাকবে না।

ড. পি. এন. ব্যানার্জি (কলকাতা শহরতলি : অ-মুসলমান) : সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আম-জনতার প্রতিনিধিত্ব। পরবর্তী যুক্তি, যা আমি উল্লেখ করতে চাই তা হল এই যে, কমিটি এর মধ্যেই যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। এর মধ্যেই কমিটির সদস্য হয়েছেন ১৪ জন। যদি সংশোধনী মেনে নিয়ে আরও ৪ জন অন্তর্ভুক্ত করি, তাহলে সদস্য সংখ্যা হবে ১৮ জন এবং এই সভা থেকেই এই ৪ জন সদস্য যদি নেই, তাহলে সভার উচ্চকক্ষ দাবি জানাবে সেখানে থেকে অন্তত: ৩ জন সদস্য অন্তর্ভুক্তির। যার অর্থ হল, কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ২১ জন এবং আমার সন্দেহ নেই, এই সভা মেনে নেবে যে, তাহলে কাজ করার পক্ষে কমিটি হবে প্রতিবন্ধক।

পরবর্তী যে বিষয়টি সম্বন্ধে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল : এই কমিটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী চার জন সদস্য মনোনয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শ্রম-সদস্যকে এবং মনোনয়নের এই বিশেষ ক্ষমতা সম্বন্ধে কোনও বিশেষ পদ্ধতি নিয়ে কথা না দিয়ে বলতে পারি ; এই সভা থেকে একজন সদস্য অবশ্যই মনোনয়ন পেতে পারেন। অতএব, মহাশয়, এই সভায় যে সব বক্তব্য আমি রেখেছি, তার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানিয়েই বলতে পারি, আমি এ-কথা বলতে দুঃখিত যে, সংশোধনীগুলি মেনে নিতে পারছি না।

□ □ □

৭

*ভারতীয় শ্রমিকরা যুদ্ধ জয়ে কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

আকাশবাণী বোম্বাই থেকে ড. বি. আর. আম্বেদকরের বেতার ভাষণ

'শ্রমিকরা এ ব্যাপারে সচেতন যে এই যুদ্ধ নব্য নাৎসি তন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধ শুধু পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নয় পুরানো ব্যবস্থা এবং নাৎসিতন্ত্র দুই-ই এর প্রতিপক্ষ। শ্রমিকেরা এ ব্যাপারেও সচেতন যে এই যুদ্ধে ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হবে নতুন ব্যবস্থার—যে ব্যবস্থায় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা কথার কথা থাকবে না মাত্র, বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে।' ড. বি. আর. আম্বেদকর আকাশবাণী বোম্বাই থেকে প্রচারিত তাঁর সাম্প্রতিক বেতার ভাষণে 'ভারতীয় শ্রমিকরা যুদ্ধজয়ে কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই কথাই বলেন। নিচে তাঁর প্রদত্ত ভাষণটি তুলে দেওয়া হল।

'আপনারা আগামী দিনগুলিতে শ্রমিকদের স্বার্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে বেতারে আরও ভাষণ শুনতে পাবেন। আমার বক্তব্য সেই ধারাবাহিকতার মুখবন্ধ। বিষয়ের সাধারণ দিকগুলিই আমার বক্তব্যের বিষয়। আমার ভাষণের যে নামকরণ আমি করেছি তা হল 'ভারতীয় শ্রমিকরা যুদ্ধ জয়ে কেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এতে এমন একটি বিষয় আছে, যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এটি হল যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতীয় শ্রমিকদের দৃষ্টিভঙ্গি। ভারতে এখন আমরা দেখছি, অসহযোগ আন্দোলনের হঠাৎ উচ্ছ্বাস এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধতা লক্ষ্য করছি। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে শ্রমিকরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে। এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তারা সহযোগিতা করে চলেছে এবং তা করতে বদ্ধপরিকর, যদিও তাদের বিরত করবার অনেক চেষ্টা চলছে।

শ্রমিকেরা কি চাইছেন

যুদ্ধকালীন সময়ে শ্রমিকের লাভের খাতা বর্ধিষ্ণু এবং আরও বৃদ্ধির আশা আছে। আমি উল্লেখ করেছি, শ্রমিক আইন মোতাবেক সুরক্ষা লাভ করেছে।

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ১লা জানুয়ারি, ১৯৪৩। পৃঃ ১৬-১৯।

নিরাপত্তা পরিচর্যা এবং মনোযোগ আজ শ্রমিকের অধিকারে পরিণত হয়েছে মালিকপক্ষের ওপর কেন্দ্রীয় কড়া নির্দেশ যে, শ্রমিকের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হতে হবে। কিন্তু শ্রমিকরা যদি যুদ্ধে সহযোগিতার জন্য আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তা সাময়িক স্বার্থের জন্য নয়। আরও জোরালো যুক্তি রয়েছে এর প্রেক্ষাপটে। শ্রমিক শুধু কর্মক্ষেত্রে সুন্দর পরিবেশ আশা করেন না, তাঁরা আশা করেন জীবনযাপনে সুন্দর পরিবেশ। জীবনযাপনে সুন্দর পরিবেশ বলতে কি বুঝায় সেদিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক।

সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা

শ্রমিক চায় স্বাধীনতা। এতে নতুন কিছু নেই। নতুন হল স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রমিকদের ধারণা। স্বাধীনতা সম্বন্ধে শ্রমিকের ধারণা দমিত থাকার মতো নঞর্থক কিছু নয়। নির্বাচনে ভোটাধিকারকেই শ্রমিক স্বাধীনতা মনে করে না। স্বাধীনতা সম্পর্কে শ্রমিকের ধারণা খুব-ই সদর্থক। এই ধারণায় সরকার হবে জনগণের দ্বারা। জনগণের দ্বারা বলতে শ্রমিকরা সংসদীয় গণতন্ত্র মনে করে না। সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বুঝায় এমন সরকারকে, যেখানে শাসন করবার জন্য শাসক নির্বাচন জনগণের কাজ। সরকার গঠনের এই পদ্ধতি, শ্রমিকদের অভিমত অনুসারে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের হাস্যকর অনুকরণ। শ্রমিকরা এমন সরকার চায় যা নামে ও কাজে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। দ্বিতীয়ত, শ্রমিকদের দ্বারা কল্পিত স্বাধীনতায় থাকবে সকলের সমান সুযোগের অধিকার এবং সরকারের কর্তব্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন অনুযায়ী পূর্ণ সুযোগ দেওয়া।

শ্রমিক চায় সাম্য। সাম্য বলতে শ্রমিকরা মনে করে আইনের ক্ষেত্রে, জন-কৃত্যকে (civil service), সেনাবাহিনীতে, কর-ব্যবস্থায়, বাণিজ্য ও শিল্পে সুবিধাবাদের অবসান। অসাম্যের সৃষ্টিকারী সমস্ত পদ্ধতির অবসান।

শ্রমিক চায় ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্ব বলতে বুঝায় সর্ব ব্যাপ্ত মানব ভ্রাতৃত্ব, সমস্ত শ্রেণী ও জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। 'পৃথিবীতে শান্তি ও মানুষের মঙ্গলকামনা' এই হবে তার আদর্শবাণী।

নব্য নাৎসি ব্যবস্থা

এই হল শ্রমিকের আদর্শ। এই আদর্শে আছে নতুন ব্যবস্থার পত্তন, যার প্রতিষ্ঠাই কেবল মানব-সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। আর সেই ব্যবস্থার পত্তন কিভাবে সম্ভব যদি যুদ্ধে মিত্রশক্তির (Allied Nations)

পরাজয় ঘটে? এইটিই প্রধান প্রশ্ন। যে প্রশ্ন শ্রমিক না পারবে এড়িয়ে যেতে, না পারবে ঝেড়ে ফেলতে। তাহলেই মরণ বিপদ। এই নব্য ব্যবস্থা কি অলসভাবে বসে থাকলে অথবা যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করলে সম্ভব? শ্রমিকের এ ব্যাপারে সম্যক ধারণা, মিত্রশক্তির [Allied Nations] যুদ্ধে জয়ের মধ্যেই রচিত আছে তাদের কল্পিত নতুন ব্যবস্থার পত্তন। আর তাদের কল্পিত নতুন ব্যবস্থার পত্তন যদি না হয় তবে অন্য একটি নতুন ব্যবস্থার রাস্তা খোলা আছে। সেটি আর কিছুই নয়, নাৎসি ব্যবস্থা। যেখানে স্বাধীনতা হবে দমিত, সাম্য অস্বীকৃত এবং ভ্রাতৃত্ব পরিশোধিত হবে ধ্বংসকারী মতবাদ হিসাবে।

এ হল সকল অর্থেই নাৎসি-ব্যবস্থা। নাৎসি-ব্যবস্থার এ হল অংশ; যা প্রতিটি ভারতীয়কেই তার ভয়াবহতা নিয়ে ভাববে, তার ধর্ম, জাত বা রাজনৈতিক বিশ্বাস যাই হোক না কেন। সবচেয়ে উল্লেখ্য, তার জাত-পাতের বিভাগ। নাৎসি-ব্যবস্থায় এ হল প্রধান অনুশাসন। নাৎসির জর্মন জাতিকে অতিমানব মনে করে। তারা অন্য শাদা চামড়ার জাতকে জর্মনদের পরে বসায়। কিন্তু বাদামি চামড়ার জাতের মধ্যে—যার মধ্যে ভারতীয়রাও পড়ে—ক্রমানুসারে সব থেকে নিচে থাকবে। অসম্মানজনক হলেও, নাৎসিরা বাদামি চামড়ার জাতকে জর্মন ও শাদা চামড়ার জাতের দাস হিসাবে মনে করে। তাদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা নেই—তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই।

'প্রত্যক্ষ ভীতি'

প্রত্যেকেই ভালভাবে অবগত আছেন ইংরেজদের হিটলার তাঁর 'মেইন কাম্ফ' [Mein Kamp] অভিসম্পাত দিয়েছেন, কারণ ইংরেজের ব্রাত্য ভারতীয়দের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য। এই সব তথ্যের প্রেক্ষাপটে নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এগিয়ে আসার জন্য ভারতীয়দের জোরালো কারণ রয়েছে। নাৎসি-ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রমিকদের কল্পিত নতুন ব্যবস্থার যাঁরা তুলনা করেন, তাঁদের মনে কোনও সন্দেহ নেই যে, শ্রমিকরা মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করে নাৎসিবাদকে পরাজিত ও ধ্বংস করবার জন্য এমন একটি স্থান অধিকার করেছে যা বিবেকবান মানুষরা পারেন। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সহমত নন, এমন ব্যক্তিও আছে। কেউ কেউ এমন আছেন যারা নাৎসিদের জয় এবং নতুন নাৎসি-ব্যবস্থার প্রবর্তন নিয়ে ভাবিত নয়। সৌভাগ্যবশত, এ-দেশে এ-রকম লোক বেশি নেই। যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক তারা খুব আন্তরিক নয়। তাঁদের কেউ ঐক্যান্তিকভাবে গ্রহণ করে না। তাঁরা তিতিবিরক্ত রাজনীতিবিদ্, যাঁরা নিজেদের

পথ নিজেরা নির্দেশ না করা পর্যন্ত সন্তুষ্ট নয় এবং যাদের আর্দশ: 'হয় সব কিছু নয়তো কিছু না।'

শান্তিবাদীদের মতে সব যুদ্ধই অন্যায়। তারা বলেন, যুদ্ধের জন্যই পৃথিবীর অধিকাংশ সংকট, যার জন্য মানব-সভ্যতা হয়েছে বিপন্ন যে সভ্যতাকে মানুষ গড়ে তুলেছে বহু চেষ্টায়। এ অবশ্য সত্য। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও শ্রমিকরা জীবনে নীতি হিসাবে শান্তিবাদকে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। আক্রান্ত হলেও যুদ্ধ নয়, এর দ্বারা যুদ্ধ বিলুপ্ত হবে না। হিংসার কাছে আত্ম সমর্পণ করে উপলব্ধ শান্তি কিন্তু যথার্থ শান্তি নয়। এটা এক ধরনের আত্মহত্যা যার কোনও যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। মানব জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সম্ভ্রম, এ হল তার বলিদান অসভ্যতা ও বর্বরতা কাছে।

যুদ্ধ বিলোপের জন্য আত্মসমর্পণ শ্রমিকের পথ নয়। শ্রমিকের মতে মাত্র দু'টি জিনিস যুদ্ধের বিলুপ্তি ঘটাতে পারে। একটি যুদ্ধ—অন্যটি সঠিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। শ্রমিকের মতে, দুইয়ের-ই সমান গুরুত্ব। শ্রমিকরা মনে করে, মানুষের রক্ত-পিপাসা যুদ্ধের উৎস নয়। যুদ্ধের উৎস হল, পরাভূতের ওপর বিজয়ীর চাপিয়ে দেওয়া নিকৃষ্ট স্থিতি। শ্রমিকদের মতে, যখন যুদ্ধ চলছে তখন নীবরতা বা যুদ্ধ করতে অস্বীকার শান্তিবাদীদের কর্তব্য নয়। যখন যুদ্ধ চলছে এবং শান্তির জন্য শর্তাবলী রচিত হচ্ছে তখন শান্তিবাদীদের উচিত সতর্ক থাকা ও সক্রিয় হওয়া। সঠিক সময় সঠিক কাজ করতে শান্তিবাদীরা ভুলে যান। যখন যুদ্ধ চলে, তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তিবাদীরা সক্রিয় হন। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে এবং স্থিতি এলে তারা নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন হয়ে পড়েন। এইভাবে যুদ্ধকালীন ও স্থিতাবস্থা-উভয় ক্ষেত্রেই তারা পরাজিত হন। যদি শ্রমিকরা এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তা হবে যুদ্ধ বিলুপ্তিতে শান্তিবাদীদের পথ শ্রমিকরা গ্রহণ করে নি।

ফরাসি বিপ্লবকে স্মরণ করি

নৈরাশ্যবাদীরা এমত প্রচার করতে পারে, যুদ্ধের পরেই নতুন ব্যবস্থা উদয় ঘটবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত তাদের এই নৈরাশ্যের যুক্তির সপক্ষে যুক্তি আছে যে নতুন ব্যবস্থা শ্রমিকের আদর্শ, সেই ব্যবস্থার শিকড় নিহিত আছে ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে। ফরাসি বিপ্লবে জন্ম হয়েছে দুটি ধারণার। এক স্বায়ত্তশাসন এবং স্ব-নিস্পত্তি। স্বায়ত্তশাসন মানে কোনও একমেবাদ্বিতীয়ম সম্রাট বা কোনও একনায়ক বা বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর শাসনের অধীনে না থেকে স্বশাসনের অধীনে থাকা। একেই বলে গণতন্ত্র।

স্ব-নিষ্পত্তি হল এক অখণ্ড আদর্শ বা এক অভিন্ন ইচ্ছার বন্ধনে বদ্ধ একটি জাতি তার বিভিন্ন কাজ এবং লক্ষ্যপূরণে স্ব-ইচ্ছার ওপরই নির্ভরশীল হবে বাইরের চাপ ছাড়া। এর রাজনৈতিক অবস্থা হল তার স্বাধীনতা, বিশ্বের অন্য জাতিসমূহের সঙ্গে তার পারস্পরিক সম্পর্ক অন্য জাতির সঙ্গে তার জোট বাঁধার ইচ্ছা। মানবতার আশা আকাঙ্খা এই দুটি ধারণা ফলবতী হবার ওপর অধিক নির্ভরশীল।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: ১৪০ বছর পার করার পর দেখা যাচ্ছে, এই ধারণা দুটির শেকড়বাকড় খুব গভীরে প্রোথিত হয়নি। পুরানো শাসনব্যবস্থাই কায়েম আছে নগ্নরূপেই অথবা নিলর্জ্জভাবে এই দুই ধারণাকে কপট স্বীকৃতি দিয়ে। কয়েকটি দেশ বাদ দিয়ে স্বায়ত্তশাসন বা স্ব-নিষ্পত্তি বিশ্বে খুব সীমিত। এ সব-ই সত্যি। কিন্তু শ্রমিকের নেওয়া সিদ্ধান্তর বিরুদ্ধে এ-কোনও যুক্তি নয়—অর্থাৎ নতুন ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা হল নাৎসি শক্তির বিরুদ্ধে জয়। এর দ্বারা বুঝায় যে, নাৎসি শক্তির পরাজয় যাতে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে, সেই বিষয়ে শ্রমিকরা আরও সতর্ক থাকবে। পুরানো ব্যবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত কোনও শান্তি নয়।

শ্রমিক এবং জাতীয়তাবাদ

শ্রমিকের বড় বিরোধীপক্ষ অবশ্য জাতীয়তাবাদীরা। তাদের অভিযোগ, শ্রমিকের এই মনোভাব ভারতীয় জাতীয়বাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, বরং ক্ষতিকারক। তাদের দ্বিতীয় বক্তব্য, ভারতের স্বাধীনতালাভের কোনও আশ্বাস ছাড়াই শ্রমিকেরা যুদ্ধে যোগ দিতে রাজি। এহেন প্রশ্ন প্রায়-ই গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হচ্ছে বলে, এ-বিষয়ে শ্রমিক কি ভাবছে সেটিও বিবৃত করা দরকার।

জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে শ্রমিকদের চিন্তা খুব স্বচ্ছ। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদ যুক্তিহীন ভক্তি নয়। শ্রমিকের কাছে জাতীয়তাবাদ—যদি প্রাচীন ঐতিহ্যেরই পূজা হয়, বর্ণে, জন্মে যা স্থানীয় নয় এমন কিছুর বর্জন হয়, তাহলে শ্রমিক তাকে বিশ্বাস হিসাবে মেনে নিতে পারে না। বিগতের জীবিত বিশ্বাসকে জীবিতের মৃত বিশ্বাস হিসাবে শ্রমিকরা গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের সর্বদা প্রসারিত শক্তিকে অতীতের হাতে কণ্ঠরোধ হতে দিতে শ্রমিকরা রাজি নয়, যেহেতু বর্তমান বা ভবিষ্যতেব কাছে তা অর্থবহ নয়। অনীহা আছে শ্রমিকের স্থানিক বৈশিষ্ট্যে আটকে থাকার। জাগতিক ব্যপ্তির কুঠরি থেকে দরকার হলে সঞ্জীবনী ধার করে নিজের রাজনৈতিক স্থিতি মেরামতির, দরকারে নব সৃষ্টির তাগিদ শ্রমিকের

আছে। জাতীয়তাবাদ যদি শ্রমিকের এই ধারণা বা চেতনার পথে অন্তরায় হয় তবে সেই জাতীয়তাবাদ শ্রমিকের না পসন্দ।

শ্রমিকের বিশ্বাস রয়েছে আন্তর্জাতিকতায়। শ্রমিক জাতীয়তাবাদের সমর্থক, কারণ সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব, দায়িত্বশীল শাসননির্বাহ, সাংবিধানিক ঐতিহ্য, ইত্যাদি নিয়ে গণতন্ত্রের যে চক্র সেই চক্রটি একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে, যে জনগোষ্ঠী একটি জাতীয় আবেগের বন্ধনে বাঁধা। তার মধ্যে ভাল আবর্তিত হয়। এইভাবেই জাতীয়তাবাদ শ্রমিকের কাছে লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি উপায়।

স্বাধীনতা : একটি ভুল অভিগমন

স্বাধীনতার গুরুত্ব শ্রমিক সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে। কিন্তু স্বাধীনতার এবং তার গুরুত্বের ভ্রান্তি সম্পর্কে শ্রমিক সচেতন। স্বাধীনতার অর্থ শ্রমিকের কাছে এমন নয় যে, সে স্বাধীনতা কোনও বিশেষ ধরনের সরকার বা বিশেষ ধরনের সংগঠনের বন্ধনে বিদ্ধ। বাহ্যিকভাবে যা স্বাধীনতা বলে মনে হচ্ছে, তা আসলে অন্তরীণ দাসত্ব।

স্বাধীনতা মানে বহির্প্রভাব মুক্ত নিজ সরকার নিজের মতো করে গড়ে তোলবার স্বাধীনতা। স্বাধীনতার গুরুত্ব নির্ভর করে কি ধরনের কি রকম সমাজ গড়ে তুলছে, তার ওপর। আজকের পৃথিবী যে সমাজ-ব্যবস্থার এবং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, তার ওপর। শ্রমিকের ভাবনায় আছে 'নতুন ভারত' যত না আছে "ছাড়ো ভারত"। নতুন ব্যবস্থার 'নতুন ভারতের' আবেদন স্বাধীন ভারতের আবেদনের থেকে বেশি। বস্তুত: এই আবেদনের মধ্যেই রয়েছে স্বাধীনতা জয়ের দৃঢ় ইচ্ছা। অনেক অস্বস্তিকর প্রশ্নের উত্তর তাহলেই সহজে লাভ করা যায়।

যুদ্ধে সমর্থন বিনিময়ে আশু স্বাধীনতা লাভ—শ্রমিকের কাছে দুর্বোধ্য এক যুক্তি। যদি এমন হয় ভারতের স্বাধীনতা ডাকাতির ছলনায় অর্জন করতে হবে তবে বলা যায় এ যুক্তির পৃষ্ঠপোষক এবং সমর্থকেরা তাদের চিন্তার পথে সঠিক। কিন্তু প্রশ্ন ভারতের স্বাধীনতা এমনভাবে অর্জনের কথা তো ছিল না। বা এমন ষড়যন্ত্রের কোনও কথাও তো হয়নি। বা সত্যি বলতে যত বড় ষড়যন্ত্রীই থাকুক না কেন এ ষড়যন্ত্র সফল হবার নয়। শ্রমিকের মতে ভারত, ভারতবাসিকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে কে যদি সেই স্বাধীনতা যদি অসাম্যের দোলায় দোলে তবে ভারতবাসীর ঐক্যের অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তখন মনে হয় ভারতবাসীর স্বাধীনতা না পাওয়ার জন্য আঁর কেউ নয় ভারতবাসীই দায়ী।

যুদ্ধ এবং শ্রমিক [Labour and War]

যুদ্ধ নিয়ে শ্রমিকের ভাবনা কি? তার ভাবনার কাঠামো তৈরি হয় এক উপলব্ধি দিয়ে। সেই উপলব্ধি যুদ্ধের খতিয়ান দিয়ে তৈরি। শ্রমিক জানে যুদ্ধ জয় আবশ্যিক। শ্রমিক এও জানে শান্তিজয়ও আবশ্যিক, বিশেষ করে যখন পৃথিবী থেকে যুদ্ধের হবে নির্বাসন। শ্রমিক জানে যুদ্ধ শুধু নাৎসি বিজয়ের জন্য নয়। যুদ্ধ শুধু পুরানো ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য নয়। যুদ্ধে বিজিত হওয়া চাই দুটির-ই। তবে কি যুদ্ধের ক্ষতিপূরণে শ্রমিকের দাবি নতুন ব্যবস্থার স্থাপন। যে ব্যবস্থায় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, স্বাধীনতা শুধু কথার কথা না হয়ে হবে কাজের কথা, ঘটবে তার বাস্তব প্রতিফলন। কিন্তু বৃহৎ প্রশ্নবোধক চিহ্ন এই যে, এই নতুন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার পন্থা হবে কি করে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রমিকের অবস্থান খুব পরিষ্কার এবং জোরালো—যুদ্ধে সাফল্য। সেটিই প্রাথমিক শর্ত। এই শর্ত পূরণের মধ্যেই রয়েছে স্বাধীনতা আর স্বায়ত্তশাসনের চাবিকাঠি। অন্যথায় স্বাধীনতা নিয়ে যত কথা খরচ হবে সবই হবে বাজে বকুনির বিনুনি। কাজেই শ্রমিকের দৃঢ় লক্ষ্য যুদ্ধজয়।

বর্তমান যুদ্ধের দুটি বৈশিষ্ট্য [Two Features of Present War]

এই যুদ্ধের গর্ভে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। সেই সম্ভাবনা ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নতুন ব্যবস্থা। দুটি বৈশিষ্ট্য সেই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। প্রথম বৈশিষ্ট্য, এই যুদ্ধ পৃথিবীতে দুটি শক্তিমান শিবিরে ভাগ করার যুদ্ধ নয়, যেমন আগের আগের যুদ্ধগুলিতে হয়েছে। এই যুদ্ধের শত্রুপক্ষ হচ্ছে বিরুদ্ধ আদর্শ, যে আদর্শের ওপর আগামী পৃথিবীতে ব্যবস্থা বা সরকার গড়ে উঠবে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যুদ্ধ সেই যুদ্ধ নয়, যেখানে বিজিতের রাজধানী বিজয়ীর পদভারে জর্জরিত হবে। পদানত হবে বিজিতের পতাকা। শান্তি কেনা হবে বিজিতের স্বাধীনতার বিনিময়ে। এই যুদ্ধ শুধু যুদ্ধ নয়। এই যুদ্ধ এক বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষের জীবনের কতগুলি মৌলিক পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে হাজির। সমাজ নতুনভাবে সাজানোর বিপ্লব। জনগণের জন্য এই যুদ্ধ অতএব জনযুদ্ধ। যদি তা না হয় তবে তাকে জনযুদ্ধে রূপান্তরিত করতে হবে।

এমতাবস্থায় "যুদ্ধে আমার ভালও হবে না, মন্দও হবে না" গোছের মানসিকতা নিয়ে শ্রমিক চলতে পারে না। শ্রমিকের এটি অবগতিতে আছে পৃথিবীর বুকে নতুন ব্যবস্থা প্রত্তনে এর আগে বারবার বাধা এসেছে। এর কারণ বোধহয়

গণতন্ত্র পৃথিবীতে এলেও সেটি ছিল টোরিদের [Tory] হাতে। শ্রমিকের বিশ্বাস যুদ্ধ এবং তার মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থার পত্তনে পৃথিবীর সুদিন আসবেই।

সঠিক নেতৃত্ব [Correct Leadership]

দেশের চাহিদা একটি নেতৃত্বের। প্রশ্ন এই যে, এই নেতৃত্ব দেবে কে? আমি সাহস নিয়ে বলতে পারি যে এই নেতৃত্ব দিতে পারে শ্রমিকশ্রেণী। অন্যসব কিছু ছেড়ে দিলেও নেতৃত্ব দিতে প্রয়োজন মুক্ত চিন্তা এবং আদর্শবাদ। দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে আদর্শবাদ আশা করা যায় কিন্তু চিন্তার মুক্তি তাদের কাছে আশা করা যায় না। আর আদর্শবাদ বা চিন্তার মুক্তি কোনওটাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে আশা করা যায় না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সেই উদারতা নেই, যে উদারতা অভিজাত সম্প্রদায়ের আছে, যে উদারতায় একটি আদর্শের পোষণ হতে পারে। নতুন ব্যবস্থার আহ্বানের তাগিদও এই শ্রেণীর নেই। সেই তাগিদ আছে শ্রমিকশ্রেণীর। সেই তাগিদের আশার ওপর শ্রমিকশ্রেণী বেঁচে আছে। আর এই শ্রেণীর কাছে আদর্শবাদ আর চিন্তার মুক্তি আশাও করা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর অবদান আমরা খুঁজে পাই ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য গঠনে। সেই রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য গঠনে আমরা দেখতে পাই অতীতের সঠিক ও সুন্দর পুনর্মূল্যায়ন। ভারত এবং জনদেবতার নেতৃত্বে যদি শ্রমিকশ্রেণী থাকে তবে দেখা যাবে, ভারত ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধে যাচ্ছে এবং জয়ী হচ্ছে। জয়ের ফল হবে স্বাধীনতা এবং নতুন সামাজিক ব্যবস্থা। ধীরে ধীরে এই লভিত ফল-ই আমাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে পরিণত হবে।

□ □ □

৮

কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশ

* মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম-দফতর) :

আমি, সত্যি বলতে খুব আনন্দিত এই কারণে যে মাননীয় শ্রী বাজোরিয়া সভায় যে মুলতুবি প্রস্তাব এনেছেন, সেই মুলতুবি প্রস্তাবে সরকারের পক্ষে এ দেশের কাগজ পরিস্থিতি প্রসঙ্গে কিছু বলবার সুযোগ এসেছে। এ ব্যাপারে কিছু কড়া বাক্যবান পূর্বের বক্তারা হেনেছেন। তাঁদের বক্তব্যের সারাংশ এই যে সরকার অনুভূতিহীন স্বার্থপর, কঠিনহৃদয় এক ব্যক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যার কোনও চিন্তা-ভাবনাই নেই। এমন ধারণা বা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি এই সভার সামনে পেশ করি সরকারের অবস্থান।

আমার বক্তব্যের শুরুতেই বলি যে, সরকারের পক্ষ থেকে যে আদেশ জারি করা হয়েছে সেই আদেশের সম্যক অনুধাবন করা হচ্ছে না। সদস্যেরা একে একে এ কথাই বুঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সরকার নব্বই শতাংশ কাগজ নিজের জন্যই আটক করেছে। আমি বলতে বাধ্য, এ ধারণা সম্পূর্ণ অবুঝের ধারণা। কাগজের নিয়ন্ত্রক [Controller of paper] যে আদেশ জারি করেছেন সে আদেশ কাগজ অধিগ্রহণের আদেশ নয়। এই আদেশ বলে কাগজ প্রস্তুতকারিগণ তাদের উৎপাদনের ৯০ শতাংশ সরকারের হাতে তুলে দেবেন। এই আদেশকে আমি বলতে পারি জমাট বাঁধার আদেশ। ধরুন জল ঠিকমত না ধরে রাখলে খরচা হয়ে যায় কিন্তু ঠিকমতন জমাট বেঁধে বরফ করে রাখলে পরে জল হিসাবে খরচ করা যায়। সরকারের এই আদেশও সেইরকম জমাট বাঁধার আদেশ। কাগজ উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদনের ১০ শতাংশ বিক্রি করতে পারবেন। বাকি ৯০ শতাংশ সরকারের ঘরে জমা রইল।

এই আদেশও সেইরকম জেমাট বাঁধার আদেশ। কাগজ উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদনের ১০ শতাংশ বিক্রি করতে পারবেন। বাকি ৯০ শতাংশ সরকারের ঘরে জমা থাকবে।

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) খণ্ড ১ম ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ পৃ: ১২৮-৩১

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (অমুসলিম গ্রামীণ - প্রেসিডেন্সি বিভাগ) **:** বাস্তবে এর ফারাক কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকার ১০ শতাংশের বেশি স্বত্ব ত্যাগ করতে পারে।

বাপুর বৈজনাথ বাজোরিয়া : কিভাবে? কখন?

ডাঃ পি. এন. ব্যানার্জি : যখন সরকারের জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ ঘটবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আদেশটি স্বব্যাখ্যাত। আমি আদেশের ব্যাখ্যা দিচ্ছি না। আদেশটির প্রকৃতি নিয়েই আমার বক্তব্য।

(তাঁর বক্তব্যে অনেক সভ্যের বাধা দান)

মাননীয় সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) শান্তি, শান্তি। সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখুন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সভার সদস্যগণ এটি সব সময় মনে রাখবেন যে, সরকারের এই আদেশ শুধু কাগজ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপর প্রযোজ্য। আড়তদারদের ওপর এই আদেশের কোনও প্রয়োগ সরকার করেন নি। আর এই আড়তদাররা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কাগজ তাদের গুদামে মজুত করে ফেলেছে — এই আদেশ লাগু হবার আগেই। কাজেই জনগণ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাগজ এই মজুত থেকেই সংগ্রহ করতে পারে। কথা আরও আছে। আদেশটি এমনভাবেই তৈরি হয়েছে যাতে কাগজের নিয়ন্ত্রকের সেই ক্ষমতা দেওয়া আছে যে, ক্ষমতাবলে তিনি কাগজকলগুলিকে দশ শতাংশের বেশি কাগজ বিক্রির অনুমতি দিতে পারেন। এ ব্যাপারে কোনও বাধাও নেই, প্রতিবন্ধকতাও নেই। যদি কাগজ নিয়ন্ত্রক মনে করেন তবে তিনি ৫ই নভেম্বর গৃহীত কাগজ নিয়ন্ত্রণ বিধির কথা মাথায় রেখেই দশ শতাংশের বেশি কাগজ জনগণের প্রয়োজনে বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়ার অনুমতি দিতে পারেন। সরকারি আদেশ কি বলে তার ব্যাখ্যা কি এ সমস্তই আমি সভার সামনে পেশ করলাম। সভাকে বুঝালাম এবার সভার সামনে এই আইন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বা অন্য কথায় সরকার কেন এই আইন গ্রহণ করলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করব।

সংক্ষিপ্ত তথ্য এইরকম। কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয়ের [Central Stationary office] মতে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাসের জন্য আমাদের কাগজের চাহিদার পরিমাণ ৩৪০০০ টন। তথ্যে আরও প্রকাশ পাচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্টেশনারি

অফিসের মাধ্যমে কাগজ উৎপাদক সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই ১৬০০০ টন কাগজ যোগান দিয়ে দিয়েছে। সভার কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল যে, কাগজের উৎপাদকদের সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক কাগজ উৎপাদকেরা আমাদের ২৫৯০০ টন কাগজ যোগান দেবে। সভা অতএব একটি সহজ পাটিগণিত বুঝতে পারছে। প্রথম ৬ মাসের জন্য আমাদের পাওনা এখনও ৯০০০ টন বাকি। এর পরেও বাকি থাকে আরও ৬ মাস। ফলত সরকারের করণীয় কি থাকে? পরিস্থিতি, গত ৬ মাসে যা দেখা গেল তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার তার হিসাব পরিমার্জন করল। পরিমার্জন করল বাইরে থেকে কাগজ সংগ্রহের পদ্ধতি, বা বলা যায় এই পদ্ধতিকে দৃঢ়ীকরণ পদ্ধতি। আর এই প্রসঙ্গেই এই সভাকে জানানো প্রয়োজন যে, সরকারের পক্ষে এই পদক্ষেপ নেবার আগে কিভাবে কাগজের চাহিদা মেটানো হত। দুটি পথে চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থা ছিল। এক কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয়ের চাহিদানুযায়ী সংগ্রহ। এই চাহিদা ছিল মূলত কেন্দ্রীয় সরকার, বাংলা, উড়িশা, অসম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির চাহিদার সমষ্টি। অর্থাৎ সরকার যে সংগ্রহ থেকে চাহিদা মেটাতেন সেই সংগ্রহ থেকেই মেটানো হত এই সামগ্রিক অন্যান্য চাহিদা। চাহিদা এবং তদনুযায়ী সংগ্রহে দ্বিতীয় ক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত হত অকেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যলয়ের মাধ্যমে। কার্যালয়কে তার আদ্যাক্ষর নিয়ে সংক্ষেপে ডাকা হয় নন-সি.এস.ও.। আর এই নন-সি.এস.ও-র মাধ্যমে যে সমস্ত প্রদেশ তাদের কাগজের চাহিদা মেটাতো তাদের বলা হত নন-সি.এস.ও. প্রদেশ। এই নন-সি.এস.ও. সংস্থার মাধ্যমে এই প্রদেশগুলি ছাড়াও কাগজের চাহিদা মেটাতো বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য, নিরাপত্তাবাহিনীর ছাপাখানা, কাগজ যোগানদারি দফতর এবং বেসরকারি রেলওয়েজ। এই দুটি পদ্ধতি কাগজ সংগ্রহের ক্ষেত্রে চালু ছিল একটি পদ্ধতি কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অন্যটি ছিল স্বাধীন। ঠিক এইজন্যই কাগজের মোট চাহিদা কত সেই যথার্থ এবং নির্ভুল সংখ্যাটিতে পৌঁছান যাচ্ছিল না বা কষ্টকর হচ্ছিল। ফলত এই দুটি খাতের ধারাকে এক খাতে বইয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিল যাতে করে কাগজের চাহিদার একটি যথাযথ সংখ্যা পাওয়া যায়। অতএব চাহিদার ধারাটিকে শুধু কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা হল।

এই সভায় এর আগেই কথা প্রসঙ্গে আমি জানিয়েছি যে, কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ এক বিপৎসঙ্কুল সংখ্যার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, চুক্তি অনুযায়ী যা আমাদের সংগ্রহ, কাগজ ব্যবহারের পরিমাণ

সেই সংখ্যাকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। এরকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের হিসাবের একটি পরিমার্জন করলাম। সেই সঙ্গে কেন্দ্রীভূত করলাম আমাদের মোট চাহিদাকে। এই করে অক্টোবরের শেষে যা অবস্থা দাঁড়াল সেইটি সভার সামনে পেশ করা হল :—

	টন
পরবর্তী ৬ মাস অর্থাৎ অক্টোবর থেকে ১৯৪৩ সালের মার্চ মাস অবধি কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয় কর্তৃক কাগজের চাহিদা	৩২,০০০
অ-কেন্দ্রীয় স্টেশনারি কার্যালয় কর্তৃক ঐ সময়ে কাগজের চাহিদা	৯,৫০০
সামগ্রিক চাহিদা	৪১,৫০০

কাগজের হিসাব যে সময়ের নিরিখে নির্দ্ধারিত হয়েছে সেই সময়ে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ মাসের মধ্যে কাগজের উৎপাদন হয়েছে ৪৭,৫০০ টন। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এই উৎপাদিত কাগজের মধ্যে সরকারের ৪১,৫০০ টনের চাহিদা সামগ্রিকভাবে অঙ্কের হিসাবে দাঁড়াচ্ছে ৮৭ শতাংশ। মোটামুটিভাবে এটাকেই আমরা ৯০ শতাংশ ধরে নিয়েছি। আর সেই কারণেই সরকারি আদেশে ৯০ শতাংশের উল্লেখ আছে। আর সভার কাছে এটি এখন পরিষ্কার যে, এই সরকারি আদেশ কেন নভেম্বর মাসে জারি হল। এখন আমি এই সভার কাছে নিবেদন করব, কাগজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকারি পদক্ষেপ কি নেওয়া হয়েছে।

সভার কাছে এটি সহজ বোধ্য যে, কাগজের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাগজকলগুলির জন্য বাড়তি কাগজকল বাইরে থেকে আনা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। জাহাজে করে মাল আনয়ন এবং পাঠানো যে কি সমস্যার ব্যাপার সেটি সবাই জানেন। আর এ ব্যাপারে সরকারের করণীয় যে প্রায় কিছুই নেই সেটিও সবাই জানেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের হাতের মধ্যে যে সম্পদ আছে, যে উপায় আছে সেই সম্পদ, সেই উপায়ের ব্যবহার করেই কাগজের উৎপাদন কিভাবে বাড়ানো যায় সেই চিন্তাই আমাদের আবশ্যিক। এই আবশ্যিকতার প্রশ্নে সরকারের পক্ষ থেকে যে তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে দিকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এই তিনটি নেওয়া ব্যবস্থার ফলে আশা করি উৎপাদন বাড়বে। সরকার কাগজ উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে একজন আধিকারিক নিয়োগ

করেছে [paper production officer] যার কাজ হবে কাগজ উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে পন্থা এবং সম্পদের যথাযথ প্রয়োগ।

জনৈক মাননীয় সভ্য : এই নিয়োগ কে পেলেন? ভদ্রমহোদয়ের নাম কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শ্রীযুক্ত ভার্গব। দ্বিতীয়ত সরকার অপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের বিলাসি কাগজ তার কাটছাঁট করেছে এবং কাগজের প্রয়োজন সীমাবদ্ধ রেখেছে সেই ধরণের কাগজের ব্যবহারে যার উৎপাদন সহজ। তৃতীয়ত, সরকার আলাদাভাবে প্রত্যেকটি কাগজকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে যাতে করে সম্যক উপলব্ধি হয় কোন ধরণের কাগজকল কোন ধরণের কাগজ তাদের বর্তমান যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জাম দিয়ে বেশি পরিমাণে উৎপন্ন করতে পারে। এ পর্যন্ত হিসাব কষে যা দেখা গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন বাড়াবার যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাতে করে উৎপাদন বাড়বে প্রায় ১২,০০০ টন।

সরকারের পক্ষ থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ যা নেওয়া হয়েছে তা হল কাগজের চাহিদার সাময়িক হ্রাস। এই হ্রাস ইচ্ছাকৃত কারণ সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের জন্য এর প্রয়োজন। এই কারণে সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাগজের চাহিদার হ্রাস করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। যেমন প্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্যস্তরে কাগজের চাহিদার সাময়িক দশ শতাংশ হ্রাসের ফলে ৯৫০ টন কাগজের সঞ্চয় করা গেছে। আর কেন্দ্রীয় স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের কাগজ ব্যবহারের চাহিদা ভালভাবে পরিমার্জন করা হয়েছে এবং চাহিদার অঙ্ক বেশ কিছুটা কম করা হয়েছে। চাহিদার অঙ্কের কম করার কয়েকটি নমুনা এই সভায় পেশ করা যেতে পারে, যাতে ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। অসামরিক দফতরের আদতে চাহিদা ছিল ১১,৪০০ টন। কমিয়ে ৬ মাসের জন্য করা হয়েছে ৪,৬০০ টন। সামরিক দপ্তরের মূল চাহিদা ছিল ১৫,০০০ টন। কমিয়ে সেটি করা হয়েছে ১০,০০০ টন। পূর্বাঞ্চলীয় যোগান পরিষদীয় মণ্ডলীর [Eastern Group Supply Council] মূল চাহিদার পরিমাণ ছিল ৯,৪০০ টন। সেটি কমে দাঁড়াল ৭,৯০০ টন। যদিও যোগান দফতরের চাহিদা ৩,১০০ টন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪,৫০০ টন। কারণ শিল্পের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ঐ কাগজ মূলত বাণিজ্যিক সুবিধার দাবিদার। তাহলে এ পর্যন্ত সভার কাছে পরিবেশিত তথ্য থেকে এটুকু পরিষ্কার যে, সামগ্রিকভাবে মূল চাহিদা ছিল ৩৯,১০০ টন। সংশোধনের পরে তার চেহারা দাঁড়াল ২৭,৬০০ টন। অঙ্কের

কাটাকুটি খেলার এর আগেই প্রাদেশিক এবং দেশীয় রাজ্যস্তরে আমরা সঞ্চয় করেছিলাম ৯৫০ টন। তার সঙ্গে যোগ হল কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়ে ১১,৯০০ টন কাগজের সঞ্চয়। সাকুল্যে যার হিসাব দাঁড়ায় গিয়ে ১২,৮৫০ টন। এইবার মাননীয় সভ্যবৃন্দ, ভারতে যত কাগজ ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে এই যোগফলের তুলনা করুন। কত কাগজ ব্যবহার করা হয় তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায় না বা পাওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু এমন সংখ্যা ধরা হল যা সরকার ইতিমধ্যে দেখিয়েছে তা হল ভারতবর্ষে বছরে এক লাখ টন কাগজ খরচ হয়। অর্থাৎ ৬ মাসে ৫০০০০ টন। এবং এই ৫০০০০ টনের মধ্যে, সভার স্মরণে থাকতে পারে, ১০ শতাংশ কাগজ ছাপার নিয়ামকের [Controller of printing] আদেশানুসারে সাধারণের ব্যবহারের জন্য। অর্থাৎ ৫০০০ টন কাগজ জনসাধারণের ব্যবহার্য। এইবার ৫০০০ টন পূর্বোল্লিখিত ১২,৮৫০ টন সঞ্চয়ের সঙ্গে যোগ দিন। দাঁড়াবে ১৭,৮৫০ টন, যা সার্বজনিক মুক্তির অপেক্ষায়। আর অঙ্ক কষলে দেখা যাবে, শান্তির সময়ে জনগণের ব্যবহার্য এই কাগজের পরিমাণ মোট কাগজের ৩৩ শতাংশ।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় বক্তার সময় শেষ হয়ে গেছে। আমি অনন্যোপায়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এরপরেই সভার কাছে পেশ করতে যাচ্ছিলাম যে কাগজের অপচয় রোধে সরকারের পক্ষ থেকে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমার সময় শেষ হয়ে গেছে সে কারণেই এ ব্যাপারে বিস্তৃত খুঁটিনাটি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি না। বরং সভার অনুমোদন সাপেক্ষে আমি এই ব্যাখ্যা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করব।

পরবর্তী বছরে আমাদের পদক্ষেপ কি হবে সে ব্যাপারে সভার সামনে একটি ছবি রাখা যাক। পরবর্তী বছরে আমাদের হিসাব মোটামুটি ৭০,০০০ টন। এই হিসাবে আমরা পৌঁছেছি মোটামুটিভাবে এইভাবে : আমরা প্রত্যেক দফতরের কাগজের চাহিদা বেঁধে দিয়েছি। যেমন সম্প্রচার নিয়ামককে [Controller of Broadcasting] জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনি ২৬০ টনের বেশি কাগজ পাবেন না। বিপরীত প্রচার পরিচালকমণ্ডলী [Counter-propaganda Directorate] পাবে মাত্র ১০০ টন। জাতীয় যুদ্ধ ক্ষেত্রে [National war-Front] যাবে ৩৫০ টন এবং জনসংযোগ [Public Information] দফতর পাবে ৩০০ টন। আরও অনেক ব্যাপারে বলার আছে। যদি আমার হাতে সময় থাকত তবে আমি এ ব্যাপারে আলোকপাত করতাম। আমার বক্তব্যের সারাংশ যদি মাননীয়

সভা অনুধাবন করার চেষ্টা করে তবে এমন অভিযোগ করার সুযোগ কম যে সরকারের অবস্থান সহানুভূতিহীন। তবে আমার বক্তব্যেই শেষ কথা নয়। সাশ্রয়ের আরও রাস্তা আছে। সেই সমস্ত রাস্তার খোঁজ মাননীয় সভ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই দিয়েছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের সেই সমস্ত মূল্যবান মতামত ঠিকমতন জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আমার, যার ফলে সঠিক কাজটি শুরু হয়। আমি মাননীয় সভ্যবৃন্দের বিশ্বাসে ভরসা রাখতে পারি যে, তাঁরা মনে করেন যে এক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ সঠিক।

□ □ □

৯

*শ্রমিকদের দেয় অপ্রতুল মহার্ঘভাতার পুনরানুদানের ঘোষণা

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য) : স্যার, শ্রীযুক্ত মেহতা যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব আমি যদি সঠিকভাবে বুঝতে পারি তবে বলতে পারি, শ্রী মেহতার প্রস্তাবের দুটি নির্দিষ্ট বিষয় বিবেচ্য। প্রথম সরকার শ্রমিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে, তাঁরা যখন শেষবার মহার্ঘভাতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, তখন আলোচনা চালাতে ব্যর্থ হয়েছেন। দ্বিতীয় ২১ জানুয়ারি তারিখে ঘোষিত মহার্ঘভাতা কম এবং অপ্রতুল। স্যার, যদিও শ্রী মেহতা এই ধরণের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য ধন্যবাদার্হ তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি এই প্রস্তাব উত্থাপনের কার্যকারণ আদতে ভুল বোঝাবুঝি।

স্যার, শ্রী মেহতার প্রস্তাবের প্রথম বিবেচ্য বিষয় অর্থাৎ দীন মহার্ঘভাতা নিয়েই আলোচনা করা যাক। সরকার এখনও এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছয় নি। কাজেই ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষিত মহার্ঘভাতা যে বাড়বে না তার পরিমাণের যে পরিবর্তন ঘটবে না এমন কথা বলা যায় না।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র (প্রেসিডেন্সি বিভাগ : অ-মুসলিম, গ্রামীন এলাকা) তাহলে আমরা কি ধরে নেব সরকারের পক্ষ থেকে এটি একটি পরীক্ষণ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ধরে নিন সেইরকম-ই। আপনাদের মত সাপেক্ষে মহার্ঘভাতা যথেষ্ট নয়। কিন্তু এর-ই সঙ্গে আমার মত যে এই মহার্ঘভাতার পরিমানই শেষ কথা নয়। মহার্ঘভাতার পরিমাণ সরকারের বিবেচনাধীন। রূপক অর্থে বলতে পারি তরল যেমন পাত্রের আকার ধারণ করে তেমনি মহার্ঘভাতার পরিমাণগত অবস্থান এখনও তরল-ই আছে সরকারের দেওয়া সঠিক রূপ পরিগ্রহ করা এর এখনও বাকি আছে। মহার্ঘভাতা কোন রূপে দেওয়া হবে খাদ্য ভর্তুকির মাধ্যমে নাকি অর্থের হিসাবে সেটি সরকারের প্রধান

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) প্রথম খণ্ড, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩ পৃ: ১৯৭-৯৯

বিবেচ্য। এর পরেই বিবেচনায় স্থান পাবে মহার্ঘভাতার মাত্রা বা হার। অর্থাৎ মহার্ঘভাতা কত হারে দেওয়া হবে। অতএব সভাস্থ মাননীয় সভ্যবৃন্দ আপনাদের সমীপে আমার নিবেদন এই যে সরকার এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি যে সিদ্ধান্ত বাতিল করা যাবে না। যে সিদ্ধান্ত থেকে ফেরত আসা যাবে না বা সিদ্ধান্ত সংশোধন করা যাবে না।

পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র : সুব্যবহারের জন্য কি কোনও ভাতা দেওয়া হচ্ছে?

(তাঁর বক্তব্যে অনেক সভ্যের বাধা দান)

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই ভাতা দেওয়ার সুযোগ আমার মনে হয় যে ডাক বিভাগেই আছে। কিন্তু অর্থাভাবে এক্ষুনি এই ভাতা চালু করা যাচ্ছে না পরে সুবিধামত সময়ে এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে।

দ্বিতীয় অভিযোগটি সরকারের বিরুদ্ধে উঠেছে সেটি হল সরকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেন নি। আমরা সবাই জানি যে শ্রমিকদের যোগাযোগ স্থাপনের অসুবিধাই এ ব্যাপারে অন্তরায় দেখা দিয়েছে। আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা এ ব্যাপারে অবগত আছেন যে রেলওয়েতে শ্রমিক ইউনিয়ন আছে এবং রেলওয়ের বিভিন্ন ধরণের ইউনিয়ন একত্র সন্ধিবদ্ধ হয়েছে যার ফলে প্রয়োজনমত সরকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। ফলত শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ মতামত গ্রহণের কোনও অন্তরায় ঘটে না। শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহত্র আলোচনার অভ্যাস ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন এবং এই অভ্যাস এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। কারণ রেল পর্যদ [Railway Board] এবং রেলশ্রমিক সংঘ [Railwaymen's Federation] বছরে দুবার নিয়মমাফিক সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা বসছে।

স্যার, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রেল ছাড়াও আরও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারী আছেন। যেমন ডাক ও তার বিভাগের কথাই ধরা যাক। এই বিভাগের কর্মীদের বারোটি ইউনিয়ন আছে। তার মধ্যে চারটি এই বিভাগের আধিকারিকদের বাকি আটটি শ্রমিক কর্মচারীদের। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: এত ইউনিয়ন থাকা সত্ত্বেও সন্ধিবদ্ধ সংঘ এই ডাক ও তার বিভাগে নেই যার মাধ্যমে কর্মী মতামত সহজলভ্য হয়, যেটি রেলের ক্ষেত্রে সম্ভব, রেলওয়ে পর্যদ এবং রেলশ্রমিক সংঘের মধ্যে আলোচনা যেমন স্বাভাবিক ঘটনা এক্ষেত্রে তেমন কোনও নিয়মিত ঘটনা অনুপস্থিত। আর এই অভাব দূর করতেই সরকারের পক্ষ থেকে চুপ করে বসে না থেকে কিছু আবশ্যিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে

ডাক ও তার বিভাগের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর সহজ হিসাবে ১৯৪৩ জানুয়ারি সংখ্যার টেলিগ্রাফ রিভিউ নামে একটি ম্যাগজিনের একটি ছোট্ট পরিচ্ছদ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। এইটি শ্রবণেই আপনারা বুঝতে পারবেন, ডাক ও তার বিভাগের পক্ষ থেকে তার কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়াস করা হয়েছে :

" ডাক ও তার বিভাগের সর্বাধিকারি তাঁর সাম্প্রতিক কলকাতা সফরের সময় বিভিন্ন স্বীকৃত শ্রমিক ইউনিয়নগুলির প্রদিনিধিদের এক সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪২ তারিখে ডাকা এই যৌথ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল মহার্ঘভাতা নিয়ে আলাপ আলোচনা। কিন্তু সম্মেলনে উপস্থিত কর্মী প্রতিনিধিবৃন্দ মহার্ঘভাতা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই কোনও সহমতে উপনীত হতে পারেন নি। পরবর্তী সময়ে ঐ বছরেরই অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১২ ডিসেম্বর তাঁরা ডাক বিভাগের ক্লাবের তারাপদ হলে আলোচনার জন্য মিলিত হন। সেখানেই তাঁরা মহার্ঘভাতা নিয়ে নিজেদের মধ্য এক অনোন্য সাধারণ মতৈক্যে উপনীত হন এবং মহার্ঘভাতা নিয়ে তাঁরা একটি সর্বসম্মত খসড়া তৈরি করেন যেটি এই সংখ্যারই অন্য কোনও নিবন্ধে পাওয়া যাবে।"

শ্রীযুক্ত যমুনাদাস এম. মেহতা : ঐ খসড়ায় তাঁদের দাবি কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তাঁর ১৮ ডিসেম্বর ১৯৪২ সর্বাধিকারিকের (ডাক ও তার বিভাগ) সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁদের এই খসড়া তাঁর হাতে তুলে দেন।

শ্রীযুক্ত যমুনাদাস এম মেহতা : তাঁদের দাবি কি?

মাননীয় ড. বি. আর আম্বেদকর : দাবি সনদটি বেশ বড়। আমি দুঃখিত আমি এটি পড়ে আপনাদের শোনাতে পারছি না। কেননা আমার সময় খুব কম। যদি আমার মান্যবর বন্ধু চান তবে আমি এটি তাঁর বিবেচনার জন্য তাঁর হাতে দিতে পারি। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি ; ডাক ও তার কর্মীদের বেলায় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা ব্যতিরেকে কোনও ঘোষণা করা হয়নি।

স্যার, বাকি থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের করণিক শ্রেণী। এই শ্রেণীর কোনও ইউনিয়ন নেই। অতএব কোনও সন্ধিবদ্ধ সংঘের প্রশ্নও ওঠ না। তাঁদের আছে কতগুলি নির্দিষ্ট সমিতি। দফতর ভেদে এই সমিতিগুলির নামও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন রাজ সচিবালয়ের সমিতি। দফতরি এবং নথি বাছক বা বাছাইকারিদের

সমিতি [Deftary and Record Sorters Association] এবং সাধারণ সদর কর্মীদের সমিতি [General Headquarters Association]। আর সভা এই তথ্যে খুশি হবে যে মহার্ঘভাতা ঘোষণার পূর্বে এই সমস্ত সমিতিগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া তো হয়ই নি বরং এই সমিতিগুলি তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। প্রতিনিধিবৃন্দ স্বরাষ্ট্র এবং অর্থ দফতরের কাছে তাঁদের মূল্যবান মতামত জমা রেখে যান।

তাহলে আমি মনে করি, শুরুতে আমি যা বলেছি সেটা সঠিক অর্থাৎ শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতা যে অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তাব এনেছিলেন সেই অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারের পক্ষ থেকে যে ভাবনা ভাবা হয়েছিল, আগাগোড়া সেই ভাবনা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে; অর্থাৎ শ্রমিক কর্মচারীদের লাগাতার আলোচনা কিন্তু চালু আছে।

□ □ □

১০

*ভারতীয় অর্থ-বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত): স্যার, সভাস্থ মাননীয় সভ্যবৃন্দ শ্রম-দফতরের কাজকর্মের বিশেষ করে কাজের গ্রহণ এবং বর্জনের ব্যাপারে কয়েকটি নির্দিষ্ট সমালোচনা করেছেন। আমি এবার সেই সমালোচনার জবাবে আমার বক্তব্য পেশ করব। শুরু করা যাক স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স-এর বক্তব্যের সূত্র ধরে। স্যার জেম্‌স শ্রম দফতরের কাজের দুটি ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণী। তাঁর প্রথম লক্ষ্যবস্তু কাগজ এবং তার ব্যবহার। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে যে, সরকার কাগজের ব্যবহারে অমিতব্যায়ী। আর এইভাবেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত দিকে সরকারি খরচ অপচয়ের সীমানা ছুঁয়ে যাচ্ছে। কাগজের প্রশ্নে সভার স্মরণ থাকতে পারে যে একবার এক মূলতুবি প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক হয়েছিল এবং সেই বিতর্কে সরকারের পক্ষ থেকে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আমার মান্যবর বন্ধু স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স আমার তৎকালীন উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, সেইজন্যই নতুন করে পুরনো প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তাঁর এই পুরনো প্রসঙ্গের অবতারণায় আমার কোনও অভিযোগ নেই বরং আমি আনন্দিত। কারণ কাগজের সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারি ব্যাখ্যা আবার নতুন করে দেবার সুযোগ পাওয়া গেল। বিষয়বস্তুর আলোচনায় ঢোকার আগে আমাকে বলতে হচ্ছে যে, কাগজ নিয়ে সভা অতিরিক্ত উৎকণ্ঠিত হচ্ছে অন্তত সভার মানসিকতায় তার-ই আভাস মিলছে। কিন্তু আমি কাগজের যে অবস্থা তাকে কখনই সংকটজনক অবস্থা বলতে পারি না। সভাস্থ মাননীয় সভ্যবৃন্দর সামনে যদি দুটি তুলনামূলক তথ্য পেশ করি তবে সেটি নিশ্চয়ই কৌতূহলোদ্দীপক হবে। এই তথ্য দুটি গ্রেট ব্রিটেন এবং ভারতের। ১৯৩৯ সালে গ্রেট ব্রিটেনে ১৫০০০ বই মুদ্রিত হয়েছিল, ১৯৪০ সালে হয়েছিল ১১০০০, ১৯৪১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০০। আমার বক্তব্য কিন্তু কখনই একথা প্রতিভাত করবে না যে, কাগজের ঘাটতি নিয়ে আমরা ভাবছি না। আমার বক্তব্যের সার কথা, ঘাটতি মানে সংকটজনক দুর্দশার মধ্যে আমরা পড়ি নি।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬ মার্চ, ১৯৪৩। পৃ: ১১৩১-৩৪

স্যার, সভা যদি আরও একটু পিছনে গিয়ে মনে করতে পারে, তবে মনে পড়বে স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর যে অমিতব্যয়ীতার অভিযোগ সেই অভিযোগের সমর্থনে দুটি হাতে কলমে উদাহরণ পেশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। যে দুটি নির্ভরযোগ্য দলিল তাঁর হাতে ছিল, তার মধ্যে প্রথমটি একটি ভাড়ার রসিদ। এই রসিদ দেওয়া হয়েছিল ওয়েস্টার্ন কোর্টে বসবাসকারি ভাড়াটিয়াদের। তাঁর মতে, ভাড়ার রসিদের আকৃতি বিরাট, যারমধ্যে খুঁটিনাটি তথ্য ছাপানো আছে। তার মানে হয়েছে রসিদ অতিশয্যের দোষে দুষ্ট, যা সংক্ষেপে করা যেত। বিশেষ করে যুদ্ধকালীন সময়ে সংক্ষিপ্তকরণ একান্ত দরকার ছিল। তাঁর আরও একটি সবুদ **কলকাতা ঘোষপত্রর** [Calcutta Gazette] একটি জীর্ণ সংখ্যা, যে সংখ্যায় প্রকাশিত কিছু তথ্য তাঁর মনে পরিহার করা যেত, যার ফলে বাঁচত কিছু কাগজের খরচ।

স্যার এফ. ই. জেম্‌স (ইউরোপীয় প্রতিনিধি : মাদ্রাজ) : আমি আমার মান্যবর বন্ধুর বক্তব্যে একটুখানির জন্য বাধা সৃষ্টি করছি। কলকাতা ঘোষপত্রর যে সংখ্যাটি আমি দেখাচ্ছি সেটি আমি কলকাতা থেকেই সংগ্রহ করেছি। এই সংখ্যাটি এই বছরে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মান্যবর বন্ধুর কাছে আমি বাধিত থাকলাম। এখন স্যার আমার পক্ষের সওয়াল শুরু করতে গিয়ে বলি যে স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স পেশায় একজন আইনজ্ঞ ছিলেন। কাজেই তর্কের খাতিরে সবুদ হিসাবে তাঁর ঐ দুটি উদাহরণ তুলে ধরবেন না এমন আশা করাই সমীচিন। কারণ ভাড়ার রসিদ যেগুলি তিনি তাঁর পক্ষে সবুদ বলে মনে করতে পারেন তিনি হয়ত সেগুলির মুদ্রিত তারিখ দেখতে ভুলে গেছেন। এগুলি ১৯৩৮ সালের। কাজেই ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করার বদলে ধন্যবাদ। দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ খুব সোজা ভারত সরকার ১৯৩৮ সালে ছাপানো ভাড়াটে রসিদ নষ্ট না করে সেগুলি দিয়েই এই কাগজ সংকটের দিনে কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। নতুন রসিদ ছাপানো মানে পুরনো এই রসিদগুলি বিনা কারণে নষ্ট করে দেওয়া। সেটি না করে সরকার সংকটে সংযমী। অমিতব্যয়ী তো কখনই নয়।

স্যার এফ. ই. জেম্‌স : ওগুলিকে নষ্ট করে ফেলে কাঁচামালে পরিণত করলেই হত।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, ঘোষপত্রর প্রশ্নে আমার মনে হয়

স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স একটু ভুল করে ফেলেছেন। কারণ আমার মনে হয় ঘোষপত্রর গুরুত্বের ব্যাপ্তি অনেকখানি। একজন আইনজ্ঞ এটি জানেন (সত্যি বলতে তাঁকে এটি মনে করিয়ে দেওয়া বাহুল্য) যে ঘোষপত্র শুধু কোনও তথ্যপঞ্জিকা নয়। ঘোষপত্র একটি দলিল, যেটি যে কোনও আইনের আদালতে সমান গুরুত্ব নিয়ে বিবেচিত হয়। ঘোষপত্রে কি না থাকে। এমনকি শত্রু শিবিরের খবরও থাকে। সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী ঘোষপত্র হচ্ছে প্রাথমিক সাক্ষ্য যার ওপর নির্ভর করে অনেক কিছু প্রমাণ করা যায়। স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স-এর কাছে অতএব আমার বিনীত প্রশ্ন, সরকারের আর্থিক সংযমের দিনেও কি তিনি এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার জন্য কাগজের বরাদ্দ কমাতে রাজি হবেন?

স্যার এফ. ই. জেম্‌স : আমার বক্তব্য হচ্ছে, যে সমস্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষপত্রে ছাপা হচ্ছে সেগুলি আবার প্রাদেশিক ঘোষপত্রে ছাপানোর প্রয়োজন আছে কিনা, সে ব্যাপারে অনুসন্ধানের প্রয়োজন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ছাপানোর প্রয়োজন কারণ, 'ভারত শাসন আইন'। ভারত সরকারের এই আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রাদেশিক সরকার তার নিজস্ব প্রাদেশিক ঘোষপত্র প্রকাশ করবে। এ ব্যাপারে নিজের বাগ্মিতা প্রকাশ না করে আমি বরং কতকগুলি হাতে কলমে উদাহরণের ওপর আলোকপাত করি, যেখানে আপনারা নিজেরাই দেখতে পাবেন কাগজের ব্যবহারে কতটা সংযম মেনে চলা হচ্ছে। মান্যবর স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স এবং সভাস্থ আমার অন্যান্য মান্যবর বন্ধুরা যদি আপনারা ভারতের ঘোষপত্র ২৯ আগস্টের সংখ্যার সঙ্গে একনম্বর বিভাগের দুনম্বর অংশটি পড়ে দেখুন। এক-ই সঙ্গে পড়ে দেখুন ১৯৪৩ সালের মার্চের সংখ্যার ঐ একনম্বর বিভাগের দু নম্বর অংশটি। এবার মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা দয়া করে যদি একটু কষ্ট করে দুটি সংখ্যায় মুদ্রিত এই বিভাগ দুটির তুলনা করেন তবে নির্জেরাই দেখতে পারেন যা ছাপাতে সাধারণত দেড় পাতা জায়গা নিত, সেটি এখন এক কলামের অর্দ্ধেক নেমে এসেছে। সব মার্জিন বাদ চলে গেছে। তাহলে কি কাগজের সঞ্চয় হল না, আপনারা কি বলেন?

ডা: পি. এন. ব্যানার্জি (কলকাতা পৌর এলাকা : অ-মুসলমান, শহরাঞ্চল) যাদের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ তারা কি করে পড়বেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি সবাইকে খুশি করতে পারব না। স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, সেই প্রসঙ্গে বলি, ভারত

সরকার সমস্ত প্রাদেশিক সরকারের কাছে এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পরামর্শ দিয়েছে যে, ভারত সরকারের ঘোষপত্রে যে প্রজ্ঞাপন বা ঘোষণা করা হয় সেগুলি যদি প্রদেশে কাজে না লাগে তবে প্রাদেশিক ঘোষপত্রে সেই প্রজ্ঞাপনের পুনপ্রকাশের দরকার নেই। কিন্তু আমরা এই পরামর্শদানের থেকে বেশি কিছু করতে পারিনা। এখন স্যার, ভারতীয় তথ্য সম্বন্ধে বলি। আপনারা জেনে খুশি হবেন যে এর আকৃতি অর্দ্ধেক করে দেবার আদেশ জারি হয়েছে।

ফর্মের ব্যাপারে সভাকে এই তথ্য জানানোর প্রয়োজন হয়েছে যে যুদ্ধকালীন সময়ে ১৪৯ ধরণের ফর্ম ছাপানো স্থগিত রাখা হয়েছে। এবং ১৯০ ধরণের ফর্মা ছাপানো বন্ধ হয়ে গেছে। আরও আদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে যে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসের পর থেকে যে সমস্ত ফর্ম ছাপানো হবে সেই সমস্ত ফর্ম-এ অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় ফাঁকা জায়গা যেন না থাকে। প্রসঙ্গত মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, এই ব্যাপারে কারুর কোনও প্রস্তাব থাকলে সেটি অবশ্যই সরকারের কাছে পেশ করবেন। প্রস্তাব এলে আমি অবশ্যই খুব বাধিত থাকব এবং কথা দিচ্ছি যে এ ব্যাপারে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে প্রস্তাব বিবেচনা করব।

প্রকাশনার ব্যাপারে আমি সভাকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, একান্ত প্রয়োজনীয় না হলে কোনও প্রকাশনার কাজে হাত দেওয়া হবে না। এমনকি প্রকাশনের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে তিনটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। প্রথম পরীক্ষাটি করবেন মুদ্রণ এবং স্টেশনারি নিয়ামক [Controller of Printing and Stationary]। নিয়ামকের পদটি এখন আর শুধু নিয়মতান্ত্রিক যান্ত্রিক সরকারি চাকুরের চেয়ার নয়। সরকার নিয়ামকের হাতে কতগুলি নির্দিষ্ট ক্ষমতা অর্পন করেছেন। এই ক্ষমতাবলে এখন নিয়ামক তাঁর কাছে যা পাঠানো হবে সেটিই তিনি কর্মে পরিণত করবেন এমন অবস্থা আর নেই। তিনি যদি একমত না হন বা আপত্তি তোলেন তিনি সেটি শ্রম দফতরের সচিবের [Secretary of the Labour Department] কাছে পাঠিয়ে দিতে পারেন। নিয়ামক এবং শ্রম দফতর যদি একমত হয়ে প্রকাশনার পয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলেন তবে বিষয়টি যাবে একটি কমিটির কাছে। এ ব্যাপারে কমিটির সিদ্ধান্তই শেষ কথা। এছাড়াও অপচয় রোধে ব্যবস্থা নেওয়া আছে। মুদ্রক এবং মুদ্রণকর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠানো আছে যে তারা যেন মার্জিন, জায়গা ছাড় বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে অত্যন্ত সাশ্রয়ী হয়। এই যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এগুলি দারুণ একথা না বললেও নিশ্চিতভাবে একথা বলতে পারি যে, সাশ্রয়ের জন্য

প্রকৃত প্রচেষ্টা আরব্ধ। কিন্তু স্যার কথায় আছে হস্তীর পক্ষে রাজহংসীর পদচারণা শেখা শক্ত। আর কে না জানে, সরকারি ব্যবস্থাপনা এক বিরাট হস্তীতুল্য, তার চালন শ্লথ, পদচারণা মৃদু—সে পৃথিবীর যে কোনও দেশের সরকারই হোক না কেন। শুধু শুধু ভারত সরকারের দিকে আঙুল তুলে তো লাভ নেই। তবু ভারতীয় সরকারি ব্যবস্থা তার হস্তি অবয়বের সংগঠন নিয়ে রাজহংসীর পদচারণা শিখেছে। যদি এখনও না শিকে থাকে, তবে শিখে নেবার জন্য তৈরি।

স্যার এফ. ই. জেম্‌স : হ্যাঁ এখনও এটি বয়সে নবীন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার আমি এখন মান্যবর বন্ধু স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স কাগজ সাশ্রয়ের জন্য যে নির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছেন সেটি নিয়ে একটু আলোচনা সেরে নিতে চাই। তাঁর প্রস্তাব অনুধাবনে আমার যদি ভ্রান্তি না থাকে, তবে বলি তাঁর নির্দিষ্ট প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কমিটি তৈরি করতে হবে। সেই কমিটির জন্ম হবে ইংলন্ডে। কমিটির গঠন হবে একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, প্রকাশনা এবং মুদ্রণ সংগঠনা থেকে একজনকরে প্রতিনিধি নিয়ে। স্যার উনি কিন্তু এই কমিটির গঠন নিয়ে বললেও তাঁর ইংলন্ডে কাজের রীতি এবং কাজের ধারা কিরকম হবে সে নিয়ে কিছু বলেন নি। এই কমিটি কোন নীতিতে চলবে যার ফলে কাগজের সাশ্রয় হবে সে কথাও তিনি বলেন নি। অতএব এমতাবস্থায় আমার পক্ষে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণে অসুবিধা রয়ে গেল। কিন্তু তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারি, আমরা যা ব্যবস্থা নিয়েছি সেই ব্যবস্থা মোটামুটি তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে সমাপতনেই আছে। আমরা একজন আধিকারিক নিয়োগের কথা বলেছি তাঁর পদের নাম হবে মহা-বাণিজ্যিক মুদ্রক [Commercial Master Printer]। তাঁর কাজ হবে মুদ্রণ নিয়ামককে [Controller of Printing] পরামর্শদান, মহা বাণিজ্যিক মুদ্রকের [Commercial Master printer] পদ সৃষ্টিতে আমরা সম্প্রতি অর্থ দফতরের অনুমোদন পেয়ে গেছি। আমি নিশ্চিত ইংলন্ডে কমিটি গঠন করে যে কাজ পাওয়া যেত সেই কাজ এখানে এই আধিকারিককে (officer) দিয়েই পাওয়া যাবে।

ড. পি. এন. ব্যানার্জি : আধিকারিক কি একজন ইউরোপীয়, না কি একজন ভারতীয়?

মাননীয় ড. বি. আর আম্বেদকর : আমরা সবেমাত্র অর্থ দফতরের অনুমোদন পেয়েছি।

শ্রীযুক্ত যমুনাদাস এম. মেহতা (অ-মুসলমান গ্রামীন প্রতিনিধি, মধ্য বোম্বাই) সাশ্রয়ের জন্য আধিকারিক নিয়োগ। সেই নিয়োগের জন্য অর্থব্যয়। কোনটি বেশি ব্যয়সাপেক্ষ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আশা করি সাশ্রয়ের-ই জয় হবে। আশা এবং ভরসা করতে দোষ কোথায়? কাগজ সম্বন্ধে এই প্রশ্নের উত্তরে এই কথাই বলতে পারি।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স উত্থাপন করেছেন সেটি হল সিমলায় আধিকারিকদের পরিবারসহ বসবাস সংক্রান্ত। তিনি হয়ত নিজেই বুঝতে পারছেন এই বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যায় ভারত সরকার নিজে একটু কোনঠাসা অবস্থায় আছে। সরকারের হাতে যা আবাসগৃহ আছে, এখন যুদ্ধের জন্য যে সমস্ত আধিকারিকরা নিয়োজিত হয়েছেন তাঁদের বাসস্থানের প্রয়োজনে সেই আবাসগৃহে মিটছে না। যুদ্ধেরও প্রয়োজন, বাসস্থানেরও প্রয়োজন। সমস্যা হল পরিবার সমেত আধিকারিকদের বাসস্থানের। কিন্তু এক্ষেত্রে আবার অগ্রাধিকারের প্রশ্নে তাঁদের নিজেদের পরিবারের থেকেও আধিকারিকরা এগিয়ে আছেন। তবুও তিনি যুদ্ধের প্রয়োজনে টানটান স্নায়ুর অধিকারী আধিকারিক। তবুও বিচ্ছেদ তা সে যে রূপেই হোক — স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, সন্তানের সঙ্গে পিতার — যুদ্ধের যন্ত্রীদের মনের ওপর ফেলবে চাপ এবং ছাপ। আর যুদ্ধের সময় যুদ্ধবাজদের এই চাপে ক্ষতি আমাদের-ই। সেইজন্যই আধিকারিকদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা এদেশটি ছেড়ে যেতে পারেন নি, তাঁদের জন্য সিমলায় বোর্ডিং তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছেন। স্যার ফ্রেডেরিক জেম্‌স নিশ্চয়-ই সরকারের সদিচ্ছা স্বীকার করবেন।

এখন স্যার আমি তৃতীয় প্রসঙ্গে আসতে পারি, যেটি আমার মান্যবর বন্ধু স্যার যমুনাদাস মেহতা তুলেছেন।

শ্রীযুক্ত যমুনাদাস এম. মেহতা : আমি দু:খিত, ক্ষমা করবেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আশা করি, নাইট উপাধিলাভে আপনার অগ্রগতি মসৃণ। আমি প্রসঙ্গ প্রত্যাহারেও যাব না, দু:খ প্রকাশও করব না, ধরে নিচ্ছি যা বলা হয়েছে সেটি আগাম সংকেত।

মৌলানা জাফর আলি খান (মুসলমান প্রতিনিধি, মধ্য-পূর্ব পঞ্জাব) : ছায়ার পিছু পিছু কায়া চলে। বৃষ্টির আগে ঘন মেঘের ছায়া।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তা বিতর্কে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, ইংলন্ডে ঔপনিবেশিক দেশসমূহের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মহাসভার যে অধিবেশন [Session of Dominion Labour Trade Union Congress] হতে চলেছে সেখানে ভারতের কোনও প্রতিনিধি নেই। আমি তাঁর এই দুঃখ বা আক্ষেপের সমভাগী। আমিও — এত গুরুত্বপূর্ণ শ্রম সম্মেলনে ভারত বাদ! কিন্তু আমি শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহ্‌তাকে জানাতে চাই যে, দুর্ভাগ্যে শ্রম দফতরের কোনও দায়িত্ব নেই। শ্রী মেহ্‌তাকে জানাই, এই সম্মেলনের আহ্বায়কেরা শ্রম দফতরের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেন নি। আর আলোচনা না করলে শ্রম দফতরের যে কিছুই করার নেই, এ কথা তো শ্রী মেহ্‌তা নিজেই স্বীকার করবেন। সম্মেলনের আহ্বায়কেরা কেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন না, কেনই বা তাঁরা এদেশে শ্রমিক আন্দোলনের স্থপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন না, জানি না। এই সম্মেলনের সংগঠকের পরিচিত ব্যক্তি কারা, এসব আমি খুব ভালই জানি। কিন্তু আমার মনে হয়, শ্রী মেহ্‌তাও আশা করি স্বীকার করবেন যে, শ্রম দফতরের মুখ্য কাজ অন্যান্য দফতরের নজরদারি, এক্ষেত্রে শ্রমিক এবং শ্রম স্বার্থ। ধন্যবাদ স্যার, আমার বক্তব্যে ইতি টানছি।

□ □ □

১১

*শ্রম-দফতরের স্থায়ী সমিতিতে সদস্য নির্বাচন

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রম দফতরের ভারপ্রাপ্ত) : স্যার, আমি সভায় আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব আনছি :

"মাননীয় অধ্যক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এই সভা তিনজন বেসরকারি [Non-official] সভ্যকে স্থায়ী সমিতিতে [Standing Committee] নির্বাচিত করুক যাঁরা শ্রম দফতরের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দেবেন।"

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আব্দুর রহিম) : "মাননীয় অধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে এই সভা তিনজন বেসরকারি সভ্যকে স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত করুক যাঁরা শ্রম দফতরের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দেবেন।"—সভায় পেশ হওয়া এই প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হল।

ড. বি. এন. ব্যানার্জি (কলকাতা পৌর এলাকা : অ-মুসলমান শহরাঞ্চলের প্রতিনিধি) : স্যার, বিভিন্ন দফতর সংশ্লিষ্ট বহু স্থায়ী কমিটি আছে কিন্তু এমন কোনও স্থায়ী কমিটি এই সভায় নেই যার সদস্য সংখ্যা কেবল তিন। এই স্বল্পসংখ্যক সদস্যের এই সভায় নির্বাচনের হেতু কি? এর উত্তর দুটি হতে পারে। এক শ্রম দফতরের কোনও গুরুত্ব নেই। অথবা এই দফতরের সংশ্লিষ্ট যে স্থায়ী কমিটি সেটি কোনওদিন গঠিতই হয়নি। হলেও নেহাৎই প্রয়োজনে কোনও বিষয়ের আলোচনায়। আলোচনা শেষে কমিটির আয়ুও শেষ। এই দুটি ব্যাপারেই আমাদের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন। এক শ্রম দফতর কতটা গুরুত্বপূর্ণ দফতর। শ্রম-দফতরের ভার আমাদের মনে রাখতে হবে, এখন একজন প্রখ্যাত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত আছে। সেই ব্যক্তির নাম ড. আম্বেদকর। কাজেই শ্রম দফতরটির যদি আগে কোনও গুরুত্ব নাও থেকে থাকে, এখন এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর। কারণ এই দফতরের দায়িত্বে তাঁর মতো খ্যাতনামা

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) দ্বিতীয় খণ্ড, ২০ মার্চ, ১৯৪৩, পৃ: ১২৭৮-৮০

এক ব্যক্তি আছেন। আর যখন এর গুরত্ব অসীম তখন এর সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি খুব উচিত বলে মনে করি। অর্থ দফতরের স্থায়ী কমিটি [Standing Finance Committee], রেলওয়ে স্থায়ী আর্থিক কমিটি [Standing Finance for Railways] বা গণহিসাব [Public Accounts] দফতরের কমিটি যেটির কথাই বলুন না কেন, প্রত্যেকটির সদস্যসংখ্যা তিনের থেকে অনেক অনেক বেশি। আমি যা শুনলাম, এই কমিটির সভা ঘন ঘন বসে না। আমি জানি না এটি সত্যি কিনা। এও সত্যি কিনা জানি না যে, কমিটির সভা বসলেও খুব একটা কর্তব্যকার্য সম্পন্ন হয় না। এ যদি সত্যি হয় তবে এই কমিটির উপযোগিতা নিঃশেষ হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়।

সেই কারণে সরকারের কাছে আমার নিবেদন এই যে, কমিটির সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে আটে করা হোক। আমি শুনেছি, দুজন সদস্য বাইরে থেকে মনোনীত। সেক্ষেত্রে আমার মত, এই আটজন সদেস্যের এই সভা থেকে নির্বাচিত হন। আপনারা যদি মনে করেন তবে অন্য সভার প্রতিনিধিও কমিটিতে স্থান পেতে পারে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার প্রস্তাবে সভায় এমন আলোড়ন উঠবে এ কথা আমার জানা ছিল না। কাজে কাজেই আমার বেশ ভাল লাগছে। কমিটির সদস্যসংখ্যা তিন কেন, এর উত্তরে বলি তিন এই সংখ্যাটি একটি সাধারণ সংখ্যা। সভা এটি বাড়াতেও পারে।

স্যার কমিটির সদস্যসংখ্যা কেন অল্প এর ব্যাখ্যায় ড. ব্যানার্জি তাঁর মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তার মতে দফতরের কমিটির প্রতি সৌজন্য অত্যন্ত অল্প বলেই কমিটির গঠনে এমন ঔদাসীন্য। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা স্যার, এমন নয়। সভার মনে থাকতে পারে যে, ১৯৪০ সালে কমিটির দুটি সভা বসেছিল এবং সেই সভা দুটিতেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়। যেমন শ্রম সম্মেলন প্রায়োগিক প্রশিক্ষার অনুসন্ধান কমিটি [Technical Training Inquiry Committee] যে কমিটি বসানো হয়েছিল দক্ষ শ্রমিক প্রশিক্ষণ এবং তাদের দিল্লিতে বসবাসের সমস্যা সংক্রান্ত ব্যাপারে। ১৯৪১ সালে এই কমিটির একটি সভা বসে এবং সেই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রমমন্ত্রীদের দ্বিতীয় সম্মেলন এবং বেভাইন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা [Bevine Training Schemc]। ১৯৪২ সালে একটি সভা বসে এবং আর একটি সভা মুলতুবি হয়ে যায়। তৃতীয় শ্রমমন্ত্রী সম্মেলনের কার্যবিবরণী, কোন কোন বিষয়ের ওপর শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের

মতামতের সারসংক্ষেপ, দিল্লি এবং সিমলায় বসত নির্মাণের পরিকল্পনা, ট্রেড ইউনিয়নগুলির স্বীকৃতি বেভাইন প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার অধীনে কারিগরি শিক্ষার অগ্রগতি। ১৯৪০ সালের কারিগরি কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত জাতীয় কৃত্যক সম্বন্ধীয় অধ্যাদেশে সংশোধনী [Amendments to National Service (Technical Personnel) Ordinance 1940]—এসবই ছিল কমিটির আলোচ্য বিষয়। এখন নিশ্চয়-ই একথা কেউ বলবেন না, কমিটির সামনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দফতর থেকে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় না।

বলার কথা আরও আছে। শ্রম দফতরের পরামর্শদানের জন্য এই কমিটি ছাড়াও আরও সংগঠন আছে। আমরা পূর্ণ বা অখণ্ড সম্মেলন [Plenary Conference] করেছি। এই অখণ্ড সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করছেন কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, বিভিন্ন ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি। এছাড়াও আছেন বহুল সংখ্যায় শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের প্রতিনিধিবৃন্দ। এই সম্মেলনের বাইরেও আছে স্থায়ী শ্রম উপদেষ্টা কমিটি [Standing Labour Advisory Committee]। এর পরেও আমার মান্যবর বন্ধুর দাবিমতো আমাদের আলোচ্য কমিটির সদস্যসংখ্যা যদি বাড়াতে হয় তবে আমার কোনও আপত্তি নেই। সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে আটই হোক। এর মধ্যে পাঁচ জন নেওয়া হোক নিম্ন কক্ষ থেকে, বাকি তিনজন উচ্চ কক্ষ থেকে। আমার মনে হয়, আমার মান্যবর বন্ধুবৃন্দের এই ব্যবস্থা পছন্দসই হবে।

শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ. এশাক সাইত (মুসলমান প্রতিনিধি, পশ্চিম উপকূল এবং নীলগিরি) : মাননীয় সদস্য কি সভাকে জানাবেন যে, এই কমিটির সদস্য এবং অখণ্ড সম্মেলনের সদস্য এক-ই ব্যক্তি কিনা?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কোনও কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমাপতন ঘটেছে। যেমন শ্রীযুক্ত মেহতা এবং শ্রীযুক্ত যোশি। এঁরা স্থায়ী কমিটি এবং অখণ্ড সম্মেলন দুয়েরই সদস্য।

শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ এশাক সাইত : তাঁরা কি পদাধিকার বলে অখণ্ড সম্মেলনের সদস্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না, না। তাঁরা তাঁদের সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

মৌলভী মহম্মদ আবদুল গনি (মুসলমান প্রতিনিধি, তিরহুত) : স্যার যুদ্ধকালীন

সময়ে এই শ্রম কমিটির সংস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রম সমস্যা নিয়ে এটি ব্যস্ত আছেই; দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্যের বক্তব্যে পরিষ্কার যে এই কমিটি আরও বহুবিধ কাজে ব্যস্ত..........

মাননীয় অধ্যক্ষ (স্যার আব্‌দুর রহিম) : শ্রম দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ইতিমধ্যেই এর উত্তর দিয়েছেন। প্রস্তাব হল :

"মাননীয় অধ্যক্ষের নির্দেশক্রমে এই সভা পাঁচ জন বেসরকারি সভ্যকে স্থায়ী কমিটিতে নির্বাচিত করছে, যাঁরা শ্রম দফতরের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ দেবেন।"

প্রস্তাব গৃহীত। —

□ □ □

১২

*ভারতীয় চা নিয়ন্ত্রণ বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, শ্রীযুক্ত যোশির মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের অবস্থান সভাকে জানানো স্বাভাবিক বলে মনে করছি। যদি শ্রী যোশির কথা তার নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তবে অনেকেই বলতে পারেন তাঁর মন্তব্য এখানে অ-প্রসঙ্গিক। কারণ আমরা আলোচনায় বসেছি। চা নিয়ন্ত্রক বিষয় আইন নিয়ে আর সেখানে শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আলোচনার কোনও অর্থ দাঁড়ায় না। কিন্তু আমরা যদি শ্রী যোশির মন্তব্যটিকে তাঁর নির্দিষ্ট বৃত্তের বাইরে নিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রের দর্পণের সামনে নিয়ে যাই তবে আমরা স্বীকার করে নেব যে যতটা অপ্রাসঙ্গিক আমরা যোশির মন্তব্য ভেবেছিলাম ততটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কারণ যখন সরকার কোনও শিল্পের চাহিদা এবং যোগানের সূত্রটিকে তার স্বাভাবিক জায়গা থেকে অপসৃত করে, তখন স্বভাবতই সেই শিল্প সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়গুলি প্রভাবিত হয়। শ্রমিক এবং শ্রম উপাদান এর ফলে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়। শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে যাঁরা চিন্তাশীল তাঁদের কাছে এই অবস্থা অবশ্যই চিন্তার কারণ। কাজেই আমার তরফে সরকারি ভাষ্য প্রদান জরুরি বলে মনে করি।

শ্রীযুক্ত যোশি বলেছেন যে, অদ্যাবধি প্রায় ১২ বছর হয়ে গেল শ্রম প্রসঙ্গে রয়্যাল আয়োগ যে প্রতিবেদন পেশ করেছিল, ভারত সরকার সেই প্রতিবেদনের পরামর্শ অনুযায়ী কোনও কাজ-ই করেনি। স্বীকার করি, বারোটি বছর এক লম্বা সময়। যে সময়ের মধ্যে রয়্যাল আয়োগ তাদের অনুসন্ধানের পরে যে সুপারিশ করেছিল সেই সুপারিশ বাস্তবে সরকার পরিণত করতে পারত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করার পর শ্রী যোশি এবং সেইসঙ্গে সভাস্থ সকলে অনুধাবন করবেন সব অভিযোগের তীর ভারত সরকারের দিকে লক্ষ্য করে লাভ নেই। মাননীয় সদস্য স্মরণ করুন রয়্যাল আয়োগ চা আবাদের ব্যাপারে পাঁচটি সুপারিশ

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) দ্বিতীয় খণ্ড, ২৩ মার্চ, ১৯৪৩, পৃ: ১৩৭০-৭৩

করেছিল। প্রথম, 'অসম দেশান্তরী শ্রমিক আইন'-এর, বদলে অন্য একটি আইন রূপায়ণের যে আইনে শ্রমিকের স্থানান্তর গমন সহজ হয়। দ্বিতীয়, চা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য পর্ষদ [Board of Health] গঠন শ্রমিক কল্যাণে যার হাতে থাকবে পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা, জলনিষ্কাশন, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা, বাসস্থান ইত্যাদি ব্যাপারে, আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের ক্ষমতা। চতুর্থ, দ্রুত বেতন পাবার ব্যবস্থা নেওয়া এবং চা আবাদের শ্রমিকরা যাতে দরকারে আগাম পেতে পারে এবং সেই আগাম দেওয়া অর্থ যেন সহজ কিস্তিতে কেটে নেওয়া হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ। পঞ্চম এবং শেষ সুপারিশ, চা বাগানগুলি যেন জনগণের অগম্য না হয়।

সুপারিশগুলি পেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার কোনও সময় নষ্ট না করে খতিয়ে দেখতে শুরু করে যে, সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের জন্য প্রাধিকার কার আছে। নিরীক্ষায় দেখা গেল, শুধু প্রথমটি ছাড়া বাকি সুপারিশগুলির বাস্তবায়ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। সুপারিশগুলির রূপায়ণে এই স্থানিক বিভাজনের অর্থ এই নয় যে, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দায়িত্বের নিষ্কৃতি। এই ব্যাপারটি যেন আবার তর্কের বিষয় না হয়। সুপারিশগুলি পেশের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অসম সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়, 'র‍্যয়াল শ্রম আয়োগে'র সুপারিশগুলির মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকি সব কটি সুপারিশের রূপায়ণের ব্যাপারে অসম সরকারকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হল। আর প্রথম সুপারিশটি অর্থাৎ 'অসম দেশান্তরী শ্রমিক আইন'টি নিয়ে ভারত সরকার কালক্ষেপ না করে আইনে পরিণত করায় সচেষ্ট হয়। ভারত সরকারের সেই প্রচেষ্টা মাননীয় সভ্যবৃন্দ নিশ্চয়-ই লক্ষ্য করেছেন। আইনটি এখন সংবিধিতে [Statute Book] লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: অসম সরকার তার করণীয় কর্তব্যে একটুও অগ্রসর হয়নি। কেন হয়নি তা দুর্বোধ্য। এবং শ্রীযুক্ত যোশি সুপারিশগুলি পেশ করার দিন থেকেই যিনি সভায় ছিলেন, তিনি আশা করব সবকিছু অবগত আছেন। তথাপি তাঁর মনে কেন আবার প্রশ্ন উঠল, এটিই একটি প্রশ্ন।

কিন্তু ভারত সরকারের তরফে আমি একটি কৃতিত্ব দাবি করছি। ভারতের সরকার কাজ করেছে। সভাকে আমি মনে করিয়ে দিই, ১৯৩৮ সালে যখন ভারতের চা নিয়ন্ত্রণ আইন সভায় আলোচনার জন্য এল তখন ভারত সরকারের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। উদ্যোগটি কিসের ছিল? ছিল চা আবাদ শিল্পে শ্রমিকদের অবস্থা। মান্যবর শ্রীযুক্ত গ্রিফিথ্স এবং স্যার ফ্রেডেরিক জেম্সের

নিশ্চয়-ই মনে আছে শ্রম দফতর এবং আবাদকারীদের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সভার আয়োজনও করা হয়েছিল।

মৌলানা জাফর আলি খান : অসম সরকারের এই কর্তব্যে গাফিলতির জন্য কি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে অসম সরকারকে ভর্ৎসনা করা হয়েছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ঐ দফতরের সেই সময়কার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যই এই ব্যাপারে আরও ভালভাবে আলোকপাত করতে পারবেন। আমি সবে গতকাল এসেছি এবং আমি খুব অল্পই জানি। শ্রীযুক্ত যোশির অনুসন্ধানের জবাবে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আমি খুব্ অল্পই জানি। তবে একথা স্বীকার করি যে, সময় এতটা অহেতুক গড়িয়ে গেছে যে সে ব্যাপারে অনুসন্ধানের আবশ্যিক প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর অনুসন্ধানের ব্যাপারে যখন ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে ঠিক তখনই অসমের কংগ্রেস সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবার কথা চিন্তা করলেন বা বলা যায় পদক্ষেপ নিলেন। একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ১৯৩৯ সালের ২৩ মে অসম সরকার এ ব্যাপারে একটি কমিটি গঠন করলেন। অসম সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে ভদ্রলোকের চুক্তি মেনে ভারত সরকারকে সরে দাঁড়াতে হল। কেননা ভারত সরকার আগেই স্থানীয় ভিত্তিতে দায়িত্ব বেঁটে দিয়েছিল। আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত যোশি যে নির্দিষ্ট বাঁধনের প্রশ্নটি সভায় ছুঁড়েছেন, তার উত্তর সঠিকভাবে আমার জানা নেই। তবে আন্দাজ করি অসম কমিটির সদস্যদের মধ্যে বোধহয় মতবিরোধ ছিল, যে মতবিরোধ অন্তর্বিরোধে পরিণত হয়েছিল। ফলত কমিটি অপসৃত হয়েছিল। শেষমেষ অসম সরকার কোনও কাজ-ই করে উঠতে পারেনি। বদলে একটি প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অসম সরকার জানিয়ে দেয়, অকৃতকর্মের কারণ এবং কমিটির অপসারণ। এইভাবে ১৯৩৯ সালের জুলাইয়ের শেষার্দ্ধ চলে আসে। এরপর সকলেই জানেন, কিছুদিনের মধ্যেই বেজে ওঠে যুদ্ধের দামামা। সেই দামামার শব্দের মধ্যে হারিয়ে যায় স্থানীয় বা ভারত যে কোনও সরকারের অনুসন্ধানে উচ্চকণ্ঠ। এমতাবস্থায় শ্রী যোশি বোধহয় নিজেও ভারত সরকারকে ভর্ৎসনা করতে রাজি হবেন না।

মূল প্রশ্নে যদি আমরা ফিরে আসি অর্থাৎ সরকার শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করছে কি করছে না, তবে আমার উত্তর সরাসরি এবং খুব স্পষ্ট। শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা সরকারের পর্বতপ্রমাণ গুরুত্বের একটি প্রশ্ন। চা আবাদে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে আমি কোনও আলোচনা করছি না। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সংবাদপত্রে তো

তথ্য ছাপা হচ্ছেই। বিশেষ করে বেতন সংক্রান্ত তথ্য। অসম এবং সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) চা আবাদে নিযুক্ত শ্রমিকদের তুলনামূলক বেতনের তথ্য। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরণের তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা আমার কাছে নেই। আমাদের কাছে ঠিকঠাক তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যাবে না। কারণ এ ব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোনও অনুসন্ধান-ই হয়নি। কিন্তু তবুও একটা কথা বলতে পারি ভারতের চা আবাদে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থার জায়গা ভেদে তারতম্য ঘটে। এক্ষেত্রে কোনও অপরিবর্তনীয় মান নেই যাকে একক বিবেচ্য হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। শ্রমিকদের অবস্থান ভেদে এই বিভিন্নতা ভারত সরকার মেনে নিয়েছে। আর বিভিন্নতার মধ্য থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আহৃত কোনও তথ্য সরকারের কাছে না থাকার দরুণ সরকারের পক্ষে আইন প্রণয়নে বাধা রয়েছে। তবে অবস্থা এমন হলেও এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা করার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোনও বাধা আছে। আমার মান্যবর শ্রীযুক্ত যোশির স্মরণ থাকতে পারে যে রয়াল আয়োগ যে সুপারিশের প্রতিলিপি সরকারের ঘরে জমা দিয়েছিল। সেই প্রতিলিপিতে অতিরিক্ত একটি ক্রোড়পত্র জুড়ে দিয়েছিল। সেই ক্রোড়পত্রে কি ছিল? ছিল সংস্থান। কিসের সংস্থান? সংস্থান ছিল সুপারিশ লাগু হওয়ার আগে নির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধানের সংস্থান। এখন স্যার, একথা বলতে পারি যে, ভারত সরকারের এ ব্যাপারে সন্দেহের নিরসন ঘটেছে যে, নির্দিষ্ট তথ্যের খোঁজ করা হয়েছে কি হয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে এই মত পোষণ করি যে, একটি নির্দিষ্ট মানের শ্রমিক কল্যাণ চা চাষের ক্ষেত্রে থাকা উচিত। অন্যথায় সমস্যা হবে। মান্যবর বন্ধু শ্রী যোশি যা বলেছেন তা আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সিংহলের সরকারকে বেতন সংক্রান্ত কোনও পরামর্শ প্রদান করা মোটেই শোভন হবে না। উচিত হবে না সেই এক-ই বেতন কাঠামো ভারতে চালু করা। ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অধ্যাদেশ বলে শ্রমিকদের ওপর বিভিন্ন বিধি-নিষেধ খারিজ করার মাধ্যমে শ্রমিকের শ্রম পরিবেশ সঠিক রাখার ব্যাপারে সদাই তৎপর। চা আবাদের ক্ষেত্রেও এই একই নীতি লাগু আছে। অতীতের অবস্থা থেকে আজকের অবস্থার সেইজন্য কিছুটা ফারাক ঘটেছে, আজ পর্যন্ত নির্ধারিত বেতন খানিকটা ভারি তো হয়েইছে।

এখন তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, আমরা এই বর্তমান সময়ে কোনও অনুসন্ধান করব কি না? দুটি বিষয়ে শ্রীযুক্ত যোশি এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমার মধ্যে কোনও মতবিরোধ নেই। তা হল সঠিক মান বজায় রাখা।

আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী যোশি এবং অন্যান্য মাননীয় সভ্যবৃন্দ জানেন যে ভারতের চা আবাদের বেশিরভাগটাই রয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে অসমে এবং বাংলায়। আর এই দুটি অঞ্চল-ই শত্রু আক্রমণের চারণক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই কোনও অনুসন্ধান কেন কঠিন, তা সহজেই অনুমেয়। এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। তাহলে আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেরাতে হয় ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে। এ প্রসঙ্গে জানাই যে, চা আবাদ ভারতের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলে কিভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে। ১৯৪১ সালের যে সংখ্যাটি আমার কাছে আছে তাতে দেখা যাচ্ছে, উত্তর ভারতে চা চাষ হয় ৬,০৭,০০০ একর জমিতে, যেখানে দক্ষিণ ভারতে এর পরিমাণ ১,৬৩,১৩২ একর। আর আবাদের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যা উত্তরে ৭,৭৩,৯৬৯ এবং দক্ষিণে ১,৪৪,৩৮৫।

স্যার, এফ.ই. জেম্‌স (ইউরোপীয় প্রতিনিধি, মাদ্রাজ) এ তো চায়ের কথা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, আমরা শুধু চায়ের কথা নিয়েই আলোচনা করছি। যে সংখ্যাতত্ত্বের আমি উল্লেখ করেছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ভারতে চা আবাদ উত্তর ভারতের আবাদের তুলনায় যৎসামান্য।

মৌলানা জাফর আলি খান : অসমে চা আবাদ মোট কত জমিতে হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষকে এই দুভাগে ভাগ করে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করছি। অসম নিয়ে আলাদা কোনও আলোচনায় যাচ্ছি না। অসমকে উত্তর ভারতের মধ্যেই ধরে নেওয়া হয়েছে। আবাদের পরিমাণ থেকেই এটি পরিষ্কার, উত্তর ভারতে চা আবাদে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যার তুলনায় দক্ষিণ ভারতে ঐ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা খুব-ই কম। আর ভারতের এই অংশে অনুসন্ধান হবে আংশিক আর সীমাবদ্ধ, তাতে লাভ কিছুই হবে না। যুদ্ধের ডামাডোলে সামগ্রিক মূল্যায়ন বলে কিছু থাকবে না।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : আমি মাননীয় সদস্যকে একথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, শ্রমিক প্রসঙ্গ ঘটনাক্রমে এই আলোচনায় উঠে এসেছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার আর কিছু বলার নেই।

ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদ : আমার প্রশ্ন চা বাগানের মালিকেরা চা উৎপন্ন না করেও পর্যাপ্ত অর্থ কেন পেল? এই অর্থ তো উপভোক্তাদের পকেট কেটে দেওয়া হল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই ব্যাপারটি বলতে পারেন বাণিজ্য সচিব।

কয়েকজন মাননীয় সদস্য : এই প্রশ্নটি রাখা হল।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রস্তাবিত জিজ্ঞাস্য :

"এখন এই প্রশ্নটিই উপস্থাপিত করা হল"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

১৩

*যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বিমা বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম দফতরের ভারপ্রাপ্ত) স্যার আমি প্রস্তাব পেশ করছি :

"এমন একটি বিধেয়ক আইন মোতাবেক হোক, যার দ্বারা মালিকপক্ষ তাদের নিয়োজিত শ্রমিক যে বা যারা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাকে বা তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। এ ব্যাপারে মালিকপক্ষ যাতে বিমার সুবিধা পেতে পারে সেটিও দেখা হবে। এই বিধেয়কটি পর্যালোচনার জন্য প্রবর সমিতিতে পাঠানো হোক। সিলেক্ট কমিটি গঠিত হোক স্যার ভিটল এন. চন্দ্রভারকার, শ্রী এন. এম. যোশি, শ্রী যমুনাদাস এম. মেহতা, শ্রী ডি. এস. যোশি, শ্রী হুসেনভাই এ. লালজি, খান বাহাদুর মিঞা গুলাম কাদির মুহম্মদ শাহ্‌বান, শ্রী সি. সি. মিলার, শ্রী ই. এল. সি. গুইল্ট, মৌলানা জাফর আলি খান, ইউসুফ আবদুল্লা হারুন, হাজি চৌধুরি মহম্মদ ইস্‌মাইল খান, শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ. ঈশাক সাইত্‌ শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আর. আর. গুপ্ত এবং এই প্রস্তাবককে নিয়ে। এই প্রবর সমিতিতে সভা বসবার জন্য আবশ্যক সভ্যসংখ্যা হবে পাঁচ। আর এই কমিটির সিমলায় সভা করার ছাড়পত্র থাকবে।"

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্য কি কোনও তালিকা দিয়েছেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সেই নামের তালিকাই আমি এখন দিচ্ছি।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : তালিকাটি আগেই দেওয়া উচিত ছিল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সভাস্থ সদস্যদের কাছে এই তালিকা পেশ তো বেশি সময়ের ব্যাপার নয়। এই বিধেয়কে তিনটি প্রধান ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। এক নম্বর, যুদ্ধে হতাহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ। দু নম্বর

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), দ্বিতীয় খণ্ড, ৩১ মার্চ, ১৯৪৩, পৃ: ১৬৪৯-৫১.

এই ক্ষতিপূরণে মালিকদের দায়বদ্ধতা। তিন নম্বর, ক্ষতিপূরণের বিমাকরণে মালিকদের বাধ্য করা।

ক্ষতিপূরণের তৌলদণ্ড হিসাবে একটি এই বিধয়েকটি সংযুক্ত অংশ হিসাবে আমরা ধরতে পারি। ১৯৪১ সালে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অধ্যাদেশ জারি হয়েছিল। সেই অধ্যাদেশে নির্দিষ্ট ছিল, যুদ্ধে যথার্থ ক্ষতির [Qualifying Injuries] সংজ্ঞা। সেই সংজ্ঞার সীমারেখা মেনেই বর্তমান এই বিধেয়ক পেশ করা হয়েছে। আর শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতিপূরণ আইনে ক্ষতিপূরণের যে সংস্থান আছে, এই বিধেয়কে প্রায় সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের সংস্থান রাখা হয়েছে।

১৯৪১ সালে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত অধ্যাদেশ লাগু হবার পরে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। প্রশ্নটি গুরুত্বে গম্ভীর। যুদ্ধে যে শ্রমিকের যথার্থ ক্ষতি হয়েছে, তাকে যে অর্থ দেওয়া হবে সেটি কি যুদ্ধের শিকার অভাগার ত্রাণ না ক্ষতিপূরণ। এ দ্বন্দ্বে ধারণা এবং সংজ্ঞা খুব স্বচ্ছ। প্রথমটি হবে তখন-ই যখন একজন যুদ্ধে আঘাতজনিত অসামর্থে অর্থাভাবে পড়েছে সেটি কাটিয়ে ওঠার জন্য এক দান, যার ফলে তাকে রুজি-রুটি ধান্দায় না বেরোতে হয়। শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতিপূরণ আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হবার ফলে তার আয়ের যে ক্ষতি হল, সেই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া। এই ধরণের দ্বন্দ্বের সমাধানে টেনে আনা হয় ইংলন্ডে চালু যে আইনটি এ ব্যাপারে কার্যকরী। আইনটির ১৯৩৬ সালের যুদ্ধে ক্ষতিসংক্রান্ত বিবিধ আইন। এই আইনে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটি ক্ষতিপূরণ, ত্রাণ নয়। এখন প্রশ্ন এই যে, ভারত সরকার ইংলন্ডে চালু এই আইনটিকে আদর্শ করবে কি না? এ ব্যাপারে একটি তথ্য পেশ করা যাক। কোনও কোনও মালিক ১৯৪১ সালের যুদ্ধে ক্ষতি অধ্যাদেশ চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারকে তিনি জানিয়েছে অধ্যাদেশে যে সংস্থান আছে, তাতে শ্রমিকদের মনোবল বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকার শ্রমিক যেন কাজ ছেড়ে চলে না যায়, তার কথা ভেবে দেখা দরকার। এ সমস্ত কারণেই ভারত সরকার ঠিক করেছে, ত্রাণের বদলে ক্ষতিপূরণ।

আমরা যুদ্ধে ক্ষতি অধ্যাদেশের সঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষতিপূরণ আইনের সম্পর্ক নিয়ে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পরিপূরক বিধেয়ক নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমাদের আলোচ্য, শ্রমিকদের দেয় ক্ষতিপূরণে মালিকের দায়। আমরা মালিকের এই দায়িত্বকে এক আবশ্যিক দায়িত্বে পরিণত করতে চাই। এমন প্রশ্ন

এখানে ওঠা অবান্তর নয় যে, কেন সরকার এই দায় বহন করবে না। উত্তরে, এর কারণ বর্তমান পরিস্থিতি। পরিস্থিতি যদি স্বাভাবিক হত, তবে এমন কোনও দায়-দায়িত্বের প্রশ্ন উঠত না। হ্যাঁ, এটা ঠিক, সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রাণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু আজকের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে দায় বহণ করা খুব শক্ত। কারণ আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই দায়ের চরিত্র হয়ে যাবে নিঃসীম। অন্যদিকে নির্দিষ্ট মালিকের কাঁধে নির্দিষ্ট শ্রমিকের দায় চাপানোতে তার একটা সীমারেখা থাকবে। তবুও বলি, সেই দায়েও সরকারের দায়িত্ব জড়িয়ে থাকে কিভাবে? ই.পি.টি. অনুযায়ী সরকারি কোষাগারের ওপর খরচের চাপ পড়েই।

এখানে বলার আরও আছে। ভারত সরকার এই কর্তব্যকর্ম যেমন বেসরকারি মালিকের ওপর আরোপ করছে, তেমন সরকারি কর্মীদের বেলায় যে কর্তব্য সরকারের আছে, সেটিও বিস্মৃত হচ্ছে না। মাননীয় সদস্যবৃন্দ হয়ত খেয়াল করেছেন যে, এই বিধেয়কটির একটি ধারায় দেখানো আছে যে, রাজকর্মচারী এবং যুক্তরাষ্ট্র রেলওয়ের কর্মচারীদের বেলায় এই আইন কার্যকরী না হলেও আইনের যে সমস্ত সুযোগ সুবিধার সংস্থান আছে, তা এই দুই ধরণের কর্মচারীবৃন্দই পুরোপুরি ভোগ করবেন। এক্ষেত্রে এই সভার কাছে এই সংবাদ থাকুক যে, এই দু ধরণের কর্মচারীবৃন্দই বাড়তি উত্তরবেতন পাওয়ার অধিকারী। জন কৃত্যক নিয়ামন এবং রেলওয়ে কর্মচারীদের চাকরির যে সংবিধি নিয়ম, দুটিতেই এমনতর সংস্থান করা আছে।

যুদ্ধে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আলোচনায় তৃতীয় একটি দিক সভার গোচরে আনা দরকার। সেটি হল, যুদ্ধে শ্রমিকের অন্নের উৎসটি ধ্বংস হয়ে গেল। সেক্ষেত্রে মালিক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দেবে কি করে। এমনটি হতে পারে, যখন শ্রমিকের কাজের জায়গা, ধরা যাক সেটি একটি কারখানা, সেটি বোমাবর্ষণে উড়ে গেল। তখন? তখনও মালিক শ্রমিককে তার অন্নের পরিপূরক ক্ষতিপূরণ দেবে। কিভাবে? বিমার মাধ্যমে। এই বিমা মালিক করতে বাধ্য থাকবে। বিমার কিস্তির সঠিক পরিমাণ ঠিক হবে যুদ্ধে। আপাতত সরকার মালিকের হয়ে বিমার এই কিস্তি দিয়ে দেবে। এরপর সরকার প্রত্যেক মাসে মালিকের কাছ থেকে আগাম কিছু টাকা নিতে থাকবে। এই আগাম টাকার পরিমাণ প্রত্যেক মাসে পাল্টাবে। তবে প্রথম চারমাসে মালিকের বেতনখাতে খরচের হিসাবের একশর আট আন্নি হবে, এর বেশি কখনই নয়। হিসাবের একটা দিক মাথায় রাখতে হবে, বছরকে যে চারটি ভাগ করা হয়েছে, তার কোনও চতুর্থাংশে যদি হতাহতের ঘটনা না ঘটে

তবে পরের চতুর্থাংশে সরকারকে দেয় মালিকের অগ্রিমের পরিমাণ কমে যাবে। কাজেই বোঝাই যাচ্ছে, দেয় অগ্রিম প্রত্যেক চতুর্থাংশে যে এক-ই থাকবে এমন কোনও মানে নেই। এটি পরিবর্তন সাপেক্ষ। এই ভাবনার বাস্তবে আর একটি সুফল পাওয়া যাবে। যে সমস্ত অঞ্চল সামরিক আক্রমণ প্রবণ এলাকা নয়, সে সমস্ত অঞ্চলের মালিকের দেয় এই অগ্রিম আক্রমণপ্রবণ এলাকার শ্রমিকের কল্যাণে কাজে লাগবে। এই অগ্রিমের পরিমাণও আনুপাতিক হারে ঠিক হবে।

স্যার, তাহলে একথা বলা যায় যে, বিধেয়কটিতে [Bill] যে সংস্থান করা হয়েছে তা সাধারণ ব্যবস্থা যে, ব্যবস্থা বিতর্কের উর্দ্ধে বলেই মনে করি। সভার কাছে নিবেদন (এই যে বিধেয়কটির পরিকল্পনা আসে ১৯৪২ সালে বোম্বাইয়ের বস্ত্রকল মালিক সমিতির কাছ থেকে আসা প্রস্তাব মোতাবেক। প্রস্তাবটি ভারত সরকারের কাছে আসার পর এনিয়ে এক ঘরোয়া বৈঠক বসে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সরকারের শ্রম দফতরের সচিব, স্যার হেনরি রিচার্ডসন, স্যার ফ্রেডেরিক জেম্স, শ্রীযুক্ত হ্যাডো, শ্রীযুক্ত গুইল্ট এবং হুসেনভাই লালজি। তাঁদের পরামর্শ পাওয়া গেল। মালিকদের সঙ্গে আলোচনা হল। দুটি সর্বভারতীয় শিল্পপতি সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হল এবং তারা সম্পূর্ণ সমর্থন করল। কিন্তু মালিক সংঘ এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত। এটি দুর্ভাগ্যের। এক পক্ষ এর পক্ষে, অন্য পক্ষ বিপক্ষে। অন্যদিকে স্থায়ী শ্রমিক কমিটি সর্বসম্মতভাবে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন জানাল। বিধেয়কটি গুরুত্ব বুঝাতে আর কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

* * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার আমার আনা প্রস্তাব সামগ্রিকভাবে সভার সমর্থন লাভ করেছে। এটি আমার কাছে আনন্দের। দু একটি অন্য সুর উঠে এসেছে। যেমন শ্রীযুক্ত মিলার এবং শ্রীযুক্ত যোশির কয়েকটি ব্যাপারে বোধহয় কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। শ্রীযুক্ত মিলারের বক্তব্য, এই ব্যাপারে সরকারের দিক থেকে আরও তথ্য সভায় দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ঠিক কোন কোন বিষয়ে তাঁর জানা প্রয়োজন সেটি তো আমাকে জানতে হবে। তাঁর উত্থাপিত একটি প্রশ্নে আমার মনে হয় যে, তাঁর মনে এখন যে ক্ষতিপূরণ হার চালু তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ হারের প্রভেদটি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। আমার ধারণায়, তাঁর এ ভয় অহেতুক। আমার ব্যাখ্যায় সবকিছু স্পষ্টকরে বুঝানো ছিল। যাদের বেতন ২৪ টাকার কম, তারা পেত ক্ষতিপূরণ। যাদের বেশি তারা পাবে ত্রাণ। আমরা যেটি

করতে চাইছি সেটি হল দুক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ চালু করতে। তাহলে এটি তো প্রভেদের নয়, এটি সমতার। তবে শ্রী মিলার আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রসঙ্গ এনেছেন, যেটি আমি মেনে নিচ্ছি। তিনি বলেছেন খণ্ড (Clause) ৫ অনুযায়ী যাদেরকে শ্রমজীবী বলা হচ্ছে, শুধু তাদের জন্যই এই আইন। এটি সত্যি। কারণ সব ধরণের শ্রমজীবীর জন্য সরকার ব্যবস্থা নিতে পারছে না। কারণ, এক তো এ দায় হয়ে যাবে সীমাহীন। দুই, এই বিশাল জনসংখ্যারে দেশে বিমাকরণের জন্য সব ধরণের মালিক চিহ্নিতকরণ প্রায় দুঃসাধ্য এক কর্ম। প্রশাসনিকভাবে এ কাজ মুখ থুবড়ে পড়বে। এই কারণেই খণ্ড ৫ অনুযায়ী আমাদের চলতে হচ্ছে, যেটি আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত মিলারের পছন্দের নয়। তাঁর জিজ্ঞাসার কিছু কিছু উত্তর তিনি আমার মান্যবর বন্ধু শ্রীযুক্ত যোশির বক্তব্যের মধ্যেই তিনি পেয়ে গেছেন। আমি এর আর পুনরাবৃত্তি করব না। উদ্দেশ্য এবং কারণ সম্বলিত বিবরণের মধ্যেই অনুচ্ছেদে এর উত্তর পাওয়া যাবে। যারা কলকারখানায় কাজ করে, সেই সমস্ত শ্রমিকের যুদ্ধে বিপদ সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশি কারণ কে না জানে, শত্রুপক্ষ কলকারখানাগুলিকেই তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করে। সেই কারণেই শ্রমিকের সংজ্ঞানুযায়ী এদের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে।

মান্যবর বন্ধু শ্রী যোশিও বলেছেন যে, বিধেয়কটিতে সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য সংস্থান নেই। এ ব্যাপারে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন অসমে আবাদে কর্মরত শ্রমিকদের এবং নাবিকদের। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলি, সরকার এ ব্যাপারে অবগত আছে। আর অবগতিতে আছে বলেই খণ্ড ৫-এ একটি উপধারা, গ-উপধারার ব্যবস্থা করা আছে, এই উপধারা অনুযায়ী সরকারের নিজের হাতে কিছু ক্ষমতা রক্ষিত আছে যে ক্ষমতার বলে এই আইনের সংস্থান অন্য অন্য শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ পর্যন্ত যাদের শ্রমিক বলে সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, ভবিষ্যতে শ্রমিক বলতে শুধুই তাদেরকেই বুঝানো হবে এমন কোনও স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেই। সংজ্ঞার ক্ষেত্র বাড়তে পারে।

ড. পি. এন. ব্যানার্জি : এটির ব্যপ্তি তাহলে সামগ্রিক নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না। এবং ভবিষ্যতে যদি প্রয়োজন পড়ে তবে সরকার এই বিধেয়কে নির্দিষ্ট সংস্থান অন্য কর্মে নিযুক্ত শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করবে।

অসম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আমার উত্তর বর্তমানে বিধেয়কটির সীমার মধ্যে সেই সমস্ত শ্রমজীবী পড়ছে যাদের কর্মক্ষেত্র যুদ্ধের ভয়াবহতার লক্ষ্যভূমি। যতদূর জানি, অসমে চা আবাদ এখনও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার উন্মুক্ত বিচরণভূমি নয়। অসমে চা আবাদে নিযুক্ত শ্রমিকের ওপর যুদ্ধের নিয়তির দৃষ্টিপাতে সম্ভাবনা কম। যখন এই সম্ভাবনা বাড়বে তখন অবশ্যই শ্রীযুক্ত যোশি এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন অথবা তাও লাগবে না, সরকারি উদ্যোগ লাগু হয়ে যাবে।

এবার আসুন নাবিকদের প্রসঙ্গে। মনে হয় প্রসঙ্গটি বাণিজ্য দফতরের চিন্তা থেকে এসেছে। যতদূর জানি, নাবিকদের জন্য একটি কল্যাণ ব্যবস্থা ইতিমধ্যে চালু আছে। যদিও সে ব্যবস্থা বর্তমান বিধেয়কের ব্যবস্থার সমান মাপের নয়। তবুও আমার মান্যবর বন্ধু শ্রী যোশি যদি মনে করেন নাবিকদের ব্যাপারটি প্রবর কমিটিতে ববেচিত হওয়া উচিত তবে হতে পারে। বিবেচনার পর যদি কোনও বাড়তি সংস্থান তাদের জন্য করা হয় তবে দেখতে হবে সেই সংস্থান যেন প্রস্তাবিত সংস্থানের অনুরূপ হয়। যদি না হয়, তবে আমার আপত্তি আছে।

মান্যবর বন্ধু শ্রী মিলার এই বিধেয়কের দু একটি ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর প্রথম আলোচ্য উপধারা ৫(৩)। এ ব্যাপারে আমি তো বলেই দিয়েছি যে, সরকার সুচিন্তিতভাবে এই ধারার সংস্থান রেখেছে। কারণ আগামী দিনে আলোচ্য বিধেয়কটির প্রয়োগের ব্যাপ্তি যখন বাড়বে, তখন এই উপধারার প্রয়োজনীয়তা টের পাওয়া যাবে।

শ্রী মিলারের ৩ নং উপধারার দশ নং পরিচ্ছেদ নিয়েও প্রশ্ন আছে। সেখানে আছে যে, জমাখরচের যে অবশিষ্টাংশটুকু, সেটি সরকারের সাধারণ আয় বলে গণ্য হবে। শ্রী মিলারের আপত্তি এখানেই। কিন্তু আমি তো বলেইছি, মালিকের দেয় বিমার কিস্তির টাকা আসবে ই.পি.টি থেকে। অতএব অবশিষ্টাংশের উত্তরদায়-গ্রাহক হবে তো সরকার।

শ্রীযুক্ত ই. এল. সি. গুইন্ট (ইউরোপীয়, বোম্বাই)। আমি কি মাননীয় সদস্যের কাছে একটি প্রশ্ন রাখতে পারি? তিনি তাঁর প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন যে বস্ত্রকল মালিকদের সংঘই এই পরিকল্পনার স্থপতি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ওরা একটি প্রস্তাব দিয়েছে।

শ্রীযুক্ত ই. এল. সি. গুইল্ট : ওরা তো এই প্রস্তাবও দিয়েছিল যে, ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেবার পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তাতে শিল্প গবেষণার কাজ হবে। তাহলে ওর এই প্রস্তাব নিয়ে আমার মাননীয় বন্ধুবর কি ভাবলেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার স্মরণে আসছে না। তবে আমি দেখছি।

অধ্যক্ষ (সৈয়দ গুলাম ভিক নৈরঙ্গ) : সভায় অতএব এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হল যে "যুদ্ধে হতাহত শ্রমিককে তার মালিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে এবং শ্রমিকের জন্য তাকে বিমা করতে হবে। সেই বিমার ব্যবস্থা সরকারি দায়িত্বে হবে। এই পেশ করা প্রস্তাব প্রবর সমিতিতে বিবেচনার জন্য যাবে। প্রবর কমিটি গঠিত হবে স্যার ভিটল এন. চন্দ্রভারকার, শ্রী এন. এম যোশি, শ্রী যমুনাদাস এম. মেহতা, শ্রী ডি. এস. যোশি, শ্রী হুসেনভাই এ. লালজি, খান বাহাদুর মিএঞা গুলাম কাদির মহম্মদ শাহ্বান, শ্রী সি. সি. মিলার, শ্রী ই. এল. সি. গুইল্ট, মৌলানা জাফর আলি খান, শ্রী ইউসুফ আবদুল্লা হারুন, হাজী চৌধুরি মহম্মদ ইসমাইল খান, শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ ইশাক সাইত্ব শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী আর. আর. গুপ্ত এবং প্রস্তাবককে নিয়ে এই প্রবর কমিটির সভা বসবার জন্য আবশ্যক সভ্যসংখ্যা হবে পাঁচ। আর এই কমিটির সিমলায় সভা করার ছাড়পত্র থাকবে।"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

□ □ □

১৪

*দক্ষ এবং আধা-দক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র

স্থায়ী শ্রম কমিটির আলোচনা

৭ এবং ৮ মে শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে বোম্বাইতে স্থায়ী শ্রম কমিটির যে সভা বসেছিল, সেই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রমিক কল্যাণ, যুদ্ধকালীন উৎপাদন, দক্ষ এবং আধা-দক্ষ শ্রমিকদের কর্ম-বিনিয়োগ, শিল্পে অশান্তি এবং শ্রম সমস্যা নিয়ে পরিসংখ্যানভিত্তিক তথ্য।

সভা দক্ষ এবং আধা-দক্ষ শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র খোলার ব্যাপারে সাধারণ সম্মতি প্রদান করল। ঠিক হয়, এই পরিকল্পনা ঐচ্ছিক ভিত্তিতে চলবে। আরও ঠিক হয় কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র বিষয়ক উপদেষ্টা মণ্ডলীতে প্রাদেশিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

সভায় এও নির্দিষ্ট হল, সরকারি ঠিকা কাজে ন্যায্য মজুরির একটি ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই ধারার আওতায় গণ নির্মাণ দফতরের কাজকর্মের সাথে সাথে অন্যান্য দফতরের কাজকর্মও আসবে।

শ্রম-আইন

শ্রম এবং শ্রমিক সংক্রান্ত যে আইন এবং তৎসহ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে শ্রমিক কল্যাণে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার আওতায় আনা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা, মঞ্জুরি, শ্রমিক কল্যাণ এবং বেতন পরিষদ গঠন। প্রতিনিধিবৃন্দকে এ ব্যাপারে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ভারত সরকার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বিশ্বাসী যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শ্রমিক কল্যাণে উপদেষ্টার প্রতিমা হিসাবে কাজ করবে।

---

* 'ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন', ১ জুন, ১৯৪৩ ; পৃ: ৪৩১

সাধারণভাবে সভা এই সম্মতি পোষণ করল যে, শ্রম আধিকারিক শিল্পকেন্দ্রে নিয়োজিত থাকবেন যাতে করে তিনি শ্রমিকদের নিকট সান্নিধ্য থেকে তাদের অভিযোগ শুনতে পারেন, সম্ভব হলে দ্রুত তার প্রতিকার করতে পারেন। এ ব্যাপারে বোম্বাই বস্ত্রকল মালিকদের সংঘের পরিকল্পনা অনুযায়ী আধিকারিকদের হাতে কলমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব আছে, তার উল্লেখে আলোচনা হল।

এই সভায় কেন্দ্র ভারতীয় রাজ্যসমূহ এবং প্রদেশসমূহ থেকে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের থেকে প্রতিনিধি এবং উপদেষ্টা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন :—

ভারত সরকারের তরফে: শ্রী এইচ. সি. প্রায়র, সি. আই. ঈ., আই. সি. এস, শ্রম-দফতরের সচিব ; ডাঃ ডি. টি. জ্যাক, উপদেষ্টা ; শ্রী আর. এস. নিম্বকর (উপদেষ্টা) ; স্যার থিওডর গ্রেগরি (উপদেষ্টা।) এবং শ্রী ডি. এস. যোশি (সভা-সচিব)।

বোম্বাই: শ্রী সি.এইচ. ব্রিস্টো, সি.আই.ই., আই. সি. এস. মহামান্য ছোটলাটের উপদেষ্টা ; শ্রী জি. বি. কন্সটানটাইন, আই. সি. এস., শ্রম-মহাধ্যক্ষ (উপদেষ্টা)

বাংলা : শ্রী এ. হিউজেস্, আই.সি.এস. শ্রম-মহাধ্যক্ষ।

যুক্তপ্রদেশ : শ্রী জে.ঈ. পেডলে, সি. আই. ই., এম. সি., আই সি. এস., শ্রম-মহাধ্যক্ষ।

মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশসমূহ এবং বিদর্ভ : রাও বাহাদুর এন. আর. চন্দ্রভারকর, শ্রম মহাধ্যক্ষ, মধ্য প্রদেশসমূহ এবং বিদর্ভ ; শ্রী এফ. আর. ব্রিসলি, আই. সি. এস., শ্রম-মহাধ্যক্ষ, মাদ্রাজ (উপদেষ্টা)।

পঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ : শ্রী এ. পি. লে মেসুরিয়র, আই. সি. এস., শ্রম-মহাধ্যক্ষ, সিন্ধু ; আমিনুদ্দীন, আই. সি. এস., সচিব, বিদ্যুৎ এবং শিল্প দফতর, পঞ্জাব (উপদেষ্টা)।

বিহার, অসম এবং উড়িশা : শ্রী এস. এন. মজুমদার, আই. সি. এস., শ্রম মহাধ্যক্ষ, বিহার, শ্রী এ. এস. রামচন্দ্রন পিল্লাই, শ্রম-মহাধ্যক্ষ, অসম (উপদেষ্টা), শ্রী এস. সলোমন, আই. সি. এস. শিল্প অধিকর্তা এবং মুখ্য কারখানা পরিদর্শক উড়িশা (উপদেষ্টা)।

রাজন্য প্রতিনিধি : মকবুল মেহমুদ, সচিব, রাজন্যসভা।

হায়দ্রাবাদ, মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুর, বরোদা, গোয়ালিয়র এবং হোলকার রাজ্যের প্রতিনিধি সমূহ : মাহ্‌দি আলি মির্জা, শ্রম-মহাধ্যক্ষ, হায়দ্রাবাদ ; কর্ণেল সরদার এম. এন. লিটোলি, শিল্প, বাণিজ্য এবং যোগাযোগ মন্ত্রী, গোয়ালিয়র; শ্রী বি. জি. এ. মুদালিয়র, শ্রম-মহাধ্যক্ষ, মহিশূর (উপদেষ্টা) ; শ্রী ঈ. আই. চাকো, শিল্প অধিকর্তা এবং শ্রম-মহাধ্যক্ষ, ত্রিবাঙ্কুর (উপদেষ্টা) ; শ্রী কে. আর. ধোতিওয়ালা, শিল্প এবং শ্রম-অধিকর্তা, বরোদা (উপদেষ্টা) ; ক্যাপ্টেন এইচ. সি. ঢাণ্ডা, বাণিজ্য মন্ত্রী, হোলকার রাজ্য (উপদেষ্টা)।

সর্বভারতীয় শিল্পপতি (শিল্পমালিক সংঘের থেকে) : স্যার রহিমতুলা এম. চিনয়, বোম্বাই; শ্রী কস্তুরভাই লালভাই, আহমেদাবাদ ; শ্রী ডি. জি. মূলহারকার, দিল্লি (উপদেষ্টা)।

ভারতীয় মালিক সঙ্ঘ : স্যার ভি. এন. চন্দ্রভারকর, বোম্বাই ; শ্রী কে ডব্লু মীলিং, কলকাতা ; শ্রী এ. এইচ. বিশপ (উপদেষ্টা)।

অন্যান্য মালিকপক্ষের প্রতিনিধি : দেওয়ান বাহাদুর সি. এস. রত্নসভাপতি মুদালিয়র, সি. বি. ঈ., কোয়োম্বাটোর।

সর্বভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস : শ্রী এন. এম. যোশি, বোম্বাই ; ফজল ইলাহি কুরবান, লাহোর ; শ্রী বি. কে. মুখার্জি, লখনউ (উপদেষ্টা); শ্রী পি. আর. কে. শর্মা, মাদ্রাজ (উপদেষ্টা)।

ভারতীয় শ্রমিকসংঘ : শ্রী এস. গুরুস্বামী, মাদ্রাজ ; শ্রী এস. সি. মিত্র, কানপুর ; এম. এ. খান, লাহোর (উপদেষ্টা)।

অন্যান্য শ্রমিকপক্ষে প্রতিনিধি : শ্রী আর. আর. ভোলে, বিধায়ক, (বোম্বাই) পুনা।

□ □ □

১৫

*ভারতীয় বয়লার সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত) স্যার, আমি প্রস্তাব পেশ করছি :

"বর্তমান বিধেয়ক ১৯২৩ সালের বয়লার আইনের একটি সংশোধনী"

এই প্রস্তাবে যে ব্যবস্থার কথা বলা আছে তা খুব-ই সাধারণ ব্যবস্থা। আশা করি এই, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কোনও বিতর্কের অবকাশ নেই। এই বিধেয়কে যা যা সংস্থান রাখা হয়েছ সেটি বিস্তৃতভাবে বলার থেকে বরং কি কারণে এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটি বলা যাক।

১৯৪২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইয়ের একটি কারখানায় বয়লার ফেটে গিয়ে ভয়ঙ্কর প্রাণহানি ঘটে। বোম্বাই সরকার দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করে। তদন্তে বেরিয়ে আসে যে কারখানায় একটি যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটে। যে যন্ত্রে বিস্ফোরণ ঘটে সেটির নাম "ইকনমাইজার"। তদন্তে আরও প্রকাশ, এই 'ইকনমাইজার' হল একটি টিউব বা নল, যে নলটিকে আমি যতদূর জানি "ফীড পাইপ" গণ্ডগোলে প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন ধরে অন্তস্থল ক্ষয়ে এই নল দুর্বল হয়ে পড়ে। তদন্তে আরও একটি আশ্চর্য তথ্য সরকারের গোচরে এল। ১৯২৩ সালের ভারতীয় বয়লার আইন অনুযায়ী এক বয়লার পরিদর্শক নিয়মিত বয়লার পরীক্ষা করবে এবং শংসাপত্র দেবে যে, বয়লারটি কাজের উপযুক্ত কিনা। এক্ষেত্রে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছেস বয়লার পরিদর্শক পরীক্ষা করে শংসাপত্র দিল কি করে। তখন ঐ আইন ঘেঁটে দেখা গেল, আইনের পরিচ্ছদ অনুযায়ী বয়লারের "ফীড পাইপ" বা অন্য কোনও সহায়ক অংশের পরীক্ষা করা বয়লার পরিদর্শকের

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), তৃতীয় খণ্ড, ২৯ জুলাই ; ১৯৪৩। পৃ: ১৭৬-৭৭

কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এই কারণেই "ফীড পাইপ" পরীক্ষা করা হয়নি। আইনের এই ফাঁক বা ত্রুটি মেরামতির জন্যই এই প্রস্তাবিত সংশোধনী।

বর্তমান বিধেয়ক দুটি সংশোধনী আনছে। প্রথম, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে একটি নতুন ধারার সংযুক্তি। এটিতে থাকবে "ফীড পাইপ"-এর সংজ্ঞা। দ্বিতীয় "স্টীম পাইপ" নামে যে অংশটি আছে। তার ক্ষেত্র বাড়ানো। চালু আইনে আছে "স্টীম পাইপ" মানে মূল পাইপ। সংশোধনী বলছে "স্টীম পাইপ" এর ক্ষেত্র বাড়িয়ে "ফীড পাইপ" কে তার মধ্যে ধরা হবে। সংশোধনী গৃহীত হলে ২৮ নম্বর পরিচ্ছদের প্রবিধান পরিবর্তন সাপেক্ষে বয়লার পরিদর্শককে শুধু "স্টীম পাইপ" নয় "ফীড পাইপ"ও পরীক্ষা করতে বাধ্য করা যাবে। আমি এই কারণে বর্তমান বিধেয়কটি বিবেচনার জন্য পেশ করলাম।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে।

"যে ১৯২৩ সালের ভারতীয় বয়লার আইনের সংশোধনী বিবেচনার জন্য গৃহীত হল।"

শ্রী সি. সি. মিলার (ইউরোপীয় প্রতিনিধি, বাংলা) : একটি ছোট্ট কথা। মাননীয় সদস্যের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইছি। "ফীড পাইপ" বয়লারের একটি সংযুক্ত অংশ। এটি তো বয়লারের প্রধান অঙ্গগুলির একটি নয়। সেক্ষেত্রে কারখানা মালিক যদি তাকে এই কথা দেন যে, "ফীড পাইপ"টি পাল্টে দেবে তবে বয়লার পরিদর্শক তাকে কাজের উপযুক্ত বয়লারের শংসাপত্র দিতেই পারেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার বন্ধু বুঝতেই পারছেন যে, এ ব্যাপারে আমার পক্ষে নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। তবে তাঁর ধারণারও মূল্য আছে।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হচ্ছে "যে **১৯২৩** সালের বয়লার আইনের সংশোধনীর বিবেচনা"

প্রস্তাব গৃহীত।

২ এবং ৩ নম্বর খণ্ড বিধেয়কে সংযোজিত।

১ নম্বর খণ্ড বিধেয়কে সংযোজিত।

বিধেয়কে নামকরণ এবং প্রস্তাবনা যোগ করে দেওয়া হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বিধেয়কটি পাশ করতে প্রস্তাব দিচ্ছি।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : এখন প্রশ্ন "যে বিধেয়কটি গ্রহণ করা হোক।"

প্রস্তাব গৃহীত।

১৬

*যন্ত্রযান (চালক) সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম-দফতরের ভারপ্রাপ্ত) : স্যার আমার প্রস্তাব এই :

"যে ১৯৪২ সালের যন্ত্রযান (চালক) অধ্যাদেশের সংশোধনী হিসাবে এই বিধেয়ক বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক।"

এই ব্যবস্থা খুব সাধারণ একটি ব্যবস্থা। সভার স্মরণে থাকতে পারে যে সরকার বিভিন্ন অধ্যাদেশের মাধ্যমে বহু ব্যক্তির সেবা গ্রহণ করেছে।

একজন মাননীয় সদস্য : মোট কতগুলি অধ্যাদেশ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দুঃখিত, আমার কাছে তেমন সঠিক তথ্যের অভাব আছে। তবু সাধারণ তথ্য তো সবার কাছেই আছে। যন্ত্রযান চালক অধ্যাদেশের [Motor Drivers Ordinance] আলোচনা যদি আমরা করি তবে আমরা দেখতে পাব যে, অধ্যাদেশ বলে চালকদের সরকারি কাজে ডেকে নেওয়া যাবে। কিন্তু এই অধ্যাদেশে একটি সংস্থান নেই, যেটি অন্য অধ্যাদেশে আছে। সংস্থানের ঘাটতি কি রকম? না আলোচ্য অধ্যাদেশে এমন কোনও ধারা নেই, যার ফলে সেই সব গাড়ির মালিকদের বাধ্য করা যেতে পারে যাদের চালকদের কৃত্যকে লাগানো হয়েছে। কি ব্যাপারে বাধ্য করা হবে? না, সরকারি কাজ শেষ হয়ে গেলেই তুলে নেওয়া এইসব চালকদের যেন মালিকেরা ফের তাদের নিজের কাজে নিয়োজিত করে। সংশোধনী সেই কারণেই। এর তিনটি দিক। এক, সরকারি কাজে যে সমস্ত চালকদের সেবার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সরকারি কাজের শেষে তাদের সেবার প্রয়োজন তাদের মালিকদের কাছে ফুরিয়ে না যায়। অর্থাৎ সংশোধনীর সংস্থান। গাড়ির মালিকদের ওপর বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি, সরকারি কাজ শেষ হয়ে গেলে গাড়ির মালিককে তার ফিরে আসা চালককে পুনর্বহাল করা। দুই, মালিকের দায়বদ্ধতা নিয়ে বিবাদের মীমাংসা, এবং

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) তৃতীয় খণ্ড, ২৯ জুলাই, ১৯৪৩। পৃ: ১৭৮

এ ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের হাতেও ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে। তিন, দায়বদ্ধতা অস্বীকার করলে মালিকের জরিমানা। সংশোধনীতে অন্য যে ব্যাপার নিয়ে ভাবা হয়েছে তা হল চালকের নিয়োগও অধিকারের সীমাবদ্ধতা। এতে বলা হচ্ছে চালক পুনর্নিয়োগের দাবি জানানোর আগে তার টানা ৬ মাস কাজ করা চাই। আর জাতীয় সেবা শেষ হয়ে যাবার দু মাসের মধ্যেই চালককে পুনর্বহালের আবেদন করতে হবে। এ সমস্ত আলোচিত শর্ত পূরণের মধ্যেই চালকের মর্যাদা অন্য শ্রমিকের মর্যাদার সমান হবে দেশের কাজে যাদের সেবার প্রয়োজন লাগে। আমি বাড়তি আর কিছু বলব না।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : তাহলে

"১৯৪২ সালে যন্ত্রযান (চালক) অধ্যাদেশের [Motor Vihecls (Drivers) Ordinance, 1942] সংশোধনী বিবেচনার জন্য গৃহীত হল"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

* * *

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : খণ্ড ২

***স্যার কাবসজি জাহাঙ্গীর** (বোম্বাই নগর : মুসলমান শহরাঞ্চলের প্রতিনিধি): আমার কাছে যতটুকু পরিষ্কার হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এই বিধেয়কের ২নং খণ্ডটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেখতে পাচ্ছি, এমন সংস্থান যাতে চালকদের যুদ্ধকালীন সরকারি সেবা শেষ হয়ে গেলে সে আবার নতুন করে তার আদত মালিকের অধীনে কাজ পাবে। শর্ত দুটি এক। আদত মালিকের অধীনে তার কাজ ৬ মাস হওয়া চাই আর পুনর্বহালের জন্য তার আবেদন সরকারি কাজ শেষ হয়ে যাবার দু মাসের মধ্যে করতে হবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মান্যবর বন্ধু স্যার কাবসজি জাহাঙ্গীরের পর্যবেক্ষণে যে রঙ বেরিয়ে এল, তা বড় কালো। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন ব্যাপারটি যখন সভায় বিতর্কের বিষয় হিসাবে উঠেছে, তখন বিতর্কে সেই রঙ দিতে হবে যে রঙে উকিলেরা কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে নামে। কিন্তু আমার নিবেদন এই যে, বিতর্কের দৈর্ঘ্য যে কোনও শর্টকোটের থেকেও কম। কারণ বিষয়টি খুব সোজা। আর প্রাদেশিক সরকারগুলির এ ব্যাপারে যে

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) তৃতীয় খণ্ড, ২৯ জুলাই, ১৯৪৩ পৃ: ১৭৯-৮০

প্রাধিকার দেওয়া আছে, সেই প্রাধিকার প্রয়োগে কোনও দিক থেকেই কোনও অসন্তুষ্টির কারণ নেই।

স্যার কাবসজি জাহাঙ্গীর : সেটা কি করে সম্ভব?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের পক্ষে সেরা কাজটি করবে বলে আমরা আস্থা রাখতে পারি।

স্যার কাবসজি জাহাঙ্গীর : মাননীয় সদস্য কি জানেন না, যখন এই ধরণের ক্ষমতা অর্পণ হয় তখন তার প্রয়োগে তা সে যত সহজ বিষয়েই হোক সেটি নিয়ামন আর নিয়মের জঙ্গলে হারিয়ে যায়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তাড়াতাড়ি মীমাংসা করা যাবে না, এমন কোনও বাধা এর মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয়না। অতএব আমাকে আমার জায়গা থেকে সরে আসতে হবে এমন কোনও অবস্থাও নেই। সমস্যা যদি ওঠেও, তা খুব সামান্যই হবে এবং সে সমস্যা তাড়াতাড়ি মেটানোও যাবে।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আব্দুর রহিম) : তাহলে

"দু নম্বর খণ্ড বিধেয়কের অংশ বলে গণ্য হল"।

খণ্ড দুই বিধেয়কে যুক্ত হল।

খণ্ড তিন বিধেয়কে যুক্ত হল।

খণ্ড এক বিধেয়কে যুক্ত হল।

বিধেয়কের নামকরণ হল এবং

বিধেয়কে মুখবন্ধ তৈরি হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি প্রস্তাব দিচ্ছি, বিধেয়কটি পাশ করা হোক।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : তাহলে

"বিধেয়কটি গৃহীত হল"

প্রস্তাব গৃহীত

□ □ □

১৭

*খনিতে নিয়োজিত মহিলাদের প্রসূতিকালীন সুবিধা (সংশোধনী) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম দফতরের ভারপ্রাপ্ত) : স্যার আমি প্রস্তাব দিচ্ছি

“যে ১৯৪১ সালের খনিতে কর্মরতদের প্রসূতিকালীন সুবিধা [Mines Maternity Benefit Act, 1941] সংশোধিত হোক এবং আমার সংশোধিত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক।”

এই প্রস্তাবনার পূর্বে এর প্রেক্ষাপট বিধৃত করা জরুরি। খনিতে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের প্রসূতি সুবিধা আইন অনুযায়ী একজন নারীশ্রমিক প্রসূতি হলে সে আট সপ্তাহের ছুটি পাবে। এই আট সপ্তাহে কর্তৃপক্ষ তাকে দৈনিক আট আনা করে দেবে। এই আট সপ্তাহ দুভাগে ভাগ করা। প্রথম চার সপ্তাহ প্রসবের আগে এবং বাকি চার প্রসবে পরে। এর মধ্যে প্রথম চার সপ্তাহের ছুটি ঐচ্ছিক — চাইলে নারীশ্রমিক ছুটি না নিয়ে কাজ করতে পারে এবং পুরো বেতন আয় করতে পারে। কিন্তু প্রসবের পরের চার সপ্তাহের ছুটিটি সম্পূর্ণ বাধ্যতামূলক। বস্তুতপক্ষে সেটি না হওয়াটাই হবে বেআইনি, অপরাধ। মাননীয় সদস্যরা, আপনারা এই বর্তমান আইনটির পাঁচ নম্বর পরিচ্ছদটি যেখানে প্রসূতি অবস্থায় অর্থের সংস্থানের কথা লেখা আছে, সেটি পড়ে দেখুন; সেই পরিচ্ছদের নয় নম্বর লাইনে আছে “কাজ থেকে অনুপস্থিত”। এখন এই শব্দরাজি “কাজ থেকে অনুপস্থিত” বা আরও নির্দিষ্ট করে “কাজ থেকে’ শব্দরাজি অনিশ্চিতভাবে দ্ব্যর্থক। কেন দ্ব্যর্থক সেই কথাই এবার বলব।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) তৃতীয় খণ্ড, ২৯ জুলাই, ১৯৪৩। পৃ: ১৮০

ধরুন, কোনও একটি বিশেষ দিনে খনি-মালিক তার খনি বন্ধ রাখল। তাহলে কি প্রসূতি শ্রমিক তার প্রসূতি পাওনা পাবে? এই শব্দরাজি বলছে পাবে না। কারণ খনি বন্ধে কাজ নেই। আর শব্দরাজি বলছে "কাজ থেকে অনুপস্থিত"। অর্থাৎ কাজ যখন নেই তখন "কাজ থেকে" অনুপস্থিতির প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে "কাজ থেকে" শব্দরাজি দ্ব্যর্থক। আমি বিভিন্ন প্রদেশের গৃহীত পাঁচটি "প্রসূতি সুবিধা আইন"-এর সঙ্গে এই পাঁচ নম্বর পরিচ্ছদটির তুলনা করে দেখেছি যে, "কাজ হইতে" শব্দরাজি কোথাও নেই। ফলত এই শব্দরাজি দূর করে দ্ব্যর্থ ঘোচানো দরকার। এই সংশোধনীর দ্বিমাত্রিক হবে। প্রথম, পরিচ্ছদের পাঁচ থেকে দ্ব্যর্থক ঐ শব্দরাজি মুছে সেই জায়গায় লেখা হবে, প্রসবের আগের চার সপ্তাহের প্রত্যেক দিন প্রসূতিকে তার দেয় দিতেই হবে। দ্বিতীয়, প্রসবের আগের চার সপ্তাহে প্রসূতি শ্রমিক যে দিন চাইবে সেদিন কাজ করতে পারবে এবং পুরো রোজগার করবে এই ঐচ্ছিক প্রসূতি বিশ্রামের বন্দোবস্ত আমাদের সংযোজিত অনুবিধি—কাজে নামলে প্রসূতি কোনও সুবিধা পাবে না। আমার সামগ্রিক বক্তব্য প্রস্তাবকারে পেশ করলাম।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : তাহলে

"১৯৪১ সালের খনিতে কর্মরতা প্রসূতিকালীন সুবিধা আইন বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক"।

প্রস্তাব গৃহীত হল।

খণ্ড ২ বিধেয়কে সংযুক্ত হল।

খণ্ড ১ বিধেয়কে সংযুক্ত হল।

বিধেয়কে মুখবন্ধ সংযুক্ত হল।

বিধেয়কের নামকরণ সংযুক্ত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার প্রস্তাব বিধেয়কটি গ্রহণ করা হোক।

অধ্যক্ষ (মাননীয় স্যার আব্‌দুর রহিম) : প্রস্তাব পেশ।

"বিধেয়কটি গৃহীত হল"।

□ □ □

১৮

যুদ্ধে আহতদের ক্ষতিপূরণ বিমা বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি এই মর্মে পেশ করছি ঃ

"যুদ্ধে আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এবং এই বাবদ দায়ের জন্য বিমা করার জন্য মালিকদের ওপর দায়িত্ব অর্পণের জন্য যে বিধেয়কের কথা প্রবর সমিতিতে বলা হয়েছে, তা বিবেচনা করতে হবে।"

যে-সব নীতির কথা এই বিধেয়কে রয়েছে, এই সভায় পেশ করার সময়েই আমি তা ব্যাখ্যা করেছিলাম। সুতরাং আবার সে-সব নীতি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন দেখছি না। মূল বিধেয়কে যেসব নীতি পরিবর্তনের কথা প্রবর সমিতি বলেছে সে-সব বিষয়েই আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এই সভা নিশ্চয়-ই লক্ষ্য করে থাকবেন, প্রবর সমিতি যেসব পরিবর্তনের কথা বলেছেন, তার মধ্যে মাত্র চারটি বিষয়-ই নীতি সংক্রান্ত। প্রথমতঃ শ্রমিক কর্মচারীদের আরও কয়টি শ্রেণীকে এই বিধেয়কের আওতায় আনা হয়েছে। চা বাগানে নিযুক্ত শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পরিবর্তন হল, বিমা তহবিলে প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়া সম্পর্কে। মূল খসরায় শ্রমিকদের মজুরির প্রতি ১০০ টাকা পিছু আট আনা মালিকদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। প্রবর সমিতি আট আনাকে কমিয়ে চার আনা করেছেন। তৃতীয় পরিবর্তন, বিমা তহবিলে খরচ না হওয়া টাকা কীভাবে ব্যবহার করা হবে, সেই বিষয়ে। খসড়ায় মূল প্রস্তাবে ছিল, তহবিলের অব্যয়িত টাকা সাধারণ রাজস্বখাতে দিয়ে দেওয়া হবে এবং তা সরকারের সাধারণ খাতে ব্যয় করা হবে। প্রবর সমিতি এটা পরিবর্তন করে উদ্বৃত্ত টাকা মালিকদের দেয় অংশের অনুপাত অনুযায়ী তাদের ফেরত দেওয়ার জন্য বলেছেন। চতুর্থ পরিবর্তনটা ঠিকা মজুরি সংক্রান্ত। এখন বলা হয়েছে, মালিক তার

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খন্ড-২, ১৩ অগস্ট ১৯৪৩। পৃ: ৭০১

কাজ সম্পূর্ণ করতে কোনও কন্ট্রাকটর নিয়োগ করলে এবং সেই কন্ট্রাকটর শ্রমিক নিয়োগ করলে, ক্ষতিপূরণের টাকা মেটাবার দায়িত্ব বর্তাবে মালিকের ওপর।

প্রবর সমিতি যেসব পরিবর্তন করেছেন, তার মূল নীতি হচ্ছে এগুলি। সভা লক্ষ্য করলে দেখবে, বিধেয়কের আলোচ্যসূচিতে অনেক সংশোধনের কথা রয়েছে। কিছু সংশোধন আছে পদ্ধতি সংক্রান্ত এবং মূলত প্রবর সমিতি থেকে আমার এই বিধেয়কের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা হচ্ছে তার মোকাবিলার জন্য সরকার সেগুলি উত্থাপন করেছে, আমি আশা করি এইসব সংশোধনের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিতর্ক হবে না।

মহাশয়, আমার মনে হয় এই বিধেয়কের ওপর আর কিছু বলার নেই। আমি এটা পেশ করছি।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) ঃ প্রস্তাব উত্থাপিত হল।

"যুদ্ধে আহত শ্রমিকদের আঘাতের দরুন ক্ষতিপূরণ এবং এর জন্য শ্রমিকদের বিমার টাকা মালিকদের ঘাড়ে চাপাবার জন্য প্রবর সমিতি যে কথা বলেছে বিধেয়কে তা বিবেচনা করা হয়েছে।"

* * * * *

***মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :** স্যার, বিতর্কে যোগদানকারী মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতায় এমন কিছু নেই, যার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। যে সব প্রশ্ন উঠেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে দেখছি যে, কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে যা বিধেয়কটি উত্থাপনের সময়েই শুধু প্রাসঙ্গিক ছিল। আমার মনে আছে, যেগুলি তোলা হয়েছিল এবং এটাও আমার স্মরণ আছে তার যথাযথ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা আমি করেছিলাম। সুতরাং এ বিষয়ে আবার আলোচনায় সময় নষ্ট করতে চাই না।

বিধেয়কের বিশেষ কয়টি ধারা ও আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত সংশোধনগুলির প্রশ্নে আমার বক্তব্য, সময়ের অপচয় রোধের খাতিরে এই পর্যায়ে আমার বক্তৃতায় সে সব বিষয়ে উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সংধোধনগুলি উত্থাপনের সময়ে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা শ্রেয় ও সঙ্গত হত বলে মনে করি।

* * * * *

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৩ অগস্ট ১৯৪৩। পৃ: ৭০৮

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : সংশোধন পেশ হল ঃ

"বিধেয়কের খণ্ড ৬ নিম্নোক্তভাবে সংশোধিত হবে ঃ-

'৬. শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন ১৯২৩ যেসব শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাদের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ হবে।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয় আমাকে হয়ত এই সংশোধনীর বিরোধিতা করতে হবে। আশা করি, মাননীয় বন্ধুবর শ্রী যোশি বুঝবেন যে, আমার এই বিরোধিতা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতির অভাবজনতি নয়।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি তা বলি নি!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার ধারণা, আমার বন্ধু শ্রী যোশি বুঝবেন যে, এই সংশোধনী গৃহীত হলে বাস্তবে বিধেয়কে উপকৃত শ্রমিকদের সংখ্যার ওপর একটা সীমাবদ্ধতা আরোপ হচ্ছে। প্রথমত: শ্রী যোশি যেমন বলছেন, এক্ষেত্রে আমাদের একটু সতর্কভাবে এগোতে হবে, কারণ তাঁর আইনে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, সংগঠিত মালিকদের ওপর এই দায় পড়বে। এটা বিমার টাকা সংগ্রহের প্রশ্ন, এবং যেসব মানুষ রাস্তায় তাদের কাছ থেকে এই সংগ্রহ সম্ভব নয়। এই দায়িত্ব বিধিবদ্ধ করতে হলে একটা সংগঠন চাই, কাজেই এই বিধেয়কে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে শ্রমিকদের সংখ্যা নির্ধারণে খুব সতর্ক হয়ে চলতে হবে। দ্বিতীয় যে অসুবিধা আমার মনে হয়, সত্যি কথা বলতে কি শ্রী যোশির সংশোধনী গৃহীত হলে, বর্তমান বিধেয়কে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংখ্যার তুলনায় এই সংখ্যা খুব একটা বাড়বে না। আমি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act) খুব গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি। নয়টি বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসে। আমাদের এই আইনে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকের তুলনা করলে একটি মাত্র পার্থক্য চোখে পড়ে। শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে গৃহনির্মাণ ও সাধারণ নির্মাণ কাজের শ্রমিকদের ওপর প্রযোজ্য। এই একমাত্র শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বর্তমান বিধেয়ক প্রযোজ্য নয়। এছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে দুটি বিধেয়ক এক-ই। আর একটা পার্থক্য আছে। বর্তমান শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন প্রয়োগ করলে দেখব শ্রমিকদের সংজ্ঞার প্রশ্ন উঠতে, এই আইনে সংজ্ঞা দেওয়া আছে। আমার মাননীয় বন্ধু শ্রী যোশি জানেন যে, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনে শ্রমিকের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও সীমিত। শ্রমিকদের বিন্যস্ত করার ক্ষেত্রে ঠিকা শ্রমিকদের গণ্য করা হয় নি, আর বিশেষ কোনও শিল্পে কত সংখ্যক ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত আছে তা কেউ জানে না। বন্ধু শ্রী যোশি আরও

জানেন, শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের আওতায় করণিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমাদের বিধেয়কে ঠিকা শ্রমিক করণিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমার মনে হয় শ্রী যোশি এ বিষয়ে সহমত হবেন—যদিও পর্যালোচনা করে দেখা যাবে কিছু শ্রেণীর শ্রমিক এর আওতা থেকে বাদ পড়েছে। শ্রমিকদের সংজ্ঞা আরও বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে এই বিলে। আশা করি এই আশ্বাস দেওয়ার পর আমার বন্ধু সংশোধনী প্রত্যাহার করে নেবেন।

* * * * *

* **সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুর রহিম)** : প্রশ্ন হচ্ছে :

"বিধেয়কের খণ্ড ৬ নিম্নোক্ত ভাবে সংশোধিত হবে :

'৬. এই আইন 'শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন'-এর আওতায় আসা সব শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।"

উত্থাপিত এই প্রস্তাব বাতিল হয়

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার পরবর্তী ৫ নম্বর সংশোধন ৩নং খণ্ডের ওপর নির্ভরশীল, সভা এটার পক্ষে সম্মতি দিয়েছে।

সভাপতি : (মাননীয় স্যার আবদুল রহিম) : এটা কি অন্য সংশোধনের বিকল্প? তাহলে কি বুঝব এই সংশোধন গৃহীত হলে ৩ খণ্ডের ৩নং সংশোধনী অপ্রয়োজনীয় হয়ে যাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না স্যার, এটা দরকার, দুটোই প্রয়োজনীয়।

সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুল রহিম) : সেক্ষেত্রে আমি বুঝছি না, আপনি কেন এই সংশোধনী এখন পেশ করছেন না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এখন ৫ নম্বর সংশোধনী পেশ করব। স্যার, এই পেশ করছি :

"বিধেয়কের খণ্ড ৬-এর উপখণ্ড ২ বাদ দেওয়া হোক।"

এই সংশোধনের পক্ষে বেশি ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। সভা হয়ত মনে করতে পারবে, বর্তমান ধারা থাকায় বিধেয়কটি থেকে সরকারি কর্মচারীরা ও রেল-এর কর্মচারীরা বাদ ছিল। এই বিধেয়কের প্রথম খসড়া পেশ করার সময়ে আমি সভায়

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১৩ অগাস্ট ১৯৪৩। পৃ: ৭১৯

বলেছিলাম, যদিও এই শ্রেণীর কর্মচারীরা বিধেয়কের আওতায় নেই, তবু সরকার তার কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নানা ব্যবস্থা করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার বক্তৃতায় সভার অনেক সদস্যই আশ্বস্ত হন নি, এবং তারা জোর দিয়ে বলেছিলেন, প্রশাসনিক ভাবে দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে বরং বিধি বলে দায়িত্ব নির্ধারিত করে দেওয়া হোক। স্যার, আমি এই সুপারিশ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি, এবং পরবর্তী পর্যায়ে আমার নামে পেশ করা খণ্ড ৩ সংশোধন পেশের সময়ে এটা করব। স্যার, আমি পেশ করছি :

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : সংশোধন পেশ হল।

"খণ্ড ৬-এর উপখণ্ড ২ বাদ যাবে।"

* * * * *

* **সভাপতি** (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হচ্ছে :

"খণ্ড ৬ সংশোধিত আকারে বিধেয়কের অংশ হয়ে থাকবে।"

প্রস্তাব গৃহীত হল

সংশোধিত আকারে খণ্ড ৬ বিধেয়কে সংযোজিত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি পেশ করছি :

"বিধেয়কের খণ্ড ৭-এর ৫ উপখণ্ড (ছ) অংশটি নিম্নোক্তভাবে সংযোজিত হবে :

"আরও নির্ধারিত হল যে, প্রথম পর্বের পর যে কোনও পর্বে টাকার পরিমাণ অগ্রিম ফিরিয়ে দেওয়ার পর তহবিলের টাকা বৃদ্ধির হিসাব থেকে বেশি হবে না, যদি হয়, ১১ ধারার ২ উপধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ১৫ লক্ষ টাকা অবধি দিলে তা হবে।"

মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী কিছু সদস্যের আকাঙ্খা নিরসনেই এই ব্যবস্থা। তাদের আশঙ্কা যে, আমরা এই ধারা আগে যেভাবে ছিল তা ব্যবহার করব, তহবিল-এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও তা গড়ে তোলার জন্য এটা ছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এটা করা তার দরকার ছিল না। আমি সভার কাছে আগেই আশ্বাস দিয়েছি যে, অপ্রয়োজনীয় তহবিল গড়ার উদ্দেশ্যে এই বিলের যে ক্ষমতা তার প্রয়োগে সরকার ইচ্ছুক নয়, এভাবে কর্মচারীদের স্বার্থহানি করার প্রশ্ন নেই। এক্ষেত্রেও আমার বক্তব্য

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১৩ অগাস্ট, ১৯৪৩। পৃ: ৭১৩

তাদের আশ্বস্ত করতে পারে নি, এবং তাদের খুশি করার জন্যই আমি এই ধারা যুক্ত করছি। পরে দেখাই যাবে, তহবিলে গচ্ছিত হিসাবে ১৫ লক্ষ টাকার সীমা করে দেওয়া হয়েছে, এবং আমার ধারণা এই সংশোধনের লক্ষ্য বিচার করে তা গৃহীত হবে। এর লক্ষ্য, যারা সরকারের কর ধার্য করার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত তাদের শান্ত করা।

* **সভাপতি** (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : সংশোধন পেশ হল :

"বিধেয়কের খণ্ড ৯ উপখণ্ড ২-এর চতুর্থ লাইনে 'শাস্তিযোগ্য' শব্দের আগে 'বেতন দেওয়ার ধার্য দিনের পর ৩০ দিন-এর বাড়তি মেয়াদ-এর পর' এই শব্দযুক্ত হবে।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহাশয়, আমি এই সংশোধনের বিরোধিতা করছি। আমার মাননীয় বন্ধু যে প্রশ্ন তুলতে চাইছেন, তার জন্য এই সংশোধনের প্রয়োজনীতা নেই। আগেই আমি সভায় বলেছি, আগাম নোটিশের বিধি থাকছে ১৫ দিনের সময় সীমায়, আমি বুঝছি না প্রাজ্ঞ বন্ধু কেন আবার অবাধ্য মালিকের জন্য আরও সময় দিয়ে তাদের বাড়তি সুযোগ দিতে চাইছেন। আমাদের এই পরিকল্পনায় নোটিশ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে এই ধরনের সময়ের জন্য দাবির যৌক্তিকতা বুঝতাম। আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু যদি আমায় বলার অনুমতি দেন তো বলি, আমি এর মধ্যে কোনও তারতম্য দেখছি না, অথবা নোটিশের সময়সীমা ও বাড়তি সময়ের মধ্যে পার্থক্য দেখি না।

শ্রী হুসেনভাই এ. লালজি : স্যার মাননীয় বন্ধু আবদুর রশিদ চৌধুরি যে অনুরোধ করেছেন তা ন্যায্য বলে আমি মনে করি............সবকিছু বলার পর দেখা যাবে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা করার ব্যাপার থাকে এবং আমরা যেহেতু বহুলোককে যুক্ত করতে চাইছি, সেজন্য আমার মনে হয়, ১৫ দিনের নোটিশ ও ১৫ দিনের বাড়তি সময় দিলে খুব একটা হের-ফের হবে না। আমি নোটিশ-এর চেয়ে 'বাড়তি' শব্দটা পছন্দ করছি মোট ৩০ দিনের, এর পরিষ্কার কারণ হচ্ছে, ১৫ দিনের বাড়তি সময়টা সরকার-ই তাদের ইচ্ছেমতো মঞ্জুর করবে। সুতরাং আমার ধারণা, ন্যায় বিচার সম্মতভাবেই সেই বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ঠিক নয় যিনি বিশ্বাস করেন যে আমরা ভারতীয়রা বিশ্বের অন্য লোকদের চেয়ে অসৎ।

* * * * *

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) খণ্ড-৩ ১৩ অগাস্ট, ১৯৪৩। পৃ: ৭১৩

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আমার পরিকল্পনায় এদের ১৫ দিনের বাড়তি সময় দিতে রাজি স্যার,

* * * * *

** **সভাপতি** (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হচ্ছে :

"বিধেয়কের ১১ খণ্ডের ১ উপখণ্ডে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা যুক্ত হবে :

'এই শর্তে যে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য সম্রাটের ব্যয় নির্বাহে তহবিল থেকে কোনও অর্থ দেওয়া হবে না।"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার আমি পেশ করছি :

"বিধেয়কের ১১ খণ্ডের ৩ উপখণ্ডে নিচের অংশ দিয়ে পরিবর্তিত হোক:

'(৩) তহবিল থেকে দেয় সব টাকা দেওয়ার পর যদি তহবিলে কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে তা দিয়ে অন্য এক তহবিল গড়া হবে, কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে এই তহবিল কাজে লাগাবে।"

আগেই আমি দেখিয়েছি, বিধেয়কটি উত্থাপনের সময়ে এটা ছিল যে, উদ্বৃত্ত টাকা সরকার সাধারণ কাজে ব্যবহার করবে এবং এটাকে সরকারের সাধারণ রাজস্বে যুক্ত করা হবে। প্রবর সমিতি' এই খণ্ড বদল করে বলে, যেসব মালিক এই তহবিলে টাকা দিয়েছে, দেয় পরিমাণ অনুযায়ী উদ্বৃত্তটা তাদের দিতে হবে। আমি যে সংশোধনী এনেছি তার উদ্দেশ্য, এই দুই অবস্থানের মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা। এতে সুপারিশ করা হয়েছে, এই তহবিল থেকে সরকারের সাধারণ কাজে ব্যয় অথবা মালিকদের ফেরত দেওয়া হবে না, এটাকে একটা অছির মতো রেখে টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে খরচ করুক। আমার ধারণা ছিল, এটা এক যুক্তিযুক্ত সমঝোতা প্রস্তাব এবং সভা এটা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করবে। কিন্তু এখন দেখছি সভার অনেকেই এই সংশোধনের ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। যেসব যুক্তিতে আমি এই সংশোধনের পক্ষপাতী তা হল, প্রথমতঃ এই। আমার ধারণা, এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, মালিকরা বিমা তহবিলে যে টাকাই দিন, অর্থ দফতর তা রাজস্ব হিসাবে গণ্য করবে এবং যে রাজস্বের নজ্য অর্থ দপ্তর ঋণ মঞ্জুর করবে। এটা প্রকৃতপক্ষে রাজস্বই। সাধারণ পরিস্থিতিতে এই রাজস্ব আয় কর ও বাড়তি লাভ

** বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) খণ্ড-৩, ১৩ আগস্ট, ১৯৪৩। পৃ: ৭১৪-১৫

কর হিসাবে ভারত সরকার পায়। সুতরাং একথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে, এই তহবিলের মোটা অংশ বাস্তবে যাদের টাকা, তাদের জন্যই ব্যবহার করা উচিত। এর বিরুদ্ধে তেমন কোনও বক্তব্য থাকতে পারে বলে মনে করি না। কিন্তু আগেই বলেছি, আমি সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছি এবং এই তহবিলের সাধারণ রাজস্ব হিসাবে ব্যবহার না করে শ্রমিকদের স্বার্থে ঋণ তহবিল হিসাবে কাজে লাগনো হোক। লবিতে একটা যুক্তি আমার কানে এল এবং অনেক সদস্যই তা মেনে নিয়েছেন এরা বর্তমান ব্যবস্থার পক্ষে সন্তুষ্ট নন। যুক্তিটা এই, তারা মনে করছেন এটা বৃহৎ পরিবর্তনের নিমিত্ত ক্ষুদ্র পরিবর্তনের দাবি। সরকার কার্যত: শ্রমিকদের কল্যাণার্থে শিল্পের ওপর লেভি চাপাবার সূচনা করছে। এই ধরনের আশঙ্কা যারা করছেন, সেইসব সদস্যে, ভ্রান্ত ধারণার নিরসন করতে চাইছি। এর আগেই আমি তাদের আশ্বস্ত করেছি যে, এই ধারার অপব্যবহার করে ভিন্ন স্বার্থবাহী তহবিলের জন্য শিল্পের ওপর বোঝা চাপাবার ইচ্ছা সরকারের নেই । আশঙ্কিত মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করতে বলি, সরকারের কোনও নজির সৃষ্টির গোপন চেষ্টা নেই। সরকারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে, এবং ইংলন্ড ও এই দেশের আইন অনেক নজির সৃষ্টি করেছে যার দ্বারা সরকার শ্রমিকদের স্বার্থে বিধেয়কে সেস আরোপ করতে পারে। আমাদের দেশেই কয়লা ও কোক কয়লার ওপর সেস রয়েছে, এটা শিল্পের ওপর একটা লেভি, শিল্পের স্বার্থে ও শিল্পের সাথে যুক্তদের জন্যই এটা ব্যবহৃত হয়। ইংলন্ডে কয়লা শিল্প আইন-এ ঐ শিল্পের ওপর একটা বিশেষ সেস আছে, এই উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তহবিল শ্রমিক কল্যাণেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বাস দিতে চাই যে, কোনও নজির প্রতিষ্ঠার জন্য গোপন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার ইচ্ছা সরকারের নেই। আমাদের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের সাহায্য করা, এবং আমি বুঝতে পারছি না যেসব মালিক শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনে নানা প্রকল্পের পক্ষে উৎসাহ দেখান, তারা আমার এই প্রস্তাবে সম্মতি দিতে অ-রাজি কেন! স্যার, আমি প্রস্তাব পেশ করছি।

* * * * *

***মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর** : স্যার, মাননীয় বন্ধু শ্রী চ্যাপম্যান মরটিমার যে প্রশ্ন তুলেছেন তা মনে হচ্ছে এই রকম। উনি বলছেন, আমরা উদ্দেশ্য থেকে সরে আসছি। প্রথমে তহবিল-এর লক্ষ্য ছিল ক্ষতিপূরণের কাজে লাগানো। এখন আমরা উদ্বৃত্ত টাকা কল্যাণকার্যে ব্যয় করতে চাইছি। নিঃসন্দেহে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন একটা হয়েছে, তবে এর মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। যদি ওর কথা ঠিক বুঝে থাকি,

** বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) খণ্ড-৩, ১৩ আগস্ট, ১৯৪৩। পৃ: ৭১৮

শ্রী মরটিমার অবস্থান হচ্ছে এই : তিনি যেটা অনুসরণ করছেন সেটা বাজেট বরাদ্দের একটা প্রতিষ্ঠিত নীতি, আইনসভা একটা বিশেষ কাজে অর্থ বরাদ্দ করলে তা সেই উদ্দেশ্যের বাইরে অন্য কাজে খরচ করা উচিত নয়। আমি পুরোপুরি এটা মানছি, কিন্তু সেটা এমন এক বিষয় যা শাসনকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত। শাসন পরিচালনাকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে তহবিল কাজে লাগাবার পক্ষপাতী আমি নই, কারণ এই সভায় এসে অশোভন হয়ে সভাকেও অশোভন হতে বলতে পারি না, যে সভা উদ্বৃত্ত টাকা অন্য কল্যাণকাজে বরাদ্দের অর্থ অন্য কাজে ব্যবহার করুক। সেজন্য আমি স্বীকার করছি যে উদ্দেশ্য পরিবর্তন কোনও অন্যায় নয়, এই পরিবর্তনের জন্য আমরা তো আইনসভার সম্মতি চাইছি। আরও প্রশ্ন তুলে বলা হচ্ছে, 'কল্যাণকর্ম' কথাটা ব্যাপক। আমি মানছি যে, এর অর্থ ব্যাপক। 'কল্যাণকর্ম'-এর মধ্যে কি কি কাজ অন্তর্ভুক্ত হবে তা নির্ধারিত করার অবস্থায় আছি, এমন কথা আমি বলতে পারব না। কিন্তু আমি সভার যেসব মাননীয় সদস্য 'কল্যাণকর্ম' এর অর্থ বুঝেন না এবং সেইসব সব মাননীয় সদস্য যারা মনে করেন এই তহবিল চালাবার দায়িত্ব সরকারের হাতে দেওয়া ঠিক নয়, সবাইকে বলতে চাই যে, পুরো বিষয়টিই এখন সভার হাতে রয়েছে। এই অর্থ কীভাবে কাজে লাগানো হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার বহু সুযোগ এই সভার হবে এবং আমি নিশ্চিত যেসব মাননীয় সদস্য কল্যাণকর্ম বিষয়ে জানেন তারা অর্থ ব্যবহারের সরকারকে অবগত করার সুযোগ পাবেন। স্যার, আমার ধারণা সভা আমার সংশোধন গ্রহণ করবেন।

* * * * *

* **সভাপতি** (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্নটা হল :

" বিধেয়কের খণ্ডের ৩ উপখণ্ড ১-এর যুক্ত হবে :

'কোনও মালিক এ ধারা ১ অংশ অনুযায়ী বিমা সংগ্রহ নীতি গ্রহণ করলে এবং প্রকল্পের শর্ত অনুসারে প্রিমিয়ামের সব বকেয়া টাকা দিলে অথবা তদ্দারা ১২ ধারার ২ অংশ অনুযায়ী বিমা করার মালিক বাধ্য না থাকলে, কেন্দ্রীয় সরকার মালিকের তরফে তার দেয় ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার দায়িত্ব নেবে।"

প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার আমি পেশ করছি :

"বিধেয়কের ৩ খণ্ডে নতুন এই নতুন উপখণ্ড যুক্ত হোক :

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়) খণ্ড-৩, ১৩ অগাস্ট, ১৯৪৩।পৃঃ ৭১৯

'৩) এই ধারা সম্রাটের ওপর আরোপিত হবে।"

আমি আগেই বলেছি, আমরা সম্রাটকে বিধিবদ্ধভাবে এই বিলের ধারাগুলির প্রতি দায়বদ্ধ করতে চাইছি। এই কথা বলে আমি শেষ করছি :

* * * * *

** **সভাপতি** (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : সংশোধন উত্থাপিত হল :

" বিলের ১৩ খণ্ডের ১ উপখণ্ড অংশ (খ) বাদ যাবে।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমার সংস্কৃতি হয়ত খুব বেশি নেই, কিন্তু গড়পড়তা বুদ্ধিমত্তা আমার আছে। সেই বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই ধারা সম্বন্ধে বলি, আমার মাননীয় বন্ধু এর উদ্দেশ্য ভুল বুঝেছেন, এর প্রয়োজনীয়তাও বুঝেন নি। এই বিধেয়কের উদ্দেশ্য লেভি চাপানো বা পরোয়ানা জারি নয়, এই খণ্ডের উদ্দেশ্য তথ্য সন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ। আমার বন্ধু বুঝছেন না, কেন সঠিক তথ্য সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ। তাকে আমি বলতে চাই, শুধু সরকারের দৃষ্টিতেই এর গুরুত্ব তা নয়, মালিকদের নিজেদের জন্যও এটা দরকার। কোনও প্রতারক মালিক ভুল তথ্য দাখিল, মজুরি বিল কম করে দেখানো, কর্মচারী সংখ্যা কম করে দেখাতে পারেন। দাখিল তথ্যের ভিত্তিতে বিমার কিস্তির টাকার পরিমাণ নির্ধারিত হবে। এটা সম্ভব যে সৎ মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, প্রতারক মালিকদের দোষে তাদের বেশি টাকা দিতে হবে, কারণ প্রতারকরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিজেদের বিধিবদ্ধ দায় এড়াতে চেষ্টা করবেন। সেজন্য মালিকদের স্বার্থেই এই ধারা প্রয়োজন। আমি বুঝছি না, আইন যেখানে বলছে, সন্দেহ হলে বা সরকার যদি জানতে পারে যে সঠিক তথ্য দেওয়া হয়নি, সেক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সরকারের ক্ষমতা থাকা উচিত, এর ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থা এতে আপত্তি কেন!

□ □ □

** বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১৩ অগাস্ট, ১৯৪৩। পৃঃ ৭২১

১৯

* শ্রমিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন

সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে ড. আম্বেদকর

৬ সেপ্টেম্বর সোমবার নতুনদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সাধারণ শ্রমিক সম্মেলনে মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর যে বক্তৃতা দেন, তার পূর্ণ বয়ান :

সাধারণ শ্রমিক সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। ১৩ মাস আগে গত বছর ৭ আগস্ট প্রাদেশিক সরকার, ভারতীয় রাজ্যসমূহ, মালিক ও কর্মচারীদের প্রতিনিধিদের ভারত সরকার আমন্ত্রণ জানায় এক ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক সম্মেলনে। এই সম্মেলনে আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ। বহুকাল যাবত একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, শিল্প-সমস্যা ও শ্রমিকদের কল্যাণসাধনের সমস্যা মিটবে না যতদিন না সরকার, মালিকপক্ষ, শ্রমিক পারস্পরিক দায়িত্ব আদান-প্রদানের মানসিকতা, পরস্পরের মতের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনে তৎপর হয়, এবং এতকাল এসব হওয়ার সুযোগ হয় নি, কারণ এরা পরস্পরের দিকে বক্তব্য ছুঁড়ে দিয়ে চলতে অভ্যস্ত। এই উদ্দেশ্যপূরণে এক টেবিলে একত্রে বসে আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়।

এই ধরনের ত্রিপাক্ষিক সংগঠন গড়ে তোলার ধারণাটা ছিল। তবে যুদ্ধের আগমন না হলে এটা হত কিনা সন্দেহ, কারণ যুদ্ধ কালে শ্রমিকের মনোভাব ঠিক রাখার জন্য এটা জরুরি হয়ে পড়ে। বাস্তবে যুদ্ধ এই ত্রিপাক্ষিক প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করেছে।

দুঃসাহসিক নীতি

যুদ্ধ পরিস্থিতির চাপে ভারত সরকারের ওপর চাপ বাড়তে থাকে শিল্প সমস্যা ও শ্রমিক কল্যাণের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য, এবং আমি আনন্দের সাথে বলছি, সরকার দুঃসাহসিকতার তার সাথে কাজে নামতে দ্বিধা করেনি। অদক্ষ

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৪৩। পৃ: ১৪৩-৪৪

শ্রমিকদের জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও বহু প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করেছে সরকার। বর্তমান শ্রমিক রীতিতে দুটি নতুননীতি যুক্ত করা হয়েছে, এর গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী এবং অতীতের ধারা থেকে ভিন্ন।

ভদ্রস্থ মজুরি নির্ধারণ ও চাকরির যথাযথ নিয়মবিধি প্রবর্তনে সরকার দায়িত্ব পালন করেছে।

সরকার মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে বাধ্য করেছে স্বকীয় বিবাদ সালিসির কাছে পেশ করতে। ভারত সরকার শ্রমিক কল্যাণ কার্যকরী করতে শ্রমিকদের উন্নয়ন বিষয়ে নির্দেশ দিয়েই খান্ত হয়নি, এই বিধি কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা নিজস্ব মাধ্যম তৈরি করেছে।

এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ সরকার নিজ উদ্যোগেই নিয়েছে। তবে এটা মনে হয়েছে যে ভারত সরকারের শ্রমনীতি প্রয়োগের জন্য একটা প্রশাসন ব্যবস্থা তৈরি করা ভালো, যার মাধ্যমে প্রাদেশিক ও রাজ্য সরকার, শ্রমিক কর্মচারী ও মালিক পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ সম্পন্ন হতে পারে, এর দ্বারাই সরকার নতুন দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে।

দুই সংস্থা গঠন

এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলনের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, শ্রমিক কল্যাণের আইনগত ও প্রশাসনিক দিক সম্বন্ধে ভারত সরকারকে যথাযথ পরামর্শ দিয়ে সমস্যার মোকাবিলায় সাহায্যের জন্য একটা স্থায়ী প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা গঠনের সময় হয়েছে কি না। সেখানে উপস্থিত প্রতিনিধিরা একবাক্যে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও দুটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, বড়টা হবে পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনে এবং ছোটটা হবে স্থায়ী শ্রমিক সমিতিতে।

ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক সম্মেলনের উৎস ছিল যুদ্ধের জরুরি পরিস্থিতিজনিত। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, যুদ্ধের পরও এটা থাকবে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোয় এটা স্থায়ী হিসাবে কাজ করবে। আমি নিশ্চিত, শিল্প ও শ্রমিক সমস্যার আলোচনার প্রতিনিধিত্বমূলক মঞ্চ হিসাবে এর স্থায়ী ভূমিকা সম্বন্ধে কেউই সন্দেহ পোষণ করবেন না। গত ১৩ মাস ধরে কাজের সমীক্ষা সন্দেহ দূর করার পক্ষে যথেষ্ট।

আগস্ট, ১৯৪২-এ দুই কমিটি গঠিত হওয়ার পর আজ অবধি স্থায়ী শ্রম কমিটির তিনটি বৈঠক হয়েছে। প্রথম বৈঠকে আলোচ্য বিষয় ছিল যুদ্ধকালীন শ্রম আইন প্রণয়ন, উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা যেমন, ঝগড়া মীমাংসা, কামাই, কাজের ঘণ্টা, শিল্প

অবসাদ, স্বাস্থ্য গবেষণা সংস্থা, শ্রমিকের মজুরি, মহার্ঘ ভাতা, বোনাস, সঞ্চয়, কল্যাণ বিষয়ক প্রশ্ন, উৎপাদন মূল্যে খাদ্যশস্য দোকান, এ. আর. পি ও কল্যাণ কাজের জন্য যুক্ত কমিটি ; এবং ছোট খুচরা পয়সার অভাবে মজুরদান সুসম্পন্ন করা।

দ্বিতীয় সভায় বিষয়গুলি ছিল : শ্রমিকদের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, ভারত রক্ষা আইনের ৮১(ক) অনুযায়ী যুক্ত বিচার ও রায় এবং বকেয়া বোনাস। তৃতীয় বৈঠকে জোর দেওয়া হয় সরকারি চুক্তিতে উপযুক্ত মজুরির ধারা অন্তর্ভুক্ত করা, যুক্ত উৎপাদন কমিটি, শিল্প সংস্থাগুলিতে লেবার আধিকারিক নিয়োগ, ভারত রক্ষা আইনের ৮১(ক) চালু করা, কর্মনিয়োগ সংস্থা গঠন এবং অনুয়ায়ী পরিসংখ্যান সংগ্রহ।

স্থায়ী শ্রম কমিটিতে আলোচিত বিষয়গুলির বহুমুখিতা এর গুরুত্বের পরিচয় দেয়। আলোচিত বিষয়গুলিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসা যায় নি।

চরম উপযোগী ব্যবস্থা

কিন্তু আলোচনাগুলি অত্যন্ত উপযোগী ছিল এবং ভারত সরকার বিশেষভাবে উপকৃত। সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় বেশিরভাগ প্রশ্নেই সরকার ব্যবস্থা নিতে পারেনি। তবে যেসব বিষয়ে সহমত হয়েছে, সরকার তা গ্রহণ করতে দেরি না করে ব্যবস্থা নিয়েছে। এর সমর্থনে আমি কতকগুলি বিষয়ের উল্লেখ করব, যেমন যুদ্ধে আহতদের (ক্ষতিপূরণ বিমা) জন্য আইন, এবং জাতীয় চাকরি (প্রযুক্তি পদ সংশোধন) অধ্যাদেশ। অন্য দৃষ্টান্তের মধ্যে আছে শিল্প পরিসংখ্যান আইন এবং কর্মনিয়োগ সংস্থা প্রকল্প। এই দুই বিষয়ে সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত কাজে প্রয়োগ করা হবে শীঘ্রই।

দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন

অনেকের চোখে এই অগ্রগতি সামান্য মনে হতে পারে। তাদের বলব, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভুল। অগ্রগতির কোনও সংক্ষিপ্ত পথ নেই, এবং কেউ নিশ্চিত নয় যে সংক্ষিপ্ত পথ ঠিকপথ হবে। শান্তিপূর্ণ পথে অগ্রগতি সবসময়েই ধীরগতি, আমার মতো আদর্শবাদীর কাছে অনেক সময়ে কষ্টকর ভাবে মন্থর। ভারতের মতো প্রাচীন দেশে, সমষ্টিগত প্রয়াস ও সামাজিক সচেতনতার ঐতিহ্য যেখানে নেই, সেই দেশে অগ্রগতি মন্থর হতে বাধ্য। তবে আমার মতে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা অগ্রগতির হার নয়, দৃষ্টিভঙ্গির চরিত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের বিচার করলে আমার বলতে দ্বিধা নেই, ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের বড় কৃতিত্ব হল শ্রম সমস্যা সম্পর্কে

সরকার মালিক ও শ্রমিক পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন সাধন। এই সম্মেলনে যোগদানকারী কেউ এটা বুঝতে ব্যর্থ হন নি। দৃষ্টিভঙ্গির স্বাস্থ্যপ্রদ ও আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত হয়ে আমরা অগ্রগতির হার দ্রুত করায় প্রত্যয়ী।

আলোচ্য বিষয়সূচি

এই প্রকাশ্য শ্রম সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে ৮টি বিষয় রয়েছে :

(i) অনিচ্ছাকৃত বেকারি, কয়লা, কাঁচা মালের অভাবের দরুন

(ii) সামাজিক সুরক্ষা ; ন্যূনতম মজুরি

(iii) মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণের নীতি

(iv) বোম্বাই শিল্প-বিরোধ আইনের পঞ্চম অধ্যায়ের ধারা অনুযায়ী বড় শিল্পে স্থায়ী নির্দেশাবলী

(v) প্রকাশ্য সম্মেলনের জন্য পদ্ধতিগত বিধি প্রণয়ন

(vi) বিভিন্ন রাজ্যে ত্রিপাক্ষিক সংস্থা গঠন

(vii) আইনসভা ও অন্যান্য সংস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব

(viii) প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য আইনবিধি

এগুলির মধ্যে দুটি বিষয়ের গুরুত্ব আপনাদের নজর এড়াবে না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের কথা বলছি। এ দুটি অবিভাজ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ হল এ-দুটি অপরিহার্য। সারা বিশ্বেই এ নিয়ে গভীর পর্যালোচনা হচ্ছে এবং Beveridge Report এমন এক দৃষ্টান্ত যা থেকে বুঝা যায় সারা বিশ্বেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা ভারতে এর থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারি না। এ নিয়ে কী করা উচিত বা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত, তা আমার পক্ষে বলা ঠিক নয়। কিন্তু আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি এই বিষয়ে প্রাসঙ্গিক দুটি পর্যবেক্ষণ করতে চাই। প্রথমটা হল এই।

দুটি অসঙ্গতি

যারা শিল্প সংস্থার পুঁজিবাদী ধারা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীন তারা স্বকীয় ব্যবস্থার অসঙ্গতি স্বীকার করবেন। প্রথম অসঙ্গতি হচ্ছে বিপুল সম্পদ ও চরম দারিদ্র্য। সরল ধারায় নয়, তীব্র রূপে, এই ব্যবস্থায় দেখি যারা কাজ করে তারা গরিব যারা কাজ করে না তারা সম্পদশালী।

দ্বিতীয় অসঙ্গতি রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে। রাজনীতিতে সমতা ; অর্থনীতিতে অসাম্য। একজনের এক ভোট, এক ভোট এক দাম আমাদের রাজনৈতিক নীতি। অর্থনীতিতে নীতি রাজনৈতিক নীতির অস্বীকৃতি। এই বৈপরিত্য মীমাংসায় আমাদের মতানৈক্য হতে পারে। কিন্তু অসঙ্গতি যে আছে সেবিষয়ে মতভেদ নেই।

এটা ঠিক, এই বৈপরিত্য প্রকট হলেও সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে এবং যেসব অসঙ্গতি সম্পর্কে তীক্ষ্ণবোধের মানুষ সচেতন ছিলেন না, এখন নেহাত বোকারাও এ বিষয়ে সচেতন।

দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ হল, সামাজিক জীবনে মর্যাদা ভিত্তিক থেকে চুক্তি ভিত্তিক হওয়ার ফলে জীবনের নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এবং মানবজীবনের উন্নয়নের উৎসাহী সবার কাছেই এর সমাধান মুখ্য চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। মানুষের অধিকার ও বিভিন্ন স্বাধীনতা সম্বন্ধে চিন্তায় অনেক শক্তি নিয়োজিত হয়েছে, এইসব অধিকার জন্মগত ও হস্তান্তর অযোগ্য বলে গণ্য করতে হবে। এসবই অত্যন্ত ভাল ও আনন্দের কথা। আমি যেটা বলতে চাইছে, জীবনে সামান্য নিরাপত্তাও না। Report of Economic Group of the Pacific Relation-এর মন্তব্য উদ্বৃত করে বলি, যদি না আমরা এইসব অধিকারকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় রূপায়িত করতে পারি, যেমন শান্তি, একটুকু বাসা, উপযুক্ত পোষাক, শিক্ষা, সুস্বাস্থ্য, এবং সর্বোপরি বিশ্বে যেন চিত্ত যেথা ভয়শূন্য হয়ে চলতে পারি।

সসম্মানে বাঁচার পক্ষে

আমরা ভারতে এইসব সমস্যা অস্বীকার বা এড়াতে পারি না। মূল্যবোধের পুনর্মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। শিল্পোন্নয়নকে লক্ষ্য করাই যথেষ্ট হবে না। আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সামাজিকভাবে কাম্য স্তরে শিল্পোন্নয়ন বজায় রাখতে হবে। আরও বেশি সম্পদ উৎপাদন শক্তিনিয়োগ করাই যথেষ্ট হবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে মর্যাদাপূর্ণ, সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এই সম্পদে সবার অধিকার স্বীকার করাই যথেষ্ট নয়, নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে সুরক্ষিত করতে যথাযথ পথ ও মাধ্যম বার করতে হবে। শেষ করার আগে আর একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমাদের সভায় অনেক সময়েই আলোচনা হয় অত্যন্ত খাপছাড়া ও অনিয়ন্ত্রিত ভাবে।

এ ব্যাপারে বেশি সমালোচনা করার ইচ্ছা আমার নেই, তবে আমি প্রতিনিধিদের সংক্ষিপ্ত ও নির্দিষ্ট বক্তব্য পেশের জন্য অনুরোধ করব। আলোচনায় যোগদান অথবা স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনে প্রতিনিধিদের সুযোগ সীমিত করতে চাই না, কিন্তু

আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই যে, আমরা প্রতিনিধিদের মতামত কি সেটাই জানতে চাই। নিজের মতামত ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি স্বাগত। কিন্তু মত প্রকাশের সূত্রে হাজারো যুক্তিজাল বিস্তার করার দরকার কী, যখন জানি এই যুক্তি কি হতে পারে! আমি নিশ্চিত, আমার মতো আপনারাও সভার কাজ সু-শৃঙ্খল্ করার জন্য উৎসাহী এবং কার্লাইল ব্রিটেনের হাউস অব্ কমনস্-এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছিলেন, আমাদের বিরুদ্ধে যাতে না ওঠে তা এড়াবার চেষ্টা করব।

□ □ □

২০

শ্রমিক ও সংসদীয় গণতন্ত্র

[দিল্লিতে ৮-১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩ ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কার্স স্টাডি ক্যাম্প-এর সমাপ্তি অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা]

আপনাদের সামনে আজকেই এই সন্ধ্যায় বক্তব্য রাখার জন্য সম্পাদক মহাশয় আমায় যে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ। প্রথমত: সরকারকে বাধ্যবাধকতায় আনা যায় এমন কিছু আমি বলতে পারব না। দ্বিতীয়ত: আপনাদের প্রাথমিক উৎসাহ যে শ্রমিক ইউনিয়নে, যে সম্বন্ধে আমি খুব কম বলতে পারি। তবু আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি, কারণ আপনাদের সম্পাদক আমায় ছাড়বেন না। আমি মনে করলাম, এই সূত্রে ভারতে শ্রমিক সংগঠন সম্বধে আমার চিন্তা সবার কাছে বলতে পারব এবং ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে আগ্রহী ব্যক্তিরা হয়ত আমার বক্তব্য শুনতে চাইবেন।

মানব সমাজের সরকার দারুনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন মানব সমাজের সরকার অত্যাচারী সম্রাটের স্বৈরতন্ত্রের রূপে ছিল। দীর্ঘ রক্তাক্ত সংগ্রামের পর এর স্থানে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে হয়েছিল এটাই সরকারের কাঠামোর ক্ষেত্রে শেষ কথা। বিশ্বাস জন্মেছিল যে, এর দ্বারা এক স্বর্ণযুগের সূচনা হবে যেখানে প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতার অধিকার সম্পত্তি ও সুখের পথ উন্মুক্ত হবে। এই উচ্চাশা পোষণের ভিত্তি ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রে মানুষের ভাষা প্রকাশের জন্য আইনসভা আছে। আইনসভার অধীনে শাসনকার্য পরিচালক থাকে এবং আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। আইনসভা ও প্রশাসনের ওপরে আছে বিচার বিভাগ এই দুই বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও বিধিবদ্ধ রাখে বিচারালয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে জনপ্রিয় সরকারের **সব** চিহ্ন আছে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য জনগণের সরকার। কাজেই এটা এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে, সর্বজনীনভাবে

* ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার কর্তৃক প্রকাশিত, ৩০ ফৈজ বাজার, দিল্লি, বোম্বাইয়ের আর.টি. সিন্ধে মহাশয়ের থেকে প্রতিলিপি গৃহীত।

গৃহীত ও উদ্বোধিত হওয়ার একশ বছরের মধ্যেই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ কেন? এটা ভাববার মতো প্রশ্ন। অন্য যে কোনও দেশের চেয়ে ভারতে এই প্রশ্ন পর্যালোচনা করা অনেক বেশি প্রয়োজন। ভারতবাসীর কাছে সাহস করে বলা দরকার, "সংসদীয় গণতন্ত্র সম্বন্ধে সাবধান, এটি যেমন শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলে মনে হয় তা নয়।" সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হল কেন? স্বৈরতন্ত্রীদের দেশে এটা ব্যর্থ হয়েছে, কারণ এর গতি মন্থর। ত্বরিত ব্যবস্থা নেওয়ায় দেরি হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রশাসকের ইচ্ছার কোনও আইন গ্রহণে আইনসভা অস্বীকার করতে পারে। আইনসভা না অস্বীকার করলেও বিচারবিভাগ ঐ আইনকে অবৈধানিক ঘোষণা করতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্র একনায়কদের যথেচ্ছাচার করতে দেয় না, এবং সেজন্যই ইতালি, স্পেন, জার্মানির মতো স্বৈরতন্ত্রী শাসকের দেশে এই ব্যবস্থা অবাঞ্ছিত বলে গন্য। শুধু একনায়করাই সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরোধী হলে কিছু চিন্তার ছিল না। সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এদের শংসাপত্র কোনও শংসাপত্র-ই নয়। প্রকৃতপক্ষে সংসদীয় গণতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিবন্ধক, সেজন্যই এটা স্বাগত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: যেসব দেশের মানুষ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সেসব দেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রবল। এটাই সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে দুঃখজনক ব্যাপার। আরও দুঃখজনক এইজন্য যে, সংসদীয় গণতন্ত্র এক জায়গায় থেমে নেই। তিন দিকে এর অগ্রগতি হয়েছে। সমান রাজনৈতিক অধিকারের চিন্তা দিয়ে এর অগ্রগতি হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র আছে এমন খুব কম দেশেই সর্বজনীন ভোটাধিকার নেই। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের সমতার নীতি সংগঠিত করেছে এই ব্যবস্থা। এবং তৃতীয়ত: এতে স্বীকার করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র সমাজবিরোধী যৌথ সংস্থার দয়ার পাত্র থাকতে পারে না। এসবের জন্য গণতন্ত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসন্তোষ রয়েছে। অবশ্য এইসব দেশে অসন্তোষের সাথে একনায়কতন্ত্রী দেশের অসন্তোষের পার্থক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে বিশদে যাওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মূল কারণ, সাধারণ মানুষের অধিকার, সম্পত্তি ও সুখ সমৃদ্ধির প্রতিষ্ঠার এই ব্যবস্থার ব্যর্থতা সম্বন্ধে বোধ। একথা সত্যি হলে এই ব্যর্থতার পেছনে কারণগুলি কী, তা জানা দরকার। এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে ভ্রান্ত আদর্শ বা ভ্রান্ত সংগঠন অথবা দুই-ই হতে পারে। আমার মনে হয়, দুটোর মধ্যেই ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে হবে। সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষতিকারক ভ্রান্ত আদর্শের নমুনা হিসাবে আমি দুটি বিষয় উল্লেখ করতে পারি। আমি নিঃসন্দেহ, সংসদীয় গণতন্ত্রের ধ্বংশের জন্য চুক্তির স্বাধীনতার ভাবনা বহুলাংশে

দায়ী। এই ভাবনাকে স্বাধীনতার নামে পবিত্র বলে গণ্য করা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্র এর অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে দৃষ্টি দেয় নি এবং চুক্তিবদ্ধ পক্ষের ক্ষেত্রে অসম হলেও এই চুক্তির স্বাধীনতার পরিণতি পর্যালোচনা করে নি। চুক্তির স্বাধীনতা বলে শক্তিমান পক্ষ গরিবদের প্রবঞ্চনা করলেও কেউ এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। ফল হয়েছে এই, স্বাধীনতার প্রবক্তা হয়েও সংসদীয় গণতন্ত্র গরিব, অবদমিত, বঞ্চিত মানুষের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচার বাড়িয়েছে। দ্বিতীয় যে ভ্রান্ত আদর্শ সংসদীয় গণতন্ত্রকে কলুষিত করেছে তা হল, সামাজিক ও আর্থনীতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র সফল হতে পারে না, এটা অনুধাবনে ব্যর্থতা। কেউ-কেউ এই যুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। যারা প্রশ্ন করবেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমার পাল্টা প্রশ্ন রাখছি। ইতালি, জার্মানি, রাশিয়ায় সংসদীয় গণতন্ত্র ধ্বসে পড়ল কেন এত সহজেই? ইংলন্ড বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যর্থ হল না কেন? আমার কাছে একটা উত্তর, এই দুই দেশে অন্য তিনটি দেশের তুলনায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র বেশি ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্ত্রের কোষ গ্রন্থির মতো। কোষগ্রন্থি যত শক্ত হবে, দেহের শক্তি হবে তত। গণতন্ত্র সমতার আর এক নাম। সংসদীয় গণতন্ত্র স্বাধীনতার আশঙ্কা তীব্র করেছে। কিন্তু সমতার প্রতি সম্মতিসূচক পরিচয় দেখায় নি। সমতার গুরুত্ব, এমন কি সাম্য ও স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য সাধনের গুরুত্ব বোধ করেনি এই ব্যবস্থা। এর ফলে স্বাধীনতা সাম্যকে গ্রাস করে ফেলেছে এবং অসাম্যের জনক হয়েছে। আমার বিচারে, সংসদীয় গণতন্ত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ভ্রান্ত আদর্শ সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করেছি। তবে আমি সমানভাবে নিশ্চিত, ভুল আদর্শের সঙ্গে বাজে সংগঠনও গণতন্ত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ি। সব রাজনৈতিক সমাজ-ই দু'ভাগ বিভক্ত—শাসক ও শাসিত পক্ষ। কিন্তু এর দুঃখজনক দিক হল, এই ভাগটা এত বাঁধাধরা ছকের ও স্তর বিন্যস্ত হয়ে গেছে যে, শাসকরা সব সময়েই শাসক শ্রেণীর থেকেই আসেন, শাসিতেরা কোনদিন শাসক শ্রেণী হয় না। মানুষ নিজেরা শাসন পরিচালনা করে না, তারা একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের শাসিত হতে দেয়, তারা ভুলে যায় যে এটা তাদের সরকার নয়। এটাই পরিস্থিতি।সংসদীয় গণতন্ত্র কোনসময়েই মানুষের দ্বারা বা মানুষের সরকার নয়, এবং সেজন্যই এটা কখনই মানুষের জন্য সরকার হয় নি। জনপ্রিয় সরকারের নানা অনুষঙ্গ সত্ত্বেও সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তবে উত্তরাধিকার ক্রমে প্রজা শ্রেণীর সরকার যা শাসন করেন উত্তারধিকার ক্রমে শাসক শ্রেণী। রাজনৈতিক জীবনের এই বিষময় সংগঠনের জন্যই সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এই কারণেই সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ও সমৃদ্ধির আশা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্র।

প্রশ্ন হল, এর জন্য দায়ি কে? এতে সন্দেহ নেই যে, সংসদীয় গণতন্ত্র গরিব, শ্রমজীবী, অবহেলিত মানুষদের স্বার্থরক্ষায় ব্যর্থ হয়ে থাকলে তার জন্য দায়ী ঐসব শ্রেণীর মানুষরাই। প্রথমতঃ, মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক দিকগুলির প্রতি চরম অবহেলা এরা দেখিয়েছে। জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি বই লিখেছেন 'অর্থনৈতিক মানুষের সমাপ্তি' (End of the Economic Man) বিষয়ে। এটা বলা যায় না, কারণ অর্থনৈতিক মানুষের জন্মই হয় নি। মার্কসের উদ্দেশ্যে সাধারণ সমুচিত জবাব, মানুষ শুধু খাদ্যের জন্যই বাঁচে না, একথা দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঘটনা। আমি কার্লাইলের সাথে একমত যে, সভ্যতার লক্ষ্য শুধুমাত্র খাওয়া পরা করে মেদবৃদ্ধি নয়, যা শুয়োরের ক্ষেত্রে করা হয়। তবে আমরা সেই স্তর থেকে অনেক দূরে আছি। শ্রমিকশ্রেণীর শূকরসুলভ মেদবৃদ্ধি দূরস্থান, তারা অনাহারক্লিষ্ট, এবং আমরা চাই তারা প্রথমে খাদ্যের কথাই ভাবুন, অন্য সব পরে হবে।

মার্কস ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। এর যথার্থতা সম্বন্ধে বহু বিতর্ক রয়েছে। আমার ধারণা, মার্কসের এই তত্ত্ব উদ্ভাবন শ্রমিকদের প্রতি এই অর্থে নিবদ্ধ নয় যে, শ্রমিক মালিক শ্রেণীর মতো নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে মুখ্য গণ্য করলে ইতিহাস আগের চেয়ে বেশিভাবে অর্থনৈতিক ঘটনার প্রতিবিম্ব হবে। ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা যদি পুরোপুরি ঠিক বলে প্রতিপন্ন না হয় তবে তার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর ব্যর্থতার-ই দায়ি, সমগ্রভাবে এই শ্রেণী অর্থনৈতিক বিষয়কে সহযোগী জীবনের ধারা নির্ধারণের মুখ্য শক্তি করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। শ্রমিকরা মানবসমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় সরকার সম্বন্ধে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে নি। শ্রমিক শ্রেণীর সবার পক্ষেই রুশোর 'সোসাল কনট্রাকট', জন স্টুয়ার্ট মিলের 'অন লিবার্টি', মার্কসের কম্যুনিস্ট ইস্তাহার, পোপ লিও-র 'এসাইক্লিকাল অন দ্য কনডিশনস্ অব্ লেবার' বইগুলি সম্বন্ধে জানা দরকার। আধুনিক যুগের সামাজিক ও সরকারি সংগঠন বিষয়ে এই চারটি বই মৌলিক কর্মসূচিগত দলিল স্বরূপ। আরেকটা বড় অপরাধ তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই করেছে। তারা সরকার দখলে উচ্চাকাঙ্খা গড়ে তুলতে পারে নি, নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তারা প্রত্যয়ী নয়। বাস্তবিকই তারা সরকার সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহী নয়। মানবসমাজের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডির মধ্যে এটা অন্যতম ও দুঃখজনক ট্র্যাজেডি। যেটুকু সংগঠন আছে, তা ট্রেড ইউনিয়নবাদের আকারে রয়েছে। আমি ট্রেড ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নই। এরা অত্যন্ত কার্যকরী উদ্দেশ্য সাধন করে। কিন্তু এটা মনে করা ভুল হবে যে, শ্রমিকদের যাবতীয় দুর্দশা মোচনে ট্রেড ইউনিয়নই সর্বরোগহর ওষুধ। ট্রেড ইউনিয়ন অতি শক্তিশালী হলেও পুঁজিপতিদের আরও

ভালভাবে পুঁজিবাদ পরিচালনায় বাধ্য করতে পারবে না। পেছনে বিশ্বাসযোগ্য শ্রমিক সরকার থাকলে ট্রেড ইউনিয়ন আরও কার্যকরী হবে। সরকার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য রাখতে হবে ট্রেড ইউনিয়নকে। ট্রেড ইউনিয়ন সরকার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কাজ না করলে শ্রমিকের সামান্য উপকার-ই ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে এবং ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে ঝগড়া চলতেই থাকবে।

শ্রমিকদের তৃতীয় ক্ষতিকারক পাপ হচ্ছে, তারা সহজেই জাতীয়বাদাদের ডাক-এ বিপথচালিত হয়। শ্রমিক শ্রেণী প্রতিনিয়তই নিঃস্ব হচ্ছে সব দিক থেকে এবং যাদের দেওয়ার কিছু নেই, আগের সময়েই তারা জাতীয়তাবাদের তথাকথিত আদর্শের জন্য নিজেদের সবকিছু ত্যাগ করে। তারা কখনও ভেবে দেখে না, যে জাতীয়তাবাদের জন্য তাদের ত্যাগ, সেই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হলে তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা অর্জন করতে পারবে কিনা। জাতীয়তাদের সাফল্যের সূত্রে উদ্ভূত মুক্ত স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র, যার জন্য শ্রমিকরা আত্মত্যাগ করেছে, প্রায়ক্ষেত্রেই তাদের প্রভুদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের শত্রু রূপে পরিগণিত হয়েছে। এটাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের শোষণ শ্রমিকরা নিজেরাই যার বশ্যতা মেনে নিয়েছে।

শ্রমিক শ্রেণী যদি সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবস্থাধীন থাকতে চায়, তবে একে নিজেদের সুবিধামুখী কারার যথাযথ পন্থা উদ্ভাবন করতে হবে। আমার যতদূর ধারণা, এই লক্ষ্য অর্জনে দুটো জিনিস দরকার। প্রথম কাজ হবে ভারতে শ্রমিকের চরম লক্ষ্য অর্জনে শুধু ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ধারণা ত্যাগ করতে হবে। ঘোষণা করতে হবে যে, লক্ষ্য হচ্ছে সরকারের নেতৃত্বে শ্রমিকদের বসানো। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের দলকে রাজনৈতিক দল হিসাবে সংগঠিত করতে হবে। সেই দলে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হিসাবে থাকবে নিশ্চয়-ই, কিন্তু একে ট্রেড ইউনিয়ন সর্বস্যতার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি চরম সুবিধা ত্যাগের বিনিময়ে স্বল্পমেয়াদী সুবিধা গ্রহণ, শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়ন পদাধিকারীদের কায়েমি স্বার্থ থেকে মুক্ত করতে হবে। কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার মতো সাম্প্রদায়িক বা পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির সংশ্রব ছাড়তে হবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার দাবি করে বলেই শ্রমিকদের কংগ্রেস যা হিন্দু মহাসভার সাথে মিশে যাওয়ার দরকার নেই। নিজেদের দল গঠন করে শ্রমিকরা উভয় উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার কব্জা থেকে মুক্ত হয়ে তারা ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের লড়াই আরও ভালভাবে করতে পারে। জাতীয়তাবাদের নামে প্রবঞ্চিত হওয়া এভাবেই ঠেকানো সম্ভব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, তারা ভারতীয় রাজনীতির যুক্তিবাদহীনতার বাধা হতে পারে। কংগ্রেসী রাজনীতি বৈপ্লবিক বলে দাবি করা হয়। সেজন্য এরা বহু

সংখ্যক সমর্থক পান। কিন্তু এটা ঘটনা যে কংগ্রেস রাজনীতির অবদান হতাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এর কারণ, কংগ্রেস রাজনীতি দারুন যুক্তিহীন এবং যুক্তিহীনতার কারণ কংগ্রেসের কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এই যুক্তিহীনতাবাদের দুই দশকব্যাপী প্রাধান্যের পরিবর্তে শ্রমিক দল হলে তা স্বাগত। ভারতের শ্রমিকদের দ্বিতীয় যেটি বুঝা দরকার তা হল, জ্ঞান ছাড়া ক্ষমতা সম্ভব নয়। ভারতে শ্রমিক দল গঠিত হলে এবং সেই দল গদিতে বসার দাবি নির্বাচকদের সামনে রাখলে প্রশ্ন উঠবেই যে, শ্রমিকরা শাসন করার উপযুক্ত কি না, স্বরাষ্ট্র বা বৈদেশিক ক্ষেত্রে শ্রমিক অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে খারাপ শাসক হবে, এই উত্তর ঠিক নয়। শ্রমিকদের নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হবে, তারা আরও ভালভাবে শাসন করতে পারে। এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে, শ্রমিক সরকারের ধরণ অন্যান্য শ্রেণীর থেকে কঠিন রূপের। শ্রমিক সরকার অবাধনীতির সরকার হতে পারে না। এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা-ভিত্তিক হতে হবে। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সরকারের জন্য অবাধ নীতির সরকারের কাজের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দরকার। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের শ্রমিক এইসব অধ্যায়নের গুরুত্ব বুঝে নি। ভারতের শ্রমিক নেতারা শুধু শিল্পপতিদের গালাগাল করাটাই শিখিয়েছে। শ্রমিক নেতার মুখ্য ভুমিকাই হল, গাল দাও, আরও গাল দাও।

সেজন্য আমি অত্যন্ত খুশি যে, ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার এই দোষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছেন। শ্রমিক শ্রেণীকে শাসন পরিচালনার যোগ্য করে তুলতে এগুলি অত্যন্ত কার্যকরী পথ। আশা করি, ফেডারেশন অন্যসব প্রয়োজন, যেমন শ্রমিক দলের পত্তন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভুলে যাবেন না। এই কাজ করলে ফেডারেশন শ্রমিক শ্রেণীকে শাসকশ্রেণীর মর্যাদায় উন্নত করার জন্য ধন্যবাদার্হ্য হবেন।

□ □ □

২১

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংশোধন বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : স্যার আমি প্রস্তাব করছি :

‘ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ বিধেয়কটি বিষয়ে সবার মতামতের সংগ্রহের জন্য প্রচারিত করা হোক।”

এ ব্যাপারে জনমত যাচাই করার জন্য প্রস্তাবটি প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য। তা হলে, আমার মতে হয় বিধেয়কে লিপিবদ্ধ বিধিগুলি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। আমি মনে করি, বিধেয়কের মোদ্দা বিষয় এবং কিজন্য সরকার এই বিশেষ আইন গ্রহণ করতে চায় সেটা বলে দেওয়াই যথেষ্ট।

এই বিধেয়কের তিনটি দিক। প্রথমত:, এই বিধেয়কে ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিতে মালিককে বাধ্য করা হবে। দ্বিতীয়ত: বিধেয়কে মালিকের স্বীকৃতির জন্য ট্রেড ইউনিয়নকে কয়েকটি শর্তপূরণ করার কথা রয়েছে। তিন নম্বর হল, ট্রেড ইউনিয়ন এই সব শর্ত পূরণ করার পর স্বীকৃতির যোগ্য হলেও মালিক তার স্বীকৃতি না দিলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

আগেই বলেছি, এই ব্যবস্থার সুবিধা নিয়ে আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়। এই প্রস্তাব বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত, কাজেই এর বিধিগুলি পরীক্ষামূলক। এতে চরম কিছু নেই। শ্রমিক নেতা, মালিক, প্রাদেশিক সরকারগুলি ও অন্যান্য পক্ষের মতামত না পেলে এর ধারাগুলি চূড়ান্ত করার ইচ্ছা সরকারের নেই। কাজেই বিধেয়কটি এখন যেরূপ আছে, বিভিন্ন পরামর্শ প্রস্তাব সরকার কর্তৃক বিবেচনার পর অন্যরকম হয়ে যাবে।

শ্রী এন. এম. যোশি : আশা করি, এটা আরও ভাল হবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সবার মতামত থেকে তাই আশা করি। সভাকে আমি শুধু বলতে চাই, কিসের জন্য সরকার এই দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছে।

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৩। পৃ: ২৫২-৫৪

সভা নিশ্চয়ই স্মরণ করবেন যে এই বিষয়টি বহু চিন্তার পর এবং মালিক কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল, যেসব মাননীয় সদস্য রয়্যাল আয়োগ অন লেবার-এর রিপোর্ট পড়েছেন তারা জানেন, ট্রেড ইউনিয়নের বিকাশ ও মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সুস্থ করার উদ্দেশ্যে স্বীকৃতির ওপর এই কমিশন কত গুরুত্ব দিয়েছিল। সভা অরও স্মরণ করতে পারেন যে রয়্যাল আয়োগ সেই সময়ে বলে যে তারা চায় আইনগত দায় ছাড়াই মালিকপক্ষ স্বেচ্ছায় ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দিক। সভা আরও জান যে এই কমিশনের রিপোর্টের পর ১২ বছর পার হয়ে গেছে, এবং মালিকদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। ঐ সময়ে মালিকরা স্বীকৃতির বিরোধিতায় যে আপত্তি কমিশনের কাছে পেশ করে এখনও স্বীকৃতির ক্ষেত্রে একইভাবে বাধা দিচ্ছে। পরবর্তীকালেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

মাননীয় সদস্যদের স্মরণ থাকতে পারে, ১৯৩৭ সালের পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সূত্রে গঠিত প্রাদেশিক সরকারের প্রায় সবাই এই বিষয়টি গণ্য করেছে। ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির জন্য মালিকদের বাধ্য করতে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা মন্ত্রকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন, মাদ্রাজে একটা বেসরকারি বিধেয়ক উত্থাপিত হয়, আবার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকও ব্যবস্থা নেয়। বোম্বাইতে সরকার বোম্বাই শিল্প বিরোধ আইন' পাশ করে। মধ্যেপ্রদেশে একটা আইনের কথা ভেবে খসড়া তৈরি হয়, যুক্তপ্রদেশেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দুর্ভাগ্যবশত: একমাত্র বোম্বাই ছাড়া সব প্রদেশেই এই প্রকল্প বিধিবদ্ধ রূপ পাওয়ার আগেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে। তবে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন হবার পর ভারত সরকার কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সহযোগিতার পদ্ধতি গ্রহণ করে শ্রমিক মন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা নেয়। ১৯৪০-এ প্রথম শ্রমিক মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা হয়, তখন সিদ্ধান্ত হয়, যেহেতু সম্মেলনের সামনে এ বিষয়ে যথেষ্ট তথ্য নেই যার থেকে একটা উপসংহারে আশা যায়, সেজন্য সম্মেলন কেন্দ্রীয় সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছে বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে পাঠিয়ে শ্রমিক নেতা, মালিক, প্রাদেশিক সরকার, সবার মতামত সংগ্রহের জন্য বলা হোক এবং ঐসব তথ্য ১৯৪১-এ প্রস্তাবিত দ্বিতীয় শ্রমিক সম্মেলনে পেশ করা হোক। সেই অনুযায়ী, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এ বিষয়ে তাদের মতামত ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মতামত সংগ্রহের জন্য চিঠি দেয়, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার বহু মতামত সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করে। এই সমগ্র বিষয়টি ১৯৪১-এর দ্বিতীয় শ্রমিক মন্ত্রী সম্মেলনে পেশ করা হয় এবং সেখানে

সিদ্ধান্ত হয় যে কেন্দ্রীয় সরকার একটি আইন প্রণয়ন করবে, সেই বিধেয়কটি প্রাদেশিক হবে না, সব প্রাদেশিক সরকারের ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের মতামতের ভিত্তিতে রচিত হবে। এর ফলে ভারত সরকার এই দায়িত্ব নেয় এবং বর্তমান আইনটি মূলত: বিভিন্ন পক্ষ ও প্রাদেশিক সরকারগুলির দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। এতে বুঝা যাবে কেন শ্রমিক আইন প্রাদেশিক সূত্র বিষয়সূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যবস্থা নিচ্ছে।

আমার মনে হয় না, এ বিষয় নিয়ে আর বেশি কিছু বলা দরকার। আগেই বলেছি, প্রস্তাবগুলি পরীক্ষামূলক, চরম নয়, খসড়া বিধেয়ক-এর ওপর বিভিন্ন মতামত নেওয়ার আগে এর চরম রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি যেটুকু বলতে পারি তা হল, একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব এই আইনসভার ওপর পড়েছে। সুইডেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া অন্য সব দেশেই ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতি বিষয়টি স্বেচ্ছামূলক রাখা হয়েছে। আমার আশা এটা কোন বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হবে না। যাই হোক, যা বলেছি তার চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না, কেননা এই বিধেয়কের যে কোনও ধারা সম্বন্ধে দায়িত্ব নেওয়ার আগে আমি একটি সাধারণের বিশ্লেষণের জন্য পেশ করতে চাইছি। স্যার, আমি প্রস্তাব করছি :

"ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ সংশোধনের পর এর ওপর মতামত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হোক।"

* * * * *

* **পি. জি. গ্রিফিথস্** (অসম, ইউরোপীয়) : সভাপতি মহাশয়, সভার সামনে পেশ করা প্রস্তাব হচ্ছে, বিধেয়কটি প্রচার করা হোক মতামত সংগ্রহের জন্য......মাননীয় বন্ধুকে মনে করিয়ে দিই, ট্রেড ইউনিয়নের বহু শত্রু রয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মালিকরা এর একপক্ষ।

****মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর** : স্যার, বিধেয়কটি প্রচারের জন্য আমি পেশ করায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে আমি বলেছি, বিধেয়কটি নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক ব্যবস্থা কিন্তু আমি ঐ সময়ে বলেছিলাম যে আমি বিতর্কে জড়াতে চাই না, বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দিতে চাই না। যেসব মাননীয় সদস্য এই বিতর্কে যোগ দিয়েছেন ও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন তাদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করছি না। তাদের আশ্বাস্ত করে বলতে চাই যে, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বক্তব্যের কথা আমি যথাযথ সময়ে মনে রাখব।

---

* বিধানসভা (কেন্দ্রীয়) বিতর্ক খণ্ড-৪, ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৩। পৃ: ২৫৬

** তদেব, পৃ: ২৭৬

এই পর্যায়ে কিছু বলতে হলে, আগে বলেছি, বিভিন্ন বিষয়ে যেসব উঠেছে তার উত্তর নয়। তবে আমি মনে করি মাননীয় সদস্য গ্রিফিথস্ যে সমালোচনা করেছেন তার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাঁর একটা যুক্তি অত্যন্ত অন্যায় বলে আমার ধারণা। তিনি বলেছেন, আমি এমন একটা ব্যবস্থা এনেছি যা কিন্তু প্রস্তাবে অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং তাঁর উক্তি মতো, ফাঁকা সব ধারা সম্পন্ন। তাঁর সমালোচনা, আমি সততা প্রতিপাদন করতে পারি নি এবং আমার দিক থেকে এই অস্পষ্ট ধারাযুক্ত বিধেয়ক সভার বিবেচনার জন্য পেশ করে আমি ঠিক কাজ করি নি। এই সমালোচনা আমি গ্রহণ করতে পারছি না এবং বলছি এটা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণাপূর্ণ ও ভিত্তিহীন। আমি প্রথমত: স্বীকার করি না যে, এতে বহু অস্বচ্ছ ধারা রয়েছে এবং এই বিধেয়কের অনেক ধারা এত ফাঁকা যে কেউ বিধেয়কের উদ্দেশ্যই বুঝতে অক্ষম। কিন্তু তর্কের খাতিরে যদি ধরে নিই যে, বিধেয়কের কিছু ধারা ফাঁকা এবং কিছু ধারার মধ্যে সারবস্তু আনা দরকার, তবে আমি মনে করি না যে এই সমালোচনা যথার্থ। সভাকে যদি আমি বলতাম যেভাবে এটা উত্থাপিত হয়েছিল, সেটাই গৃহীত হোক তবে সমালোচনার যুক্তি ছিল, কিন্তু আমি তা করছি না। আমি শুধু সভার অনুমতি চাইছি, মতামত সংগ্রহের জন্য বিধেয়কটি প্রচার করা হোক, যাতে সরকার সংশ্লিষ্ট পক্ষের পথনির্দেশ পেতে পারে এবং পরিণামে ফাঁকগুলি পূরণ ও অস্পষ্ট কোথায় সেটা সুনির্দিষ্ট করতে পারে। সুতরাং আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মি: গ্রিফিথস্-এর সমালোচনায় কোনও যুক্তি ছিল না।

গ্রিফিথস্ বলেছেন যে, তাঁর মতে বিধেয়কটি নীতিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ। ভাল কথা, এটা মতের ব্যাপার। অন্যপক্ষের সদস্যদের বলতে শুনেছি যে, বিধেয়কটি নীতিগতভাবে নিখুঁত এবং এটিকে আইনে বিধিবদ্ধ করা উচিত। কাজেই আমি সমালোচনার এই প্রশ্ন নিয়ে কথা বলব না।

তিনি দ্বিতীয় যুক্তিতে বলেছেন, প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কি, সেটা আমি বলি নি। কোনও আক্রমণের লক্ষ্য নিয়ে বলছি না, তিনি হয় বিধেয়কের সব ধারা পড়েন নি, অথবা পড়লেও বুঝতে পারেন নি। বিধেয়কের ব্যবস্থাগুলিতে পরিষ্কার যে, দুটি মূল শর্ত থাকবে। একটা হল, ট্রেড ইউনিয়নকে স্বীকৃতি পেতে হলে কটি শর্ত পূরণ করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত রয়েছে, শুধু শর্তপূরণ-ই স্বীকৃতির জন্য যথেষ্ট নয়, শর্ত পূরণের যোগ্যতা ছাড়াও ইউনিয়নকে একটি বোর্ডের সারটিফিকেট-এর জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। বাস্তবে আমি বলতে চাই, বিধেয়কের মৌলিক নীতি হচ্ছে, ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র নির্ভর করবে শ্রমিক প্রতিনিধি, সরকার ও মালিক এই ত্রিপাক্ষিক বোর্ড সারটিফিকেটের বিভিন্ন শর্ত সম্বন্ধে যেটা বলবে তার ওপর। আমার বন্ধু ২৮ খণ্ডের (ছ) উপখণ্ড নিয়ে অনেক মজা করেছেন। এতে

আছে : অন্য আরও শর্ত যা সুপারিশ হতে পারে। আমি বুঝছি না মি: গ্রিফিথস্ কীভাবে এই ধারার উদ্দেশ্য পুরো ভুল বুঝলেন! সরকারের অবস্থান হচ্ছে.........

মি: পি. জে. গ্রিফিথস্ : ব্যক্তিগত উল্লেখ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা, আমি উপখণ্ডের উল্লেখ-ই করি নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যকে ভুল বুঝে থাকলে আমি দুঃখিত। আমি সেভাবে বুঝেছি। আমি যা বলতে চাই তা হল এই : সরকারের অবস্থান খুব সোজা এবং সংক্ষিপ্তভাবে বলা যায় : ১৯৪১ সালে আমাদের কাছে যেসব মতামত এসেছিল এবং শ্রমিক ও মালিকসহ বিভিন্ন প্রতিনিধিদের থেকে যে মতামত পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে সরকার ঠিক করে ; তাদের দেওয়া ভাল শর্তগুলি ঠিকমতো লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু সরকার এ বিষয়ে অন্ধবিশ্বাসী হতে চায় না, তবে সরকার জানে যে প্রাদেশিক সরকার বা শ্রম ও পুঁজির নিয়োগকারীদের কিছু শর্ত স্বীকৃতির দানের আগে পূরণ করার কথা বিধেয়কে রাখতে হবে। এই ধরনের ঘটনাচক্রের কথা ভেবেই এই ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্য আরও শর্ত সুপারিশ করা হতে পারে। এটা একটা ছিদ্র, কোনও পরামর্শ যদি আসে তা গ্রহণের অবকাশ থাকার জন্যই এই সুযোগ রাখা হয়েছে। প্রতিনিধিত্বমূলক বলতে কি অর্থ, এ বিষয়ে বিধেয়কে কোথায় অস্বচ্ছতা বা অনিশ্চয়তা নেই।

মি: পি. জি. গ্রিফিথস্ : একটা তথ্যের ওপর প্রশ্ন। আপনি কি সভার কাছে নতুন ২৮খ খণ্ডের উপখণ্ড (ঙ) 'এটা একটা প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন' কথাটা ব্যাখ্যা করবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এর অর্থ বোর্ড কর্তৃক শংসাপত্র প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বমূলক ট্রেড ইউনিয়ন।

মি: গ্রিফিথস্ : তাদের নিজেদের ইচ্ছামতো?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বোর্ড একটা অনুসন্ধান করবে এবং এই মন্তব্যই করেছেন শ্রী যোশি। তিনি বলেছেন, ব্যক্তিগত সদস্যদের মতামত সহ সব ধরনের তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব এই বোর্ডকে দেওয়া হবে।

মি: গ্রিফিথস্ : প্রতিনিধিত্বমূলক-এর তথ্য সম্বন্ধে বোর্ডকে পথ নির্দেশ দেওয়াই কি উদ্দেশ্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমাদের প্রস্তাব তাই। এই ক্ষেত্রে আমরা চাই বিভিন্ন দল পরামর্শ দিন বোর্ডকে আমরা কী ধরনের নির্দেশ দেব।

মি: গ্রিফিথস্ : তাহলে এ বিষয়ে আপনাদের মনোভাব শূন্য?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা ভাবলেশহীন মানসিকতা নয়, মুক্ত মন। এভাবেই আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করতে চাই। মি: গ্রিফিথস্ ও অন্য সদস্যরা বিধেয়কের ওপর বক্তব্যে বলেছেন যে সরকার ২৭এঃ খণ্ডের প্রয়োগ সূত্রে সরকারি সংস্থাগুলিকে এই বিধেয়কের আওতামুক্ত রাখতে চেয়ে অযৌক্তিক কাজ করেছেন, এটা সদস্যদেরই কথা। এখন স্যার, এই যুক্তির উত্তরে প্রথম কথা হল যে জীবন সব সময়ে যুক্তি ধরে চলে না। অনেক ক্ষেত্রে যুক্তিহীনতা আমাদের উগ্রপন্থী করে তোলে এবং আমি মনে করি না মানুষ যুক্তিহীনতার চেয়ে উগ্রপন্থাকে বেছে নেবে। ব্যক্তিগতভাবে, আমি মনে করি, ২৮এঃ উপখণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে বলা যায়, সরকার যুক্তিহীন নয়, ভিরুও নয় ; সরকার সতর্ক এবং প্রাজ্ঞ। আমার মনে হয়, এই ধারাটি ভুল বুঝা হয়েছে। সরকারকে এই আইনের আওতামুক্ত করার কোনও ইচ্ছা নেই। যেটুকু বলা হয়েছে তা হল, একটা দিনক্ষণ নির্ধারিত হবে যখন এই বিধেয়ক সরকারি উদ্যোগেও প্রযুক্ত হবে। সুতরাং, যদি সরকারের প্রতি কোনও পক্ষপাত হয়, তবে তা বিধেয়কের প্রয়োগের ক্ষেত্রে নয়, বিধেয়ক প্রয়োগের সময় নিয়ে।

মি: গ্রিফিথস্ : এটা করা হল কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তার প্রয়োজন হতে পারে বলে।

মি: গ্রিফিথস্ : সেটা কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আগেই বলেছি, এই পর্যায়ে আমি বিতর্কে যেতে চাই না, এবং ডাক ও তার বিভাগের সচিব যেভাবে বলেছেন, সরকার মনে করে যে বর্তমানের জন্য সরকারি দফতরগুলি তাদের কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতিদানে যথেষ্ট ব্যবস্থা নিয়েছে। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেহেতু সরকার ইউনিয়নের স্বীকৃতিদানে বেসরকারি মালিকদের চেয়ে অনেক বেশি তৎপর, সেজন্য আমি মনে করি না যে সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে বিধেয়কের প্রয়োগ স্থগিত রাখলে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। স্যার, আমার আর কিছু বলার নেই।

সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুর রহিম) : প্রস্তাব হচ্ছে :

"ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আইন ১৯২৬ আরও সংশোধনার্থে এই বিধেয়ক প্রচার করা হোক মতামত সংগ্রহের জন্য"

প্রস্তাব গৃহীত।

□ □ □

২২

যুদ্ধোত্তর ভারতে বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়ন

ড. আম্বেদকরের ভাষণ

যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিদ্যুৎ শক্তির উন্নয়নের সমস্যা পর্যালোচনার জন্য 'পুনর্গঠন নীতি সমিতি'র বৈঠক বসে নতুনদিল্লিতে ২৫ অক্টোবর। সভাপতিত্ব করেন ভারত সরকারের শ্রমিক সদস্য ড. বি. আর. আম্বেদকর। কেন্দ্রীয় সরকারের আমন্ত্রণে বিভিন্ন প্রদেশ সরকারের প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে অগ্রণী রাজ্যগুলি ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা যোগ দেন। মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর কমিটির সামনে ভাষণে বলেন :

'ভদ্রমহোদয়গণ, নীতি-সমিতির ৩গ পুনর্গঠন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমি আপনাদের স্বাগত জানাই। আমার নৈতিক দায়িত্ব মেনে নিচ্ছি। কিন্তু দীর্ঘ ভাষণে আমি অধিকার অপব্যবহার করতে ইচ্ছুক নই। শুধু কিছু প্রাসঙ্গিক ঘটনা তুলে ধরে আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করতে চাই। যারা ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত পুনর্বিন্যাস সমস্যা বিষয়ে কাঠামো সম্বন্ধে জানেন না, তাদের অবগতির জন্য সংক্ষিপ্তভাবে পুনর্গঠন কমিটির পরিষদ্ তার কাজ করার সুবিধার জন্য কি কর্মপ্রকল্প গ্রহণ করেছে সেটা বলব।

পাঁচটি কমিটি

আমি নিশ্চিত, এটা অপনারা জানেন যে গত মার্চে প্রাক্তন রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগো আমার সহযোগী মহান বন্ধু মাননীয় স্যার জে. পি. শ্রীবাস্তবের সভাপতিত্বে পুনর্গঠন কমিটি পরিষদ্ নিয়োগ করেন। ঐ কমিটি আবার পাঁচটি বিভিন্ন পুনর্গঠন কমিটি গঠন করেন। এক নম্বর পুনর্গঠন কমিটির কাজ পুনর্বাসন ও পুনর্নিয়োগ সংক্রান্ত, দু'নম্বর কমিটির কাজ হস্তান্তর, চুক্তি ও সরকারি ক্রয়।

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৪৩। পৃঃ ২৭৯-৮১

কমিটি ৩-এর কাজ আবার তিন কমিটিতে বিভক্ত। কমিটি ৩(ক)-র কাজ পরিবহন সংক্রান্ত, ৩(খ) ডাক-তার ও আকাশপথ যোগাযোগ, ৩(গ) পূর্ত ও বিদ্যুৎ শক্তি। কমিটি-৪ কাজ করবে শিল্প ও ব্যবসার, কমিটি-৫ কৃষিকাজের দায়িত্বে থাকবে।

প্রতিটি কমিটির একটা করে নীতি নির্ধারক কমিটি আছে। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার রাজ্য সরকার সমূহ, ব্যবসা শিল্প বাণিজ্যের প্রতিনিধি সমন্বিত একটি পরিষদের সদস্যসভাপতির অধীনে ঐ কমিটি কাজ করবে। প্রতিটির আবার একটি সরকারি কমিটি থাকে, দফতরের সচিবের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতরে সচিবদের নিয়ে কমিটির অধীনে কাজ করে। সমস্যাদির গভীরে যাওয়ার আগে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত একটি সমস্যা নিয়ে এই প্রাথমিক পর্যায়েই কিছু বলতে চাই, কারণ এর থেকে অব্যাহতি চাই। বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়। এগুলি বাইরে থেকে, বেশিটাই গ্রেট ব্রিটেন থেকে সংগ্রহ করতে হবে। এইসব সংগ্রহের অনেক অসুবিধা রয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনকে নিজের প্রয়োজনে তার উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে হয়। ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশ-ই ব্রিটেন ও আমেরিকার বাজার থেকে ঐসব যন্ত্রপাতি সংগ্রহের চেষ্টা করবে। এই প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারত তার চাহিদা মতো কোটা পাবে কি না সন্দেহ। ভারতের অবস্থা সুরক্ষিত করতে হলে যথাসম্ভব যন্ত্রপাতির জন্য দাবি পেশ করতে পারে এবং অগ্রাধিকার পেতে পারে। অগ্রাধিকারের ব্যাপারে বেশি অসুবিধা নাও হতে পারে। আমি নিশ্চিত, এই যুদ্ধে ভারতের অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সম্রাটের সরকার আমাদের দাবিকে অগ্রাধিকার দেবেন। কিন্তু ফরমাশ-পত্র তৈরি এবং উৎপাদকদের কাছে অর্ডার পেশ অসুবিধা হতে পারে।

প্রথমত: বিদ্যুৎ মূলত: প্রাদেশিক বিষয়। যন্ত্রপাতির চাহিদার হিসাব প্রাদেশিক সরকারের থেকে আসতে হবে। কেন্দ্র শুধু এগুলি সংহত করতে পারে।

দ্বিতীয়ত: যন্ত্রপাতির ধরণ নির্ভর করবে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে কি হবে তার ওপর, যেমন জল, বাষ্প বা তৈল।

তৃতীয় অসুবিধা, যুদ্ধের পর উদ্ভূত সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে তা অজ্ঞাত। ভবিষ্যৎ সরকার কি বর্তমান সরকারের অনুসৃত পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করবে? ভবিষ্যৎ সরকার কি বর্তমান সরকারের পরিকল্পনা কর্মসূচির নির্ধারিত করের স্তর বজায় রাখবে? এইসব প্রশ্নে কেউ নিশ্চিত থাকতে পারে না। যাই হোক, যুদ্ধের শেষে বিদ্যুতায়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য এই সরকার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হবে না বলে মনে হয়।

নীতি বিষয়ক কমিটির কাজ

আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করছি অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বলে। কিন্তু আমি জানি, আপনারা বুঝবেন যে এটাই কমিটির প্রাথমিক কাজ নয়। এটি একটি নীতি বিষয়ক কমিটি এবং প্রাথমিক কাজ হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিচালনা ও বণ্টন এবং ভবিষ্যৎ ভারত সরকারের কাছে আমাদের বিচারে যা নীতি, সে সম্বন্ধে সুপারিশ করা। আজ আমরা নীতি কমিটির সভার সুযোগ পেয়ে প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে এই সভায় তাদের প্রতিনিধিদের মতামত জ্ঞাপনের জন্য যোগদানের অনুরোধ করতে পারছি।

জনসাধারণের বিষয়রূপে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কাজ নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে চলেছে। ভারত সরকার ১৯০৫ সালে প্রথম এ বিষয়ে সচেতন হয়, সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে এক বিজ্ঞপ্তি পাঠায়। তারপর প্রাদেশিক সরকারগুলি ও কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তারপর ১৯১৮ সালে ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর এবং পরে বছর ইন্ডিয়ান যুদ্ধোপকরণ বোর্ডের রিপোর্টে বিদ্যুতের ওপর জোর দেওয়ার পর হঠাৎ সরকার সজাগ হয়। শিল্প কমিশন Hydrographic Survey of India-র প্রয়োজনীয়তা বিচারে ব্যক্তিগত উদ্যোগের চেয়ে ভারত সরকারকে উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করেন। ভারত সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করে এবং শ্রী জি. টি. বারলো, সি. আই. ই, তদানীন্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার, সেচ দফতর, যুক্তপ্রদেশ, হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের চিফ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করে, তাঁর সহযোগী করা হয় শ্রী জে. এম. মিয়ারস, এম. আই. সি. ই, ভারত সরকারের বিদ্যুৎ বিষয়ক পরামর্শদাতাকে। কিছুদিন পরই মিঃ বারলো'র মৃত্যু হয়। তাঁর কাজ চালিয়ে নিয়ে যান মিঃ মিয়ারস তিনি ১৯১৯-২২-এ তিনটি চমৎকার রিপোর্টে সব কটি প্রদেশের বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করেন পাঁচটি বিষয়ে :

১) ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত জল বিদ্যুৎ

২) নির্মীয়মান প্রকল্প সমূহ

৩) সমীক্ষাকৃত এলাকা, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নয়

৪) জানা স্থানসমূহ যেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত পরীক্ষা কাম্য

৫) সমীক্ষা না করা এলাকা ও স্থান

বিদ্যুৎ : প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়

দুর্ভাগ্যবশত: ১৯১৯-এর 'ভারত শাসন আইন পরিবর্তনের পর বিদ্যুৎ প্রদেশের তালিকাভুক্ত বিষয় হয়। এই আইন দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান আইনের মতো কেন্দ্রকে নিজ বিবেচনা অনুযায়ী ইচ্ছামতো স্বকীয় প্রশাসন বহির্ভূত বিষয়ে রাজস্ব ব্যয়ের অনুমতি দেয় নি। ফলে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভের জন্য কেন্দ্রের পক্ষে অর্থ ব্যয় করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায়ের জন্য একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বড় কাজ বন্ধ হল।

ভারতে বিদ্যুতের উন্নয়ন সম্বন্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও আধিকারিক কেন্দ্রে নেই, ফলে কেন্দ্রের হাতে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদন, বণ্টন ও পরিচালনা সম্পর্কে কোনও তথ্য নেই।

সেজন্য আমি আনন্দিত যে, ভারতে বিদ্যুৎ বিষয়ক প্রশ্নটি গভীরভাবে পর্যালোচনার জন্য এসেছে। আমি যতটা বুঝেছি, এই কমিটি যেসব বিচার করতে পারে তা হল :

১) বিদ্যুৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকবে না সরকারি মালিকানাধীন হবে?

২) ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকলে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য কিছু শর্ত কি আরোপ করা হবে?

৩) বিদ্যুতের উন্নয়নের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার, না প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে?

৪) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দায়িত্ব থাকলে অপচয় বন্ধে ও সস্তায় যথেষ্ট বিদ্যুৎ যোগাতে কার্যকরী প্রশাসন পদ্ধতি কি হবে?

৫) প্রদেশের দায়িত্বে থাকলে, প্রাদেশিক প্রশাসনের কী কোনও আন্ত: প্রাদেশিক বোর্ডের অধীন এবং পরামর্শদান ও সংহতি স্থাপনের ক্ষমতা থাকবে সেই বোর্ডের?

তিনটি বিবেচ্য বিষয়

সব কটি প্রশ্নের দুটি দিক রয়েছে। প্রত্যেক দিকের পক্ষে প্রবক্তা রয়েছেন। এই পর্যায়ে আমি আমার মত প্রকাশ করতে চাই না। আমার মন মুক্ত, তবে চিন্তাশূন্য নয়। উপসংহারে আমার জন্য আমি বলতে চাই, বিদ্যুৎ উন্নয়নের অপেক্ষাকৃত সঠিক পথ অন্বেষণে তিনটি বিষয় বিবেচনার কথা মনে রাখতে হবে :

১) দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি শুধু সস্তায় নয়, সবচেয়ে সস্তায় বিদ্যুৎ দিতে পারে,

২) দুটির মধ্যে কোন্‌টি যথেষ্ট বিদ্যুতই নয়, অঢেল বিদ্যুৎ দিতে পারে,

৩) দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভারতকে বিদ্যুৎ শক্তিকে রেল-এর মতো সম গুরুত্বপূর্ণ স্তরে শক্তিসম্পন্ন করতে পারে, অর্থাৎ লাভের কথা না ভেবে একটা সংস্থা পত্তনের কথা ভাবা যেতে পারে।

আমি এইসব বিষয়ের ওপর জোর দিচ্ছি, কারণ ভারতের প্রয়োজন সস্তায় অঢেল বিদ্যুৎ সরবরাহ।

এগুলি প্রাথমিক প্রশ্ন। আপনাদের অনেকের মনে দ্বিধা থাকতে পারে এই কারণে যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংবিধান পরিবর্তনের প্রশ্ন রয়েছে। আমার নিজের কথা বলতে পারি, কোনও দ্বিধা নেই আমার। সাংবিধানিক প্রশ্নে একটা মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা সংবিধান সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না। শুধু ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করব। সাংবিধানিক চরিত্রের এই যুক্তিতে সে বিষয়ে পর্যালোচনা করা থেকে আমাদের বিরত করার প্রশ্ন নেই। আমি নিশ্চিত যে, বিষয়টির প্রতি সুবিচার করতে হলে আমরা এটা এড়াতে পারি না।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ

এসব প্রাথমিক প্রশ্ন ছাড়াও আরও অনেক গৌণ প্রশ্ন রয়েছে। বিদ্যুতায়ন সফল করতে হলে এসব আমাদের পর্যালোচনা বহির্ভূত রাখলে চলবে না। এগুলি হল :

১) কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা দরকার কি না, যার দায়িত্ব হবে শক্তির উৎস উপাদন, যেমন কয়লা, পেট্রোল, মদ ও বহমান জল ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা সমীক্ষা করা এবং শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পথ নির্ণয় করা।

২) প্রাপ্ত বিদ্যুৎ সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎ শক্তির উৎস ও যন্ত্রপাতির মধ্যে সম্পর্কের সমস্যা পর্যালোচনা করার জন্য কেন্দ্রে এক বিদ্যুৎ শক্তি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা দরকার কিনা।

৩) বিদ্যুৎ প্রযুক্তি সম্বন্ধে ভারতীয়দের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পন্থা নির্ণয় করা দরকার কি না, যার দ্বারা বিদ্যুৎ প্রকল্প ও যন্ত্রপাতির তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতির জন্য ভারতে একটা দক্ষ কর্মী বাহিনী বহাল থাকবে।

শেষ করার আগে ভারতে বিদ্যুৎ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার পেছনে গুরুত্ব ও চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে চাই। এই বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের এর গুরুত্ব ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকা দরকার। আমার সঙ্গে যদি আপনারা একমত হন, তাহলে আমার অনুরোধ, আপনাদের নিজেদের কাছে প্রশ্ন করুন, ' ভারতে সস্তায় ও অঢেল বিদ্যুৎ আপনারা চান কেন?' এর উত্তর সুলভ ও অঢেল বিদ্যুৎ ছাড়া ভারতে শিল্পায়নের চেষ্টা সফল হতে পারে না। এই উত্তর এই কমিটির কাজের তাৎপর্য সম্বন্ধে একটা দিক তুলে ধরে।

আরেকটা প্রশ্ন, শিল্পায়ন দরকার কেন? এবং পুরো তাৎপর্য আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কারণ, এর উত্তর হল, ভারতের মানুষকে চিরন্তন দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করার সুনিশ্চিত পথ হিসাবে, আমরা শিল্পায়ন চাই। সুতরাং ভারতে শিল্পায়নকে আঁকড়ে ধরতে হবে।

ভারতের শিল্পায়ন

ভারতের শিল্পায়নের কথা বহু বছর ধরে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু শিল্পায়ন রূপায়নে তেমন প্রয়াস চোখে পড়ে না। এখনও অনেকে শুধু মুখেই শিল্পায়নের কথা বলেন। অন্যেরা একে পাগলামো না বললেও বদখেয়াল বলে গণ্য করেন। অনেক লোক আছেন, যারা অক্লান্তভাবে প্রচার করেন যে ভারত কৃষিপ্রধান দেশ, সুতরাং শ্রেষ্ঠ পথ হল কৃষির উন্নয়ন, শিল্পায়ন নয়। এটা কাউকে বোঝানোর দরকার নেই যে, ভারত কৃষি প্রধান দেশ, সবাই তা জানেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, খুব কম লোক-ই বুঝেন এটা কত বড় দুর্ভাগ্য। আমি জানি, এটা সহজে স্বীকৃত হবে না। এটা বড় দুর্ভাগ্য, এটা প্রমাণ করতে আর কত বড় দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে বাংলার দুর্ভিক্ষে ও ভারতের অন্যান্য স্থানে দুর্ভিক্ষে রোজ-ই কৃষিজীবী মানুষ-ই খাদ্যাভাব ও ক্রয়ক্ষমতার অভাবে অনাহার মৃত্যুর শিকার?

আমার কাছে ভারতের কৃষির ব্যর্থতার বড় প্রমান আর কিছু নেই, যখন সবাই সহজ ঘটনা দেখছে যে ভারত শুধুই খাদ্য উৎপাদন করে, কিন্তু সবার খাদ্য জোটাবার মতো উৎপাদন করতে পারে না, এটা কেন হচ্ছে। আমার মতে, ভারতের দারিদ্র্যের কারণ কৃষির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

ভারতের জনসংখ্যা প্রতি দশকে জ্যামিতিক হারে বাড়ে। এই অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধির মোকাবিলায় যে চাষযোগ্য জমি তা সীমিত তো বটেই, তার উর্বরতা বছর বছর কমছে। ভারত সাঁড়াশির দুই দিকের মধ্যে বন্দী, এর একদিকে অবাধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে জমির ক্রমাগত উর্বরতা হ্রাস।

একটা ধস শুরু হয়েছে

এর ফল হয়েছে, একটা দশকের শেষে জনসংখ্যা ও উৎপাদনের মধ্যে এক নেতিমূলক ভারসাম্য এসে জীবনমানের ক্রমাবনতি ঘটাচ্ছে। প্রতি দশকেই এই নেতিবাচক ধারা গভীর হয়ে ভারতকে উত্তরাধিকারগতভাবে গরিব আরও গরিব ও দুরারোগ্য গরিবির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। একটা ধস শুরু হয়েছে। আমার স্থির ধারণা, এই ক্ষয় শুধু কৃষিমেলা করে, পশু প্রদর্শনী বা ভাল সারের পক্ষে প্রচার দিয়ে রোধ করা যাবে না। এটা রোধ করা সম্ভব হবে তখন-ই যখন কৃষি লাভজনক হবে। শিল্পায়নের পক্ষে দৃঢ় পদক্ষেপ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে ভারতের কৃষিকে লাভজনক করার পথ বন্ধ। কারণ, শিল্পায়ন দ্বারাই কৃষিতে নিয়োজিত বাড়তি মানুষকে অন্য লাভজনক পেশায় স্থানান্তরিত করা এবং জমির ওপর চাপ কমানো সম্ভব। মোদ্দা কথা, আমাদের পুনর্গঠন কমিটি কর্মসূচি ও উদ্দেশ্যে নিঃসন্দেহে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সমগোত্রীয় কমিটির ধাঁচে গঠিত, জার্মানদের দ্বারা শিল্প সংগঠন ধ্বংসের পরই ঐ কমিটির উদ্ভব। পুনর্গঠনের সমস্যা ভিন্ন দেশে ভিন্ন হতে বাধ্য। কিছু দেশে পুনর্গঠনের সমস্যা হল ভেঙ্গে পড়া প্রকল্প ও যন্ত্রপাতির মেরামত করা।

ভারতে সমস্যার প্রকৃতি

কিছু দেশের পুনর্গঠনের সমস্যা, যুদ্ধে বিধ্বস্ত প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের সমস্যা। ভারতে পুনর্গঠনের সমস্যায় যুদ্ধে যুক্ত দেশগুলির যাবতীয় সমস্যার পর্যালোচনা করা দরকার।

এক-ই সাথে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ভারতে পুনর্গঠনের সমস্যা অন্য দেশের পুনর্গঠন সমস্যার থেকে পৃথক। অন্যান্য দেশে পুনর্গঠনের সমস্যা হল ইতিমধ্যে চালু শিল্পের পুনর্বাস সমস্যা।

আমি যেভাবে ভারতের পুনর্গঠনের সমস্যা দেখি, তা হল শিল্পের পুনর্বাসন ও শিল্পায়নের চেয়ে শিল্পায়ন মারফত দারিদ্র্য নিরসনের সমস্যা।

সেজন্য আমি আশা করব, কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতিযোগিতামূলক দাবির বিষয় গণ্য না করে সবাই মানবজীবনের স্বার্থে বিদ্যুৎ সমস্যাকে দেশনেতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করবেন।

পুনর্গঠনের অতীত অভিজ্ঞতা দুঃখজনক হলেও আমি হতাশাজনক সুর দিয়ে শেষ করতে চাই না। প্রয়োজনীয়তা যেমন আবিষ্কারের পথ করে দেয় অথবা ঈশ্বর বিরোধিতা বিশ্বাসের পথ করে দেয়, সদৃশভাবে যুদ্ধ পুনর্নির্মানের ইচ্ছা জোরদার

করে। এর দুঃখের দিক হল, যুদ্ধের সূত্রে যার জন্ম, শক্তির সাথে সাথে তার মৃত্যু। বোর্ড অব্ মিউনিশন যেসব পুনর্নির্মান প্রকল্প রচনা করে, তার এই ধরনের অকালমৃত্যু হয়। আমার বিশ্বাস, এবার পুনর্নির্মান পরিকল্পনা একইভাবে মিলিয়ে যাবে না। এই যুদ্ধে আমাদের বাস্তবতার তীক্ষ্ণ বোধ, যা ভারতের দারিদ্র্যে নিহিত, গতযুদ্ধের দেশনায়কদের এটা ছিল না।

* * * * *

*তফশিল ছাত্র ও অপসৃত ভারতীয়দের সাহায্যদান : স্থায়ী অর্থ বিষয়ক কমিটি কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদিত

ভারত সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক সদস্য, স্যার জেরেসি রেইসম্যানের সভাপতিত্বে ২০ নভেম্বর ১৯৪৩ নতুনদিল্লিতে স্ট্যান্ডিং ফিনানস কমিটির সভায় দুটি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে পাঠরত তফশিল ছাত্রদের জন্য বৃত্তি এবং যুদ্ধ থেকে অপসৃত ভারতীয়দের জন্য আর্থিক সাহায্য দান। প্রথম প্রস্তাবে ব্যয় হবে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকা, ৫ বছর এটা দেওয়া হবে। দ্বিতীয়টির জন্য ১৯৪৪-৪৫ সালে ব্যয় হবে ২২৫ লক্ষ টাকা।

ছাত্রবৃত্তি : প্রস্তাবে বলা হয়েছে, তফশিল জাতভুক্ত উচ্চ বিদ্যালয়ের স্তরের ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিদানে বছরে ৩ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে, ৫ বছর। বৃত্তি দেওয়া হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় রত ভারতে ও ভারতের বাইরের ছাত্রদের। কমিটি প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।

□ □ □

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৪৩। পৃ: ৩৩৭

২৩

*শ্রমিক সদস্যের ঝরিয়া কয়লা খনি অঞ্চল পরিদর্শন

মাননীয় শ্রমিক সদস্য ড. বি. আর. আম্বেদকর, শ্রমবিভাগের সচিব মি: এইচ. সি. প্রায়র, এবং শ্রী আর. এস. নিম্বকার, ভারত সরকার শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক পরমার্শ দাতা, সম্প্রতি কয়লা খনিতে কাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ধানবাদ যান।

ধানবাদে থাকার সময়ে এঁরা মালিক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কয়লার উৎপাদনবৃদ্ধি এবং কয়লাখনিতে শ্রমিকের অভাবের বিষয়ে আলোচনা করেন।

মাটির নিচে মহিলা শ্রমিকদের কাজ করার ব্যবস্থা পুনর্বহাল হওয়ার ফলে কয়লাখনি শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ও কল্যাণকর্ম বিষয়টি বাড়তি গুরুত্ব পায়। এটা জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে শ্রমিকদের খাদ্য ও অন্যান্য সুবিধাদানের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবে। বাংলায় খাদ্য সরবরাহের অপ্রতুলতা এবং বাংলা ও বিহারে পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবজনিত সমস্যার বিষয় কেন্দ্রীয় শ্রমবিভাগ কিছুদিন ধরে বিবেচনা করছে।

প্রশ্নটি সম্প্রতি নূতনদিল্লিতে অনুষ্ঠিত শ্রম সম্মেলনে আলোচিত হয় এবং জানা যায় শ্রমিক সদস্যরা ধানবাদ থাকাকালে শিল্প সংশ্লিষ্ট মহলের সঙ্গে এ নিয়ে আরও আলোচনা হয়েছে।

□ □ □

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৪৩।পৃ: ৩৩৬

২৪

*শ্রমিক সদস্যের কয়লাখনি পরিদর্শন

খনি শ্রমিকদের বাড়ি ও কাজের পরিস্থিতি পরিদর্শন

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর, শ্রমিক সদস্য, ভারত সরকার, বৃহস্পতিবার ৯ ডিসেম্বর ধানবাদ-এ পৌছান কয়লাখনিতে কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন শ্রী এস. এন. মজুমদার, লেবার কমিশনার, বিহার, ডব্লু. এইচ কিরবি, চিফ ইনসপেক্টর অব্ মাইনস, এবং বিভিন্ন মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন ও খনি মালিকরা। এইচ. সি. প্রায়র, সচিব শ্রমবিভাগ এবং আর. এস. নিম্বকার, শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক পরামর্শসভা, ভারত সরকার, ঐদিন আগেই পৌছেছিলেন। পৌছাবার অব্যবহিত পরেই শ্রমিক সদস্য, চিফ ইনসপেক্টর অব্ মাইনস, কয়লা খনি মালিক, মি: প্রায়র, শ্রী নিম্বকারের সঙ্গে ভুলানবাড়ারি খনিতে যান। ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের প্রতিনিধি শ্রী করনিক, এ. আই. টি. ইউ. সির প্রতিনিধি শ্রীমতী শান্তা ভাল রাও ঐ দলের সঙ্গে যান শ্রমিকদের কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। কর্মসূচিতে মাটির ওপর ও ভূগর্ভের নিচে কাজের অবস্থা পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভূগর্ভের ৪০০ ফুট নিচে

সেনাবাহিনীর টিনের টুপির মতো দেখতে নিরাপত্তা টুপি পরে শ্রমিক সদস্য ও অন্যান্যরা দুই দলে ভাগ হয়ে ৪০০ ফুট নিচে শ্রমিকদের কয়লা খনন দেখেন। খনিতে মহিলাকর্মী নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ফলে সেখানে কয়েকজন মহিলাও কাজ করছিলেন। শ্রমিক সদস্য, শ্রী নিম্বকার ও অন্যেরা শ্রমিকদের মজুরি ও আয় সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেন। আর এক পর্বে, ভুলানবাড়ারি খনি পরিদর্শনকালে

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, জানুয়ারি ১, ১৯৪৪।পৃ: ৩৯-৪০

এই দল গুদামজাত করার কাজও দেখেন। ভূতলে কাজ পরিদর্শনের সময়ে শ্রমিকদের সাথে তাদের আয় ও মজুরি নিয়ে ড. আম্বেদকরের কথাবার্তা হয়।

এরপর শ্রমিক সদস্য যান খনি সংলগ্ন শ্রমিকদের আবাসে। 'হাম অন্দর আ সাকতে হায়' অর্থাৎ আমি কি ভেতরে পারি, নই বিনয়ী বাক্য দিয়ে অনুমতি নিয়ে তিনি শ্রমিকদের বাড়ি ঢোকেন, আসবাব পত্র ও অন্য জিনিসপত্র দেখে চারদিকের অবাধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর দলটিকে নিয়ে যাওয়া হয় মালিকদের পরিচালিত পরিচ্ছন্ন, সুবন্দোবস্তযুক্ত হাসপাতালে, সেখানে তিনি কয়েকজন রোগীর সাথে আলাপ করেন। মহিলাদের জন্য একটা বিশেষ সংরক্ষিত ওয়ার্ডেও তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রমিকদের আবাসন

দলটি তারপর যায় দিগ্বাড়ি কোলিয়ারিতে, সেখানে কয়লা উত্তোলনের আধুনিক প্রকল্প ও যন্ত্রপাতি দেখেন। এখানে শ্রমিক সদস্য শ্রমিকদের আবাসনে প্রায় এক ঘণ্টা থাকেন, মালিকদের তৈরি বিভিন্ন ধরনের বাড়ি দেখেন। কয়লাখনি শ্রমিকদের নিয়োগের মাধ্যমে, পদ্ধতি নিয়ে উৎসুক্য দেখান।

ঐ দিনের কর্মসূচিতে তিসরা খনি পরিদর্শন ছিল, সেখানকার শ্রমিকদের মজুরির হার পরীক্ষা দিয়ে পরিদর্শন শুরু হয়। পরিদর্শক দল খনির ভূতল উপরে আসেন তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শ্রমিকরা তখন কেরোসিনের নিরাপত্তা আলো, কোদাল, গাঁইতি কাঁধে নিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার তোড়জোর করছিল। শ্রমিক সদস্য শ্রমিকদের ও তাদের বাড়ির মেয়েদের রাতের খাবার তৈরি পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়। শ্রমিকদের খাদ্যের ধরন ও আয়তন সম্বন্ধে জানার কৌতূহল ছিল তাঁর। তিসরাতে তিনি পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের খাদে কাজ করা দেখেন।

রানিগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চল পরিদর্শন

ড. বি. আর. আম্বেদকর ও তাঁর দল রানিগঞ্জের কয়েকটি কয়লাখনিতে কয়লা উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রমিকদের কাজ করার অবস্থা পরীক্ষা করেন শুক্রবার সারাদিন। পরিদর্শন শুরু হয় শিবা কোলিয়ারির মালিকদের পরিচালিত শ্রমিকদের হাসপাতাল ও কল্যাণকর্ম পরীক্ষা করা দিয়ে। আধুনিক এক্স-রে ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি সম্পন্ন একটি একতলা চতুর্ভুজাকারের সাদা বাড়ির হাসপাতাল তাঁদের দেখানো হয়। জানা যায় যে ঐ হাসপাতালটি শীঘ্রই চালু হবে।

ঐদিনই পরে শ্রমিক সদস্যকে একটি কুষ্ঠ কল্যাণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, প্রাথমিক স্তরে কুষ্ঠের চিকিৎসা হয় সেখানে। ডঃ আম্বেদকর এক ছোট বাড়িতেও যান, সেখানে তিনি শ্রমিকদের শীর্ণ অসুস্থ বাচ্চাদের আয়াদের দিয়ে পরিচর্যার ব্যবস্থা দেখেন। এইসব কল্যাণমূলক কাজকর্মের তিনি প্রশস্তি করেন এবং জানতে চান এই বাচ্চারা এত শীর্ণকায় কেন। তাঁকে বলা হয় এটা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবজনিত।

খনি শ্রমিকদের শিশুদের জন্য বিদ্যালয়

সীতাপুর কোলিয়ারি যাওয়ার সময়ে পথের ধারে একটা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন ড. আম্বেদকর। শ্রমিকদের সন্তানশিশুরা ওঁকে মাল্যদান করে। তিনি ৭ বছর বয়স্ক এক শিশুর সাথে তার পরিবারের আয় নিয়ে ভাঙ্গা অথচ বোধগম্য ইংরাজিতে কথা বলেন। দিনের প্রথমদিকে এই প্রতিনিধিদল সোদপুর গুদাম প্রকল্প দেখেন—এক বিশাল যান্ত্রিক কাঠামোয় প্রতি ঘণ্টায় ২০০ টিন বালি কাছের দামোদর অববাহিকা থেকে আনা হচ্ছে এবং স্বয়ংক্রিয় দড়ি রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে খনিতে।

সীতাপুর কয়লাখনির ভূগর্ভে কাজ করার অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রতিনিধিরা ১০০০ ফুট নিচে নেমে আধুনিক কয়লাকাটা যন্ত্র দিয়ে কয়লা উত্তোলন দেখেন। ধানবাদে ফেরার পথে শ্রমিক সদস্য বেগুনিয়া কোলিয়ারির শ্রমিকদের এক কামরা 'ধাওড়া' পরিদর্শন করেন। ঘরগুলি অন্ধকার এবং একটা ঘরে এক বাছুর ঘর সংলগ্ন বারান্দায় খাস খাচ্ছে, ঐ অপরিসর ঘরে সেও অন্যদের সাথে রয়েছে। ড. আম্বেদকর ঘরের বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। শ্রমিকরা জানায়, তারা বাড়ির জন্য পর্যাপ্ত পরিমানে কয়লা পায় বিনা পয়সায়। শ্রমিকদের খাদ্য পোশাক ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও তিনি খোঁজ খবর নেন।

ধানবাদে শ্রমিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা

কয়লার বর্তমান ঘাটতি ও তার নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা হয় শনিবার ধানবাদ-এ এক সম্মেলনে। এতে যোগ দেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাংলা ও বিহার সরকার, তিনটি মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন এবং শ্রমিকদের মুখপাত্র। শ্রমিক সদস্য মাননীয় ড. আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন।

সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি এই সম্মেললকে ত্রিপাক্ষিক শ্রমিক সম্মেলনগুলির সাথে তুলনা করেন, যেখানে শিল্প শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। ভারতের শিল্প ও যুদ্ধের স্বার্থে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়ে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, মালিক ও শ্রমিক দুই পক্ষের প্রতিনিধিরাই এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পরামর্শ দিতে পারবেন।

শ্রমিক সংখ্যা হ্রাসের কারণ হয়ত অত্যন্ত ভাল ফসল, কারণ 'আরও খাদ্য উৎপাদনের' প্রচারের জন্য জমিতে বেশি লোক লাগে, সামরিক কাজ-এ যাওয়ার প্রতিযোগিতাও শ্রমিক অভাবের কারণ। পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা হয় এবং মালিক প্রতিনিধিরা আরও বেশি পেট্রল ও টায়ার দাবি করেন যাতে তারা খনি সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে বেশি শ্রমিক আনতে পারে।

কিছুকাল পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমিকদের (নারী পুরুষ) পর্যাপ্ত রেশন দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, আলোচ্যসূচির এটাই হয় পরবর্তী বিষয়। আলোচনাকাল বিহার সরকারের প্রস্তাবিত রেশন প্রথা চালুর সম্ভাবনা বিষয়ে উল্লেখিত হয় এবং ঠিক হয় যে এটা চালু হলে কয়লাখনির জন্য প্রবর্তিত প্রকল্প পুনর্বিবেচিত হবে।

কয়লা শ্রমিকদের সরবরাহের প্রকল্পে শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীলদের খাদ্য সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত। পুরো সপ্তাহের রেশন পেতে হলে ন্যূনপক্ষে ৫ দিন কাজ করা বাধ্যতামূলক করা ছাড়াও যারা কমদিন কাজ করবে তাদের পর্যাপ্ত সরবরাহের কথাও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। এটা সর্বসম্মতভাবে ঠিক হয় যে, প্রথমে শ্রমিকদের টাকায় ৬ সের চাল ও এক-ই দামে প্রয়োজনীয় ডাল দেওয়া হবে।

শ্রমিকদের নুন, সরষের তেল, সাধারণ মানের কাপড় ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প, সম্মেলন তা বিচার করে। এর উদ্দেশ্য মাইনিং এ্যাসোসিয়েশর হাতে এই সরবরাহের দায়িত্ব দান। কয়লা শ্রমিকদের কল্যাণে আর যেসব ব্যবস্থার কথা কেন্দ্রীয় সরকার সুপারিশ করেছে, তার মধ্যে অন্যতম হল একটা 'ওয়েলফেয়ার সেস' ধার্য করে তহবিল গঠন, এর থেকে কল্যাণ কর্মসূচির ব্যয় নির্বাহ, এবং ১০০,০০০ টনের বেশি উৎপাদন করে এমন সব কয়লাখনিতে একজন লেবার অফিসার নিয়োগ।

মজুরি বৃদ্ধি

কয়লা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে সম্মেলনের আলোচ্যসূচিতে ছিল, এবং মাইনিং এ্যাসোসিয়েশন ১৯৩৯-এর স্তরের থেকে আরও মজুরি বৃদ্ধিতে রাজি ছিল। এর ফলে যুদ্ধপূর্ব সময় থেকে সাময়িক যুদ্ধকালীন মোট ৫০% বৃদ্ধি হয়। তবে তাঁদের ভয়, কয়লাখনি অঞ্চলে ভোগ্যপণ্য পাওয়া না গেলে এই বৃদ্ধির বেশিটাই নষ্ট হবে।

আলোচিত অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে কয়লাখনিতে মজুরি প্রদান আইন প্রয়োগের সম্ভাবনা এবং কয়লাশিল্পে প্রয়োগের অসুবিধা নিয়ে কথা হয়। অতিরিক্ত লাভের কর-এর ক্ষেত্রে সাহায্য, যন্ত্রপাতি ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ আগে শিল্পের তরফ নেবে।

২৫

*ভারতে শ্রমিকদের কল্যাণ-কর্মসূচি

জানুয়ারি ২৫ ও ২৬ লখনউ-এ অনুষ্ঠিত স্থায়ী শ্রমিক সমিতির চতুর্থ সভায় শিল্প শ্রমিকদের মাগগিভাতা, কাজে অনুপস্থিতি, ক্যানটিন ও সার্ভিস রেকর্ড ঠিক রাখার বিষয় আলোচিত হয়। সভা অনুষ্ঠিত হয় কাউনসিল হাউস-এ, মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর, শ্রমিক সদস্য, ভারত সরকার, সভাপতিত্ব করেন। শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংগঠনের পাঁচজন, প্রাদেশিক সরকারগুলির পাঁচজন করে এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের তিনজন প্রতিনিধি সভায় যোগ দেন।

ড. আম্বেদকরের ভাষণ

তাঁর বক্তৃতায় সূচনায় সভাপতি স্থায়ী শ্রমিক সমিতির আগের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার উল্লেখ করেন এবং বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরে কৃত চুক্তিমতো ন্যূনতম মজুরি আইন প্রবর্তন করবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য দফতরের প্রবর্তিত চুক্তির অনুরূপ ধারা প্রয়োগের বিষয়টিও বিবেচনা করা হবে। সভাপতি আরও ঘোষণা করেন, শ্রম সম্মেলনের গত সাধারণ অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার মজুরি, আয় ও শ্রমিকদের কাজের পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য একটি শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি (Labour Investigation Committee) নিয়োগ করেছে। অনুসন্ধান কাজ কৃষি শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রেও প্রসারিত করার বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক হবে।

কমিটি এরপর সময় ও প্রয়োজন মতো উদ্ভূত ভারতে বিধিবদ্ধ মজুরি নিয়ন্ত্রণ (Statutory Wage Control) নিয়ে আলোচনা করে। দেখা যায় উপস্থিত প্রতিনিধিরা মজুরি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা প্রাদেশিক বিশেষ শিল্পভিত্তিক করার পক্ষে মত প্রকাশ করে।

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ১৫১-৫২

কর্মবিনিয়োগ প্রকল্প ও এবিষয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলি কাজের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়ার পর আলোচনায় কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের মডেল প্রভিডেন্ড ফান্ড বিধি ও এই তহবিল পরিচালনা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের এই তহবিলে টাকা দেওয়া ও অগ্রিম নেওয়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

মহার্ঘ ভাতা

কমিটি মহার্ঘভাতার ওপর গ্রেগরি কমিটির রিপোর্টও বিবেচনা করে, ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্মেলনের সভাপতি এই কমিটি গঠন করেন। এই রিপোর্ট থেকে উত্থিত আর যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তা হল, মহার্ঘ ভাতা নির্ধারণে সাধারণ নীতি, এই নীতির ধারা, বিভিন্ন শিল্প ও অঞ্চলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হার এবং জীবনসূচির বৃদ্ধি বা হ্রাসের সাথে মহার্ঘ ভাতার সম্বন্ধ। কমিটি মেনে নেয় যে, মহার্ঘভাতা দেওয়ার সাধারণ নীতিসমূহ যতটা সম্ভব সরকার-ই নির্ধারণ করবে। উপ-সমিতির রিপোর্ট মহার্ঘভাতার নীতি নির্ধারণে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ হবে মেনে নিয়ে কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, বিভিন্ন প্রতিনিধিদের মতামত প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে এই রিপোর্ট ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

কাজে কামাই

শিল্প সংস্থাগুলিতে বিশেষ করে যুদ্ধসামগ্রী উৎপাদনে রত সংস্থায় শ্রমিকদের কামাই করা নিয়ে একটা নমুনা সমীক্ষার খসড়া আলোচ্যসূচিতে ছিল। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য, সমস্যার একটা বাস্তব সমীক্ষা নেওয়া, এবং অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, ছুটি, সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ, যানবাহনের সমস্যা, দেরীতে কাজে আসা ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান করা জানা গেছে। প্রকল্পটি কিছু সংশোধনসহ গৃহীত হয়।

অধিবেশনের প্রথমে কমিটি শিল্পসংস্থায় শ্রমিকদের জন্য রান্না করা খাবারের ক্যানটিন খোলার বিষয় পর্যালোচনা করে। এটা প্রকাশ পায় যে, বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বহু ক্যানটিন চলছে এবং শ্রমিকদের মধ্যে জনপ্রিয় হচ্ছে।

* * * * *

*কয়লাখনি শ্রমিকদের কল্যাণার্থে অধ্যাদেশ, ১৯৪৪

'দ্য কোলমাইনস লেবার ওয়েলফেয়ার অধ্যাদেশ ১৯৪৪' আজ জারি হল, কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজের জন্য একটা তহবিল গঠন

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, ফেব্রুয়ারি ১৫, ১৯৪৪। পৃঃ ১৫৩-৫৪

করা হল। ৩১ জানুয়ারিতে ভারত সরকারের শ্রম দফতরে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই অধ্যাদেশটি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে প্রসারিত হবে এবং এখন-ই কার্যকরী হবে। আরও বলা হয় : তহবিল সৃষ্টির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ব্রিটিশ ভারতের যে কোনও স্থান থেকে রেলে প্রেরিত কয়লা ও কাঁচা কয়লার ওপর সেস ধার্য করবে, পরামর্শদাতা কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সেস-এর হার ভারত সরকারের ঘোষপত্রে প্রকাশ করা হবে। এই শুল্ক কোনও সময়েই প্রতি টন পিছু এক আনার কম বা চার আনার বেশি হবে না। ভারত সরকারের পক্ষে শুল্ক আদায় করবে কয়লাবহনকারী রেল প্রশাসন।

অধ্যাদেশে সাধারণভাবে ব্যবস্থা আছে, সংগৃহীত শুল্কের টাকা শ্রমিক কল্যাণের কাজে 'কয়লা খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের উন্নয়নের প্রয়োজনে' ব্যয় হবে। তহবিল খরচ হবে যেসব খাতে তারও নির্দেশিকা রয়েছে। এই তহবিল শ্রমিক উন্নয়নের যেসব খাতে ব্যয় হয় তা হল, শ্রমিকদের আবাসন, জল সরবরাহ, পরিষ্কার করার সুযোগ, শ্রমিকদের শিক্ষার ও জীবনমানে উন্নয়ন, পুষ্টি, সামাজিক অবস্থার উন্নতি, মনোরঞ্জন ও যানবাহনের সুযোগ।

জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতি, রোগের প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং বর্তমান ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শ্রমিক কল্যাণের যে কোনও প্রকল্পের জন্য টাকা প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা মালিক, খনির ম্যানেজার বা এজেন্ট যাতে মঞ্জুর করে তারও ব্যবস্থা রাখা হয়। বর্তমান সংগঠনগুলি প্রয়োজনমতো শক্তিশালী করা এবং চালু কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি যাতে তহবিল থেকে সাহায্য পায় তার ব্যবস্থা রাখা হয়।

পরামর্শদাতা কমিটি

অধ্যাদেশ-এ কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি পরমার্শদাতা কমিটি গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। কয়লাখনি মালিক ও কয়লাখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সমসংখ্যক প্রতিনিধি এই কমিটিতে সদস্য থাকবেন। পরামর্শ দাতা কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য রাখতে হবে। এই কমিটি অধ্যাদেশ নির্দেশিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেবে, অধ্যাদেশ প্রয়োগ সংক্রান্ত উদ্ভূত যে কোনও বিষয়েও এই কমিটি পরামর্শ দেবে।

□ □ □

২৬

কয়লাখনির ভূ-গর্ভে মহিলাদের নিয়োগের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : মহাশয়, আমি খুশি যে আমাদের মহিলা সদস্য এই মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন দরকার মনে করেছেন। আমি আনন্দিত, কারণ এই সূত্রে সুযোগ পেয়ে গেছি এমন বিষয় ব্যাখ্যা করার, যা আমার মনের ওপর বোঝা হয়ে আছে। প্রথমেই বলতে চাই, সভা এ বিষয়ে আমার আবেগ বুঝতে সক্ষম হবে যে, আমি ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক মনে করি। আমি এতে সন্তুষ্ট নই। আমি এটাই বলছি, ভারত সরকার যে পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েছে, তাতে আমাদের দিক থেকে এটা ভুল হয় নি। আমি মনে করি, সভা আমি যে পার্থক্য করছি তা বুঝবে।

বিতর্ক শুনে আমি প্রভাবিত হয়েছি, এই কারণে যে বেশিরভাগ মাননীয় সদস্যই মানবিক দিক থেকে বক্তব্য রেখেছেন। আমার বিনম্র বিচারে তাঁরা বাস্তবতার ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। এবং এই বিতর্কে বক্তব্য রাখার সময়ে আমি পরিস্থিতির বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। আরও বলতে চাই, বিতর্কের সূত্রে এমন অনেক প্রশ্ন এসেছে যাতে মনে হয়েছে, সভার ঐসব নিয়েই সিদ্ধান্ত করা দরকার। নির্দিষ্ট ভাবেই বলি, কয়লাখনিতে প্রচলিত মজুরি নিয়ে বলা হয়েছে। কয়লাখনিতে কল্যাণ কর্মসূচির দুরবস্থা নিয়েও কথা হয়েছে, আমার পর্যালোচনায় এসব নিয়ে বলব। কিন্তু যুক্তিসঙ্গতভাবে বলছি যে, প্রস্তাবের উল্লেখিত সূচি বিচার করলে এগুলি ক্ষণস্থায়ী বিষয়, সভা এইসব বিষয়ে রায় নেওয়ার জন্য আহুত হয় নি।

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪। পৃঃ ১৩১

এই পর্যালোচনার পর প্রথম যে প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলতে চাই তা হল, কিছু মাননীয় সদস্য আমার কাছে তাঁদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, ১৯৩৯ সালে ভূ-গর্ভে মহিলাদের নিয়োগ বন্ধ করার চুক্তিতে সম্মতি দিয়েছিলেন ও চার বছরের মধ্যে প্রত্যাহার করেছিলেন, ভারত সরকার এই চুক্তি সম্বন্ধে কখনই আন্তরিক ছিল না। মহাশয়, বিষয়টি যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করার জন্য আমি কিছু বলতে চাই। সভার স্মরণ থাকতে পারে, ভারত ঐ চুক্তির আগেই ভূ-গর্ভে মহিলাদের কাজ করার নিষেধাজ্ঞা জারি করে। আমার পর্যালোচনায় যতটুকু মনে হয়, বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ওঠে ১৯২৩ সালে, ভারত সরকার ঐ সময়ে ভারতীয় খনি আইন সংশোধনের জন্য একটা বিধেয়ক নিয়ে আসে। সভাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ঐ বিধেয়কের উদ্দেশ্য ছিল সীমিত। এর উদ্দেশ্য ছিল, কয়লা খনিতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, কিন্তু বিষয়টি যখন প্রবর সমিতি কাছে যায়, কমিটির বিচারে রায় হয়, ভারত সরকার এ বিষয়ে অগ্রসর হোক এবং মহিলাদের ভু-গর্ভে কাজ করা বন্ধ করতে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনে ক্ষমতা দেওয়া হোক। প্রবর সমিতিতে ভারত সরকার এই নীতি মেনে নেয়। ভারত সরকার শুধু নীতি মেনে নেয় তা নয়, বিধি গঠন করে মহিলাদের ভূ-গর্ভে কাজ করায় নিষেধাজ্ঞা জারির জন্য আইনগত ক্ষমতা দেয়। সভা অবগত আছে যে, ভারত সরকার ভূ-গর্ভে মহিলাদের কাজ করতে প্রতি বছর মহিলা নিয়োগের সংখ্যা হ্রাসের নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহণ করে। যাই হোক, এই সভায় অনুমোদনের দু'বছর আগে ভারত সরকারের নীতির ফলে আমাদের কোনও মহিলা কর্মী খনিতে মাটির নিচে কাজ করতেন না। স্যার, এই ঘটনাটি মাননীয় প্রস্তাবক উল্লেখ করেছেন। কিন্তু দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি, তিনি মনে করেন নি, আমি বৈধভাবে এই উপসংহার আসতে পারি যে ভারত সরকার এই চুক্তির অনেক আগেই নির্দিষ্টভাবে মত পোষণ করতে যে, খনিকে মহিলাদের কাজ করা উচিত নয়, এর জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতির ছেদ টেনেছে।

যুক্তিসঙ্গত করাণ না থাকার অজুহাতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের জন্য ভারত সরকারকে দোষারোপ করা হয়েছে। এই ধরনের বক্তব্যে আমি বিস্মিত। স্যার, সভার বিচারে জন্য আমি দুটি বিষয় রাখছি এবং আমি সভার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি, এই দুটি প্রশ্ন জরুরি কিনা বিচার করুন। মহিলাদের ভূ-গর্ভে কাজ করার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার মূলত: কয়লাখনি সম্পর্কিত। এটা বিতর্কের উর্দ্ধে। আমি মাননীয় সদস্যদের বিবেচনার জন্য অনুরোধ করছি, সবদিক বিচারে কয়লা সংশ্লিষ্ট উপাদান হিসাবে গণ্য হবে কি না। শিল্পের দিক থেকে এটা জরুরি উপাদান কি না, যানবাহন, সাধারণ ব্যবহার্য পণ্য হিসাবে জরুরি কি না—সভাই তা বিচার করুন।

আমি এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলতে চাই, আমরা এমন এক জিনিস সম্বন্ধে বলছি যা আমরা ইচ্ছামতো পছন্দ করতে পারি। এ এমন এক পন্য যা খাদ্য বা অন্য পন্যের আগেই আমাদের পেতে হবে। এই প্রশ্নটি সভার বিবেচনার জন্য রাখলাম। দ্বিতীয় যে প্রশ্ন সভার সামনে রাখতে চাই সেটা হল, ভারত সরকারের পক্ষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব? অন্য অনেক মাননীয় সদস্যের মতো আমিও জানি, কয়লা স্বাভাবিক ধারায় উৎপাদিত হত। ১৯৪৩ সালে, অথবা ১৯৪৪ সালে উৎপাদন না হতে পারে, কিন্তু ১৯৪৫-এ উৎপাদন হতে পারে। কিন্তু সভার সামনে এই প্রশ্ন আমি রাখতে চাই : এটা কি এমন এক ঘটনা, যেক্ষেত্রে আমরা অপেক্ষা করতে পারি? এই ঘটনা কি এমন যে আমরা প্রাকৃতিক ধারা অনুযায়ী ঘটনার জন্য অপেক্ষা করতে পারি? স্যার, আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে এটা এমন অনেক ঘটনার অন্যতম অত্যন্ত জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ যেক্ষেত্রে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এবং যে সরকার পরিস্থিতি ঠিক করতে ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম, সে সরকার পদবাচ্য নয়। সুতরাং আমরা যেমন ভুলে না যাই, এক জরুরি বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি, এবং মাটির নিচে মহিলাদের কাজ করার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সরকারের পক্ষে তুচ্ছ বা উদ্দেশ্যহীন কাজ, ঘটনার গুরুত্ব ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজটি যুক্তিযুক্ত। সুতরাং, মহাশয়, জরুরি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের কাজ বিচার্য। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব, এই দুই পরিস্থিতি বিচার করে সরকারের কাজ বিচার করুন। সরকার কি করণীয় দায়িত্ব সম্পন্ন করতে ব্যর্থ? এমন কাজ কি সরকার করেছে যা অপ্রয়োজনীয়? আমার কথা হল, যে দুটি পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেছি, সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পদক্ষেপ সঠিক।

আমার বন্ধু মাননীয় শ্রী যোশি বলেছেন, এই চুক্তি না ভাঙলেও চলত। আমি মানছি যে অন্য চুক্তিগুলির মতোই এতে সাময়িক আত্ম-বরখাস্তের ব্যবস্থা নেই। কিন্তু আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, যে কোনও জাত্ বিশেষ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বিধি বা চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকারী। আন্তর্জাতিক আইনে সেটাই প্রচলিত নীতি। সানন্দে বলছি, জেনেভায় ১৯৪০-এ পরিচালকদের সভায় এটাই ছিল স্বীকৃতি মত। স্যার, আমরা যে ব্যবস্থা নিয়েছি তা কি এড়ানো সম্ভব ছিল? আমি সভায় বিস্তারিতভাবে সেই পরিস্থিতির বিবরণ দিতে চাই যার পরিণতিতে সরকারকে এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, কয়লার ঘাটতি হয় শ্রমিকের অভাবে। আমার ধারণা এই পরিস্থিতি বিতর্কের উর্দ্ধে। এখন স্যার সরকারের পর্যালোচনায় শ্রমিকের অভাবের পেছনে তিনটি কারণের কথা রয়েছে। সর্বপ্রথম হচ্ছে, ভারত সরকার আরও খাদ্য উৎপাদন করার প্রচারাভিযান চালিয়েছে। সামরিক

কাজে চাকরির বাড়তি সুযোগের প্রশ্নও ছিল। কয়লাখনিতে চাকরির সঙ্গে আরও খাদ্য উৎপাদন প্রচার বা সামরিক ক্ষেত্রে চাকরির বিষয় নির্মোহভাবে বিবেচনা করলে বুঝা যাবে, কয়লাখনিতে শ্রমিকের অভাবের কারণ কি। স্যার, এটা পরিষ্কার যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সময়ে লোকে কৃষির দিকে আকৃষ্ট হবে। যেসব লোক কয়লাখনিতে নিযুক্ত এবং সবাই জানেন এরা মূলতঃ কৃষিজীবী, তারা যদি আরও খাদ্য উৎপাদনের নীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সদৃশভাবে সামরিক চাকরির বেশি আয় এদের স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু স্যার, আরেকটা ব্যাপার আছে, অনেক সদস্য এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন হাল্কাভাবে। কিন্তু এটা বাস্তব ঘটনা। প্রথমতঃ সবাই জানে যে কয়লাখনির কাজ অত্যন্ত ঝামেলার কাজ, এমন কি বিপজ্জনক। কেউ-ই এই কাজ পছন্দ করে না। এবং যে কোনও শ্রমিক ভূ-পৃষ্ঠে কাজের সুযোগ পাওয়া মাত্র কয়লাখনির কাজ ছেড়ে দেয়। আরও খাদ্য উৎপাদন প্রচারাভিযান এবং সামরিক কাজ কলয়াখনি শ্রমিকদের সামনে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে, এইসব কাজকে কম বিপজ্জনক ও কম ঝামেলার কাজ বলে গণ্য করা যায়। দ্বিতীয় ব্যাপার, আমি পুনরুক্তি করব, আরও খাদ্য উৎপাদনের প্রচারাভিযান ও সামরিক চাকরিতে খনি শ্রমিক নিজের রুজি এবং পরিবারের অন্যদের জন্য আয় করতে পারে।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্যের বাকি আছে মাত্র এক মিনিট।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি দুঃখিত স্যার।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : এ ব্যাপারে আমার কোনও স্বেচ্ছামত বিশেষ ক্ষমতা নেই। মাননীয় সদস্য বক্তব্য শেষ করুন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই পরিস্থিতির জন্যই, স্যার, শ্রমিকের অভাব রয়েছে।

আরও দুটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই সভার বিবেচনার জন্য। প্রথম কথা, সরকার নিশ্চিতভাবেই এ ব্যাপারে হঠকারি পথ নেয় নি। এটি অবশ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সভাকে আমি বলতে চাই, সরকার যথেষ্ট সতর্কতার সাথে কাজ করেছে। এর প্রথম বিজ্ঞপ্তি শুধু মধ্য প্রদেশের ওপর প্রযোজ্য ছিল, সমগ্র কয়লাখনি অঞ্চলে নয়। নভেম্বরে সরকার মনে করে এটি বিহার ও বাংলায় প্রসারিত করা দরকার, ডিসেম্বরে উড়িশাকে এর আওতায় আনা হয়। আমরা সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করেছি, এবং এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে মহিলাদের মজুরি পুরুষদের

সমান হওয়া উচিত। **আমার ধারণা এই প্রথম স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এক-ই কাজের জন্য সমান বেতনের নীতি প্রতিষ্ঠিত হল।** আমরা আরও ঠিক করেছি, মহিলারা ৫½ ফুটের চেয়ে ছোট গ্যালারিতে কাজ করবে না। সভা আরও স্মরণ করবে যে এইসব বিজ্ঞপ্তি অস্থায়ী হবে, আমি এটার ওপর জোর দিতে চাই। আমরা বলিনি যে এইসব বিজ্ঞপ্তি শুধু যুদ্ধকালেই থাকবে ; বিষয়টি আল্গা রাখা হয়েছে। সকলকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে আমরা এটিকে জরুরি ও অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে গণ্য করব। বিজ্ঞপ্তির সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমরা আর একটা কাজ করছি। যেমন, আমরা একটি শ্রমিক শিবির সংগঠিত করছি, সেখান থেকে শ্রমিক বাছাই করে কয়লাখনিগুলিতে পাঠানো হবে। সময় সংক্ষেপ করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একটা শ্রমিক সরবরাহ কমিটি (Labour Supply Committee) নিয়োগ করে সেখান থেকে সামরিক কাজে নিযুক্ত কনট্রাক্টারদের শ্রমিক যোগান দেওয়া, যাতে প্রয়োজন মতো কয়লাখনির জন্য শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্যের সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, যদি আর এক মিনিট সময় দেন।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : আমার আশঙ্কা, বিধি কিছুটা চরম।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কাজেই সভা বুঝবেন যে এটা সম্পূর্ণভাবে জরুরি ব্যবস্থা এবং সরকার প্রয়োজনের চেয়ে এক মিনিট বেশি জারি রাখতে ইচ্ছুক নয়।

□ □ □

২৭

*কয়লাখনি সুরক্ষা (গুদাম) সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : স্যার, আমি পেশ করছি :

"কয়লাখনির সুরক্ষা (গুদাম) আইন, ১৯৩৯ সংশোধনার্থে আনীত বিল সভা বিবেচনা করুক।"

স্যার, এই বিধেয়ক কয়লাখনি সুরক্ষা (গুদাম) আইন, ১৯৩৯ কিছুটা সংশোধন করতে চায়। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়-ই স্মরণে আছে, কয়লা খনি আইন প্রবর্তিত হয়েছিল ১৯৩৯-এ। এই আইন একটা সংস্থা গড়েছিল যা গুদাম বোর্ড (Storing) হিসাবে অভিহিত। এর কাজ ছিল মূলত: কয়লা ও কোক কয়লার লেভি হতে সংগৃহীত টাকার তহবিল পরিচালনা এবং ঐ টাকা কয়লাখনির গুদামে ব্যয় করা যাতে খনিতে আগুন লাগা বন্ধ করা যায়। এই আইন কার্যকরীর সময়ে কিছু দোষ ধরা পড়ে, সেগুলি দূর করা দরকার। এই বিধেয়ক শুধুমাত্র তিনটি প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট, কারণ দেখা গেছে প্রথমটি ৮ ধারা সংশোধন সম্পর্কিত। সভার স্মরণে আছে যে, এই ধারায় বোর্ডের কাজকর্ম এবং কী উদ্দেশ্যে তহবিলের টাকা ব্যয় হবে, তা নির্দিষ্ট আছে। ৮ ধারায় বোর্ডকে তার নিজের প্রশাসনের ব্যয় করার অনুমতি রয়েছে। দ্বিতীয়ত: মালিক বা এজেন্টদের এবং কয়লাখনির ম্যানেজারদের ৩ ধারায় বোর্ডকে এই আইন রূপায়ণে অন্যান্য কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং চতুর্থত:, বোর্ডকে গুদাম বিষয়ক গবেষনায় টাকা ব্যয় কার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে ৮ ধারায় বোর্ডকে নিজে গুদামজাত করণের কাজে টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া নেই। এটা এক বিরাট ফাঁক। বিশেষজ্ঞদের মতে বোর্ডকে এই ক্ষমতা দেওয়া দরকার এবং বিধেয়কের উপখণ্ড ২ সংশোধন প্রস্তাবে ৮ ধারার ১ খণ্ডের উপধারা(iii) এর শব্দ সমষ্টি বদল করে বোর্ডকে সরাসরি গুদামজাত করার

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-১, ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪। পৃ: ৪৪৩-৪৬

কাজে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তহবিলের টাকা থেকেই এই কাজে বোর্ড ব্যয় করতে পারবে। দ্বিতীয় সংশোধনটা ১০ ধারার। ধারা ৯ উপখণ্ড ৩, কয়লাখনি সুরক্ষা (গুদাম) আইন, ১৯৩৯ অনুযায়ী কয়লাখনির চিফ ইনস্পেকটর খনির মালিক বা ম্যানেজারদের উপর নির্দেশনামা জারি করে কয়লা খনির সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলতে পারেন। আইনের ১০ ধারায় এই নির্দেশ আপীলযোগ্য কিন্তু দেখা গেছে কয়লাখনি বিশেষজ্ঞ বা ইনস্পেকটরের নির্দেশ আপিলাধীন রাখা হলেও আইনে এমন কোনও ধারা নেই যাতে মালিক আপিলের সংস্থায় গিয়ে স্থগিতাদেশ পেতে পারেন বা তার বিরুদ্ধে ইনস্পেকট বিশেষজ্ঞের জারি করা ব্যবস্থা, এবং প্রস্তাব হচ্ছে আপিলের অধিকার থাকুক কিন্তু মূল নির্দেশ কাযকরীর বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ ব্যবস্থা চলবে না। এই ফাঁক দূর করতে বর্তমান আইনের ধারা ১০-এ একটি অনুবিধি সংযোজন করা হল এবং এই বিধেয়কের খণ্ড ৩-এ তা করা হয়েছে। বর্তমান আইনে প্রস্তাবিত তৃতীয় সংশোধনটি বোর্ড নিজে ভাণ্ডারজাত কাজ করতে ক্ষমতা পাবে কি না সেই সংক্রান্ত। কয়লা ভাণ্ডার করার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এর উদ্দেশ্য কয়লা রক্ষা করা, অন্যথায় তা জ্বলে যেতে পারে। অনেক খনি পরিত্যক্ত দেখা যায়, এর ওপর কারো নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং দেখা গেছে বেশিরভাগ মালিক যখন দেখে ভেতরের কয়লায় আগুন ধরে গেছে, তখন তারা অনায়াসে তা পরিত্যাগ করে। অনেক ক্ষেত্রে মালিকানার বিষয় বিতর্কিত থাকে, অথবা মালিক নিজে কয়লা গুদামজাত করার অবস্থায় থাকেন না। পরে এই ধরনের ক্ষেত্রে গুদামজাত করার দায় কারোর ওপর চাপানো যায় না। নির্দেশ জারি করার মতো লোকও থাকে না। এইরকম পরিস্থিতি এড়াতে এটা মনে হয়েছে যে, বোর্ডের হাতে গুদামজাত করার ক্ষমতা থাকা উচিত। প্রসঙ্গত: বোর্ডকে এই দায়িত্ব পালন করতে হলে অন্তত: সেই ক্ষমতা দেওয়া উচিত যাতে তারা খনি মালিকের জমিতে প্রবেশাধিকার পায়। এটা নতুন এক খণ্ড ১০ (ক) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এর সূত্রে বোর্ড নিজে গুদামজাত করা এবং খনির এলাকায় প্রবেশ করার ক্ষমতা পাবে। বিধেয়কটি অত্যন্ত সরল ব্যবস্থা। আমার ধারণা এ বিষয়ে বেশি ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। এটা এক অবিতর্কিত ব্যবস্থা এবং আমি আশা করি সভা এটা গ্রহণ করবে। স্যার, আমি প্রস্তাব পেশ করলাম।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি : এই বিধেয়ক পাশ করা হোক।

কয়েকজন মাননীয় সদস্য কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, আমি এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার সুযোগ নেব। মাননীয় সদস্য মি: মিলার বলেছেন, সরকার যথেষ্ট সময় নিয়ে নোটিশ না দিয়ে এই ধরনের বিধেয়ক পেশ করতে অভ্যস্ত। আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি, ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের বিধেয়ক নিয়ে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে পারি, আমার ধারণা এই বিধেয়ক তড়িঘড়ি পাশ করানোর দোষে সরকার অপরাধী নয়। মাননীয় সদস্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, এই বিধেয়কটা অন্তত ছয় মাস বিচারাধীন ছিল। দ্বিতীয়ত:, এবং এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, মাননীয় সদস্যকে মনে রাখতে বলব যে এই বিধেয়ক কার্যত: খসড়া করেছে Storing Board নিজে, এবং এই বোর্ড কয়লা খনি শিল্পে সবচেয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা। এবং সেজন্যই আমি মনে করি না, এই বিধেয়ক তড়িঘড়ি পাশ করাবার জন্য আমার সমালোচনা করা উচিত।

অন্য বিষয়ে সম্বন্ধে যেমন এই ব্যবস্থা গৃহীত ও প্রযোজ্য হবে জরুরি অবস্থার উদ্ভব হলে, অন্যথায় নয়, আমি এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি। বাস্তবে, আমরা বোর্ডকে এই ক্ষমতা দিচ্ছি জরুরি অবস্থার জন্যই।

মাননীয় সদস্য ডা: জিয়াউদ্দিন যে প্রশ্ন তুলেছেন, তিনি আজ উপস্থিত নেই, তাঁর সুপারিশ কি তা আমি বুঝতে পারছি না। আমি যতদূর জানি, কয়লাখনি গুদাম পর্যদ ও কয়লাখনি মালিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, এবং আমি মনে করি না যে আমাদের প্রবর্তিত এই ব্যবস্থা তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করবে। আমি যতটা জানি, এরা একটা সুখী পরিবারের মতো, এবং এমন কোনও ঘটনার কথা আমার জানা নেই যখন বোর্ডের গৃহীত কোনও নীতি সিদ্ধান্ত কোল মাইনিং অ্যাসোসিয়েশন-এর কোনও সদস্য বিরোধিতা করেছেন।

আমার বন্ধু মাননীয় হুশেনভাই লালজি একটা প্রশ্ন তুলেছেন যেটা পর্যালোচনা করা দরকার, যেমন সরকার যেসব খনিতে গুদামজাত কাজে টাকা ব্যয় করেছেন সেসব খনিতে সরকারের অধিকার কি হবে। এটা একটা মূল্যবান প্রস্তাব এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরবর্তী কোনও স্তরে আমি বলতে পারব, এক্ষেত্রে সরকারের কি দৃষ্টিভঙ্গি হবে। স্যার, আমার আর কিছু বলার নেই।

□ □ □

২৮

শ্রমিকের প্রতি সরকারের নীতি কেন্দ্রীয় বিধানসভায় বক্তৃতা

"আমার ধারণা, শ্রমিকদের বিষয়ে ভারত সরকারের নীতি সম্বন্ধে বলতে হলে মনে হয় বলতে পারি যে, শ্রমিকদের প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন প্রবণতা এসেছে", শ্রমিক প্রশ্নে শ্রম বিভাগের নীতির ওপর কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিতর্ককালে (মার্চ ১৬) এন. এম. যোশির ছাঁটাই প্রস্তাবের উত্তরে ভারত সরকারের শ্রমিক সদস্য মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর এই উক্তি করেন। ড: আম্বেদকর বলেন :

"শ্রী যোশি এত সব বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিষয়ে আলোচনা এবং এত প্রশ্ন তুলেছেন যে, আমার পক্ষে প্রতিটি নির্দিষ্ট করে উত্তর দেওয়া ও অলোচনা করা এবং শ্রম বিভাগের প্রতিনিধি হিসাবে উত্তর দেওয়া ও সম্ভব নয়। সময়ের স্বল্পতার বিচারে আমাকে প্রয়োজনমতো প্রশ্ন ধরে বিতর্ককালে উত্তর দিতে হবে।

শ্রমিকের অবস্থা

স্যার শ্রী যোশি শুরুতে সাধারণ বক্তব্য দিয়ে বলেছেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতে শ্রমিকের অবস্থা অসন্তোষজনক। স্যার, এইখান থেকে বসে এই অনুমান সম্বন্ধে প্রশ্ন করার অবস্থা আমার নেই। আমি এটুকুই বলতে চাই, শ্রী যোশির কথামতো অবস্থা যদি এতই খারাপ হয় তবে তার দায়িত্ব ভারত সরকারের নয়।

স্যার, ভারতে শ্রমিকের অবস্থা বেশিটা নির্ভর করে দেশের শিল্প বিকাশের ওপর যাতে সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই, এবং সেজন্য অবস্থা অসন্তোষজনক হলে ভারত সরকারকে দোষারোপ করে লাভ নেই। শ্রী যোশি বলেছেন, ভারত সরকারের আচরণ পরীক্ষা করে তিনি বুঝেছেন সরকার অবহেলা, অবজ্ঞার দায়ে দোষী। সরকার

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, এপ্রিল ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৪১০-১৩,
বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ১৬ মার্চ ১৯৪৪। পৃ: ১১৮৭-৯১]

অত্যন্ত ভিরু এবং যেটুকু করেছে তা সামান্য আমি বলতে চাই যে শ্রী যোশি একটা পার্থক্য ধরতে পারেন নি, যেটা মনে হয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়

শ্রমিকদের অনেক সমস্যা রয়েছে, এ নিয়ে বিতর্ক নেই। অনেক শ্রমিক সমস্যা আছে যাতে আর্থিক দায় নেই। শ্রী যোশির কাছে আমার প্রশ্ন: কোনও অবিতর্কিত শ্রমিক সমস্যা হোক অথবা যেসব সমস্যার সাথে অর্থনৈতিক প্রশ্ন জড়িত না হোক, ভারত সরকার প্রয়োজনীয় তৎপরতাসহ ব্যবস্থা নেয় নি? স্যার, আমার বলতে দ্বিধা নেই, এই ধরনের সব ঘটনায় যাতে সবার ঐক্যমত বা সর্বসম্মত মত ছিল এবং যেসব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রশ্ন ছিল না, সব ক্ষেত্রেই ভারত সরকার তৎপরতার সাথে ব্যবস্থা নিয়েছে।

নবাবজাদা জনাব লিয়াকৎ আলি খান : এইসব ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার ছিল না।

ড. বি. আর. আম্বেদকর : অনেক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা

তারপর শ্রী যোশি বলেছেন, যুদ্ধকালে শ্রমিকের অবস্থার অবনতি হয়েছে কারণ সরকার 'কারখানা আইন'এর কাজের সময় সংক্রান্ত ধারা থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছে এবং শ্রমিকের ধর্মঘট করার অধিকার সীমাবদ্ধ করেছে ১৫ দিনের নোটিশ দানের মধ্যে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, সরকার ন্যাশনাল লেবার সারভিস অধ্যাদেশ এবং টেকনিকাল পারসোনেল অধ্যাদেশ চালু করে ইচ্ছা না থাকলেও বহাল থাকতে লোককে বাধ্য করছে। আমি সানন্দে বলছি, শ্রী যোশি অন্তত: এটা স্বীকার করেছেন যে যুদ্ধের সময়ে এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ যুক্তিযুক্ত, এবং আমার দিক থেকে বলতে পারি, যখন-ই যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কোনও অভিযোগের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, আমি সত্বর তা নিরসনের ব্যবস্থা করেছি। শুধু একটা দৃষ্টান্ত দেব। আমার মনে আছে, শ্রী যোশি একটা কথা উত্থাপন করে বলেছিলেন, এই অধ্যাদেশ মালিকের হাতে শ্রমিকদের শাস্তিদানের ক্ষমতা দিয়ে শ্রমিকদের হেনস্থা করা হচ্ছে। আমি তৎক্ষণাৎ সেটা স্বীকার করে নিই এবং অধ্যাদেশ সংশোধন করে শাস্তিদানের ক্ষমতা মালিকদের হাত থেকে কেড়ে সম্রাটের বিচারকের হাতে দিই।

স্যার, আগে বলেছি, এ ব্যাপার নিয়ে বিশদভাবে কিছু বলতে পারি না তবে সমগ্র পরিস্থিতির সংক্ষিপ্তসার করে বলি, ভারত সরকারের যুদ্ধকালীন আইন পর্যালোচনা করে বলা যায় শ্রমিকদের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে খর্ব হয়েছে, কিন্তু এর

সাথে দুটি নতুন নীতির উদ্ভব হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে: ভারত সরকার এই প্রথম শ্রমিক নিযুক্তির শর্ত কী হবে তা নির্ধারণের দায়িত্ব নিয়েছে, আসার ধারণা এটা একেবারে নতুন নীতি, আগের শ্রমিক আইনে এসব ছিল না। এবং আমি নিশ্চিত যুদ্ধকালীন এই আইন দেশের শ্রমিক আইনে স্থায়ীভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

যুদ্ধকালীন শ্রম আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল, বাধ্যতামূলতা সালিসি নীতি। স্যার, আমার ধারণা বন্ধুবর এন. এম. যোশি ও যমুনাদাস মেহতা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, শ্রমিক বিষয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। মালিকদের থেকে কিছু সুবিধা আদায় করার জন্য শ্রমিকদের ধর্মঘটের ব্যর্থ প্রয়াস আমি দেখেছি, এবং আমি অতিরঞ্জন না করেই বলতে পারি, এমন ঘটনা বহু দেখেছি, যেখানে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন কষ্ট সাধ্য লড়াই করে শেষে মালিকদের কাছে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়েছে এবং আগের অবস্থা বা আরও খারাপ অবস্থার মধ্যে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। স্যার, ভারত রক্ষা বিধির ৮১ বিধি প্রদত্ত সরকারকে বাধ্যতামূলক সালিসির ক্ষমতা আমার মতে শ্রমিকের পক্ষে সবচেয়ে বড় সুবিধা। আমি যতদূর জানি, খুব কম ক্ষেত্রেই এই লড়াইয়ের ক্ষমতা প্রয়োগ করে দাবি ব্যর্থ হয়েছে। বেশিরভাগ ধর্মঘট-ই শ্রমিকের পক্ষে জয়ের মধ্যে শেষ হয়েছে। শ্রী যোশি ৮১ ধারা সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন, যে আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ধারা প্রয়োগ করি নি। ওঁর বক্তব্য আমি যতটা বুঝেছি তা হচ্ছে, শ্রমিকের তোলা বিবাদে সরকার সব সময়ে ৮১ ধারা প্রয়োগ প্রয়াসী হয় নি। স্যার, এই প্রশ্নে আমার পুরো সহানুভূতি রয়েছে ; কিন্তু এটা স্পষ্ট যে শ্রী যোশির বক্তব্য স্বীকার করা যায় না। ওঁর উত্থাপিত প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়; অর্থাৎ যখন-ই ট্রেড ইউনিয়ন তাদের দাবি না মিটলে ধর্মঘটের নোটিশ দেবে, তখন-ই ঐ ধারা প্রয়োগ করতে হবে, এটা মানা যায় না।

জনৈক মাননীয় সদস্য : অন্যান্য দেশে এই অধিকার অস্বীকৃত নয়, ভারতে অস্বীকৃত হবে কেন?

ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় সদস্যের অবগতির জন্য বলি, বাধ্যতামূলক সালিসি কোথায়ও নেই।

আগেই বলেছি, এ ক্ষেত্রে যখন-ই কোনও ট্রেড ইউনিয়ন মালিককে নোটিশ দেবে অথবা ধর্মঘটের হুমকি দেবে, তখনই ৮১ ধারা প্রয়োগ করতে হবে, এটা আমরা মানতে পারি না। দাবি যথার্থ কি না সেটা পরীক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের থাকা দরকার। অন্যথায় ধর্মঘট রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে, আমি আশা করি

এই সভার কেউ-ই তা চাইবেন না। শ্রী যোশি আরেক প্রশ্ন তুলেছেন শ্রমিক সমস্যা নিয়ে কাজ করার জন্য শ্রম দফতরের অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে। তাঁর বক্তব্য একটা পৃথক মন্ত্রক থাকা দরকার, কিছু আধিকারিক নিযুক্ত করা-বার্ধক্য ভাতার জন্য একজন, অসুস্থতা বিমার ক্ষেত্রে একজন, অন্যান্য জরুরি শ্রম সমস্যার জন্য তৃতীয় জন। স্যার, শ্রী যোশি যা বলেছেন তা নিয়ে বিতর্ক করা আমার কাজ নয়। বাস্তবে ব্যক্তিগতভাবে তার বক্তব্যের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে।

শ্রমিক বিভাগের প্রসার

এই বিষয়ে আমি মোটামুটি বলতে চাই : যে পরিস্থিতিতে আমরা বাস করছি এবং প্রশাসন চালাচ্ছি তাতে এটা বলা চলে না যে শ্রমিক বিভাগের বর্তমান বিন্যাস উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে কাজ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। স্যার, প্রথম যেটা লক্ষ্য করা দরকার, শ্রমিক বিভাগ এখন আর অন্য কোনও দফতরের লেজুড় নয়। একটা সময়ে এটা বাণিজ্য অথবা শিল্প দফতরের অংশ ছিল? এখন তা নেই। এখন এটা একটা পৃথক ও স্বাধীন দফতর। এটা ঠিক যে এটা একেবারে স্বতন্ত্র বিভাগ নয়। তবু কেউ যেন যুক্তি না দেন যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অধীন অন্যসব বিভাগের থেকে এটা স্বাধীন ও প্রভাবশালী দফতর। তাছাড়া আমরা সম্প্রতি এই বিভাগকে প্রসারিত করেছি। ১৯৪২-এর আগে শ্রমিক বিভাগ মাত্র একজন অবর সচিব শ্রমিক বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। এখন এই বিভাগে একজন উপ-সচিব ও দুজন অবর সচিব রয়েছেন। তদুপরি একজন শ্রম-উপদেষ্টা, একজন শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক—শ্রী নিম্বকর—আটজন সহ শ্রম-উপদেষ্টা রয়েছেন। আমাদের বিভাগে একজন পরিসংখ্যানবিদ নিয়োগ করা হয়েছে শ্রমিক সংক্রান্ত সব তথ্য সংগ্রহের জন্য। এছাড়া বহু কর্মচারী রয়েছে, কার্যত: প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক কর্মচারী আছেন, আমি নিশ্চিত এটা শ্রমিকদের সুবিধার পক্ষে উল্লেখযোগ্য।

জনৈক মাননীয় সদস্য : তদন্ত কমিটির উপযুক্ত ক্ষেত্র।

ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের প্রশ্নে এটা এমন ঘটনা নয় যা দফতরের জানা নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে, অসুস্থতা বিমা সংক্রান্ত রিপোর্ট দেওয়ার জন্য একজন বিশেষ আধিকারিক নিয়োগ করে এটা শুরু হয়েছে। তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক আদরকর। সদৃশ ধরনের সমস্যার কাজে রিপোর্ট তৈরি এবং এই প্রস্তাব আইনে পর্যবসিত করার পদ্ধতি ও উপায় বের করার কাজে একই ধরনের আধিকারিক নিয়োগের ইচ্ছা ও প্রস্তাব আছে। কিন্তু ঘটনাটা হয়েছিল এইরকম। গত অগাস্ট মাসে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আমরা রিপোর্টটা পেশ করি বিবেচনার জন্য।

কমিটি ও ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন একমত হয়ে প্রস্তাব নেয় যে, ভারত সরকার সমাজ-কল্যাণ ব্যবস্থা বিবেচনা ও ভারতের শ্রমিকশ্রেণী সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে উপায় ও পদ্ধতি সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবে।

আমি সানন্দে জানাচ্ছি, সেই প্রস্তাব অবিলম্বে কার্যকরী করি এবং কমিটি গঠন করি যা এখনও কাজ করছে। স্বভাবতই স্যার, দফতর পৃথক বিষয়গুলির জন্য আলাদা আধিকারিক নিয়োগ করলে ভুল হত। কমিটি আমাদের কাছে রিপোর্ট করা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। আমি মাননীয় সদস্যদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই, বিশেষ সমস্যা নিয়ে তদন্তের জন্য বিশেষ আধিকারিক নিয়োগের প্রকল্প পরিত্যক্ত হয় নি, সরকার কমিটির রিপোর্ট পেলেই এটা করা হবে। স্যার, এই বিষয়ে আমি বলার পর শ্রী যোশি স্বীকার করবেন। শ্রমিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য ভারত সরকারের বর্তমান প্রশাসন অপ্রতুল নয়।

ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন

ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন নিয়ে শ্রী যমুনাদাস মেহতা কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক শ্রম দফতরের স্তরে আনতে হবে। শ্রী যোশি বলেছেন, এর পৃথক সচিবালয় থাকা দরকার এবং শ্রী মেহতার সুপারিশ শ্রম দফতরের প্রধান ও সম্মেলন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। শ্রী মেহতা আরও বলেছেন, কমিটির রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করতে হবে সংশোধনের জন্য।

স্যার, মাননীয় বন্ধু শ্রী যোশি, শ্রী যমুনাদাস মেহতা যেসব কথা বলেছেন, তার প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি বলতে চাই, এঁরা দুজনেই জানেন, কমিটির কর্মপদ্ধতি ঠিক করার ব্যাপারটা সম্মেলনের। সম্মেলন উদ্বোধনের সময়েই সম্মেলনের পৃথক সচিবালয় থাকার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, এবং আমি মনে করি আমি ঠিকই বলছি, সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে পৃথক সচিবালয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরের সম্মেলনে তা পরিবর্তিত হয় এবং আমাদের এক নতুন দিকনির্দেশ দেওয়া হয়। আমি নির্দ্বিধায় বলছি, এ নিয়ে আবার পর্যালোচনা হবে। স্যার, আর একটা প্রশ্ন নিয়ে আমি একটা ব্যাপার বলতে চাই, আমার ধারণা যদি সঠিক হয়, শ্রী যোশি ও শ্রী মেহতা দু'জনই ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনকে তাৎক্ষণিক ও মূল্যহীন বলে মনে করছেন। স্যার, আমি ভিন্নমত পোষণ করি, কেননা আমি মনে করি শ্রম সম্মেলন এত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে যে এর মূল্য খাটো করা সম্ভব নয়।

আমি যে প্রশ্ন তুলতে চাই, এবং সভার সদস্যদের বিষয়টি ভেবে দেখতে বলি, সেটা হল এই, ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন বা স্থায়ী শ্রম কমিটির আলোচ্য বিষয়সূচি কেউ যদি পর্যালোচনা করেন, আমার মনে হয় তারা স্বীকার করবেন যে, আলোচ্য বিষয়গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। আমি স্মৃতি থেকে বলছি, তবে বিষয়গুলি এমন ছিল যা শ্রম জগতের পক্ষে মহান মুহূর্ত বলে পরিগণিত হবে। আমি একটা কথা বলতে চাই। ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের বাইরের কোনও শ্রম প্রতিনিধির পক্ষে কি এইসব প্রকল্প নিয়ে মালিকদের কাছে যাওয়া বা কথা বলা সম্ভব? আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, বর্তমান ভারতীয় শ্রমিকের অসংগঠিত অবস্থায় কোনও মালিক শ্রমিক প্রতিনিধিদের কথায় এতটুকুও কান দেবেন বা গুরুত্ব দেবেন।

ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের জন্য আমি এই কৃতিত্ব দাবি করি যে, আমরা যদি কিছুই না করে থাকি, তবু একটা কাজ করেছি, বিশেষ করে মালিক প্রতিনিধিদের বাধ্য করেছি শ্রমিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে।

আমি মনে করি, দেশের শ্রমিক শ্রেণীর জন্য ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের এটা এক বিরাট অবদান।

কয়লাখনিতে মহিলা

মাননীয় বন্ধু শ্রীমতী সুব্বারাজন তাঁর বক্তৃতায় কয়লাখনিতে মহিলাদের নিযুক্তি করার প্রশ্ন তুলেছেন। এই ধরনের প্রশ্নে তাঁর তীব্র আবেগের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছি না। কিন্তু স্যার, আমি আমার এই প্রশ্নে ফিরে যেতে পারি না, কারণ সভার নিশ্চয়-ই স্মরণে আছে, মুলতুবি প্রস্তাব আলোচনাকালে এ নিয়ে কথা হয়েছে। আমি আবার বলছি যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমি খুশি নই এবং সভাকে আশ্বাস দিচ্ছি আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা নিয়ে কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়লাখনিতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াব, যাতে যথাসত্বর নিষেধাজ্ঞা জারি করা যেতে পারে।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারাজন : মাননীয় সদস্যকে একটা প্রশ্ন করতে পারি? কয়লাখনিতে ভূ-গর্ভে কাজে মহিলা নিয়োগের নোটিশ জারির আগে সরকার ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের সঙ্গে আলোচনা করেছিল?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সরকারের হাতে সময় ছিল না। আগেই বলেছি এটা জরুরি বিষয় ছিল এবং অত্যন্ত জরুরিভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল।

তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা কথা বলতে চাই, ভারত সরকার শ্রমিকদের ক্ষোভ মেটাবার পরিবর্তে শ্রমিক নেতাদের কারাগারে নিক্ষেপ করতে ব্যস্ত ছিল। স্যার, আমার দফতর এ বিষয়ে নিয়ে কাজ করে না। গতকাল আমরা অনেক আলোচনা করেছি। গতকাল বা আজ এমন কোনও দৃষ্টান্ত আমায় দেওয়া হয় নি যে সরকার কোন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে।

শেখ ইয়ুসুফ আবদুলা হারুন : করাচী পোর্ট ট্রাস্ট্রের একটা ঘটনা আমি উল্লেখ করেছি।

শ্রী হুসেনভাই এ. লালজি : পোর্ট ট্রাস্ট কি আপনার অধীনে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না।

শ্রী লালজি : রেলওয়ে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না।

শ্রী লালজি : জলপথের শ্রমিক?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না।

শ্রী লালজি : তাহলে আর কি আছে আপনার অধীনে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বহু ধরনের শ্রমিক আছে। শ্রমিক নেতাদের কারাবাসের কথা বলছিলাম।

শ্রীমতী সুব্বারাজন : শ্রী ডাঙ্গেকে কি গ্রেপ্তার করা হয় নি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ঐ বিষয়েই আসছি। শ্রমিক নেতাদের যতটা জেনেছি, সমস্যা হচ্ছে এঁরা একাধিক ভূমিকা পালন করেন।

তারা এক সময়ে শ্রমিক নেতা, অন্য সময়ে কম্যুনিস্ট, আরেক সময়ে জাতীয় নেতা, আবার এক সময়ে কংগ্রেস সদস্য ; এবং অনেক সময়ে তাঁরা হিন্দু মহাসভা বা অন্য সংস্থার সদস্য।

জনৈক মাননীয় সদস্য : সবাইকে কি নিষিদ্ধ গণ্য করতে হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটা বলা খুব শক্ত। যে শ্রমিকনেতা নানা ভূমিকা পালন করেন, তিনি শ্রমিকনেতা বলেই আটক হয়েছেন, না অন্য কাজে জড়িত থাকার জন্য একজন কম্যুনিস্ট, কংগ্রেস বা হিন্দু মহাসভার সদস্য হওয়ার জন্য আটক হয়েছেন তা বলা কঠিন। বাস্তবিক ক্ষেত্রে, আমি বিনীতভাবে বলতে

চাই, আমার বিচারে শ্রমিক নেতারা শ্রমিক স্বার্থের কাজে আত্মনিয়োগ করলে, এবং রাজনৈতিক দল বা অন্য ধরনের সংস্থা বা কর্মসূচিতে না থাকলে, তারা শুধু ২৬ ধারার কব্জা থেকে মুক্তই থাকবে না, শ্রমিকদের জন্যও কাজ করতে পারবেন আরও ভালভাবে। দুর্ভাগ্যবশত:, আমাদের দেশে শুধু শ্রমিক স্বার্থে আত্মনিয়োজিত শ্রমিক নেতা নেই।

জনৈক মাননীয় সদস্য : শ্রী যোশি রয়েছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই বিতর্ককালে উত্থাপিত কোনও বিষয়ে আমি উত্তর দিই নি বা উত্তর দেওয়া দরকার এমন হয়েছে কি জানি না।

আমার ধারণামতো বলতে পারি, শ্রমিক সংক্রান্ত বিষয়ে ভারত সরকার সম্বন্ধে যা কিছু বলা হোক না কেন, এটা দাবি করা যায় যে শ্রমিক প্রশ্নে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা নতুন মাত্রা এসেছে।

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : এর পেছনে নীতি কী?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : গত আধ ঘন্টা এছাড়া আর কিছুই বলি নি।

মৌলভি মহম্মদ আবদুল গণি : মাননীয় সদস্যর কাছে একটা তথ্য জানতে পারি? কারিগররা একটা কেন্দ্রে এক বছর প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও শংসাপত্র পাচ্ছেন না, এটা কীভাবে হয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি সেটা দেখব।

শ্রী এন. এম. যোশি : স্যার, আশা করি এই আলোচনা শ্রম দফতরকে আরও সক্রিয়তা ও ভাল কর্মকুশলতার দিকে নিয়ে যাবে, আমার ছাঁটাই প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুমতি চাইছি।

'আইনসভার অনুমোদনক্রমে ছাঁটাই প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়।

* * * * *

*ফিলাডেলফিয়ায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন

২৪ মার্চ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভারত সরকার আগামী ২০ এপ্রিল ১৯৪৪ ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যোগদানের জন্য নিম্নোক্তদের প্রতিনিধি মনোনীত করেছে :

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, এপ্রিল ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৪১৬

সরকারের প্রতিনিধি : স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন, ভারতীয় হাই কমিশনার, নেতা ; শ্রী এইচ. সি. প্রায়র, সচিব, শ্রম দফতর, প্রতিনিধি ; হাই কমিশনার অফিসের একজন সদস্য, সরকারি প্রতিনিধিদের পরামর্শদাতা এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের সচিব।

মালিক প্রতিনিধি : শ্রী জে. সি. মহিন্দর, প্রতিনিধি ; শ্রী ডি. জি. মুলহারকর, পরামর্শদাতা।

শ্রমিক প্রতিনিধি : শ্রী যমুনাদাস মেহতা, প্রতিনিধি, আফতর আলি, পরামর্শদাতা ; আর. আর. ভোলে, পরামর্শদাতা।

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসাবে ভারত শিল্প সংস্থাগুলির সাথে কথা বলে প্রতিনিধিত্বমূলক বেসরকারি প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতা মনোনীত করেছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির। মালিকদের প্রতিনিধি এভাবেই সম্মতিক্রমে সুপারিশের ভিত্তিতে মনোনীত হয়েছেন।

কর্মচারীদের ক্ষেত্রে দুটি মূল সংগঠন রয়েছে, তারা সম্মতিক্রমে প্রতিনিধি মনোনীত করতে ব্যর্থ। দুটির মধ্যে কোন্‌টি বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক তা পরীক্ষা করার মতো ব্যবস্থাপনা সরকারের নেই এবং যেহেতু সরকার চায় যে সম্মেলনে শ্রমিকদের বক্তব্য থাকুক, সেজন্য সরকার এখনকার মতো দুটির মধ্যে পালা করে প্রতিনিধি মনোনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকার শ্রমিকদের প্রতিনিধিকে প্রতিনিধি মনোনীত করেছে এবং ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্‌ লেবারের সুপারিশক্রমে একজন পরামর্শদাতা, এবং অল ইন্ডিয়া মিউনিসিপ্যাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সুপারিশক্রমে আর আর ভোলে যুগ্ম পরামর্শদাতা নিযুক্ত হয়েছেন।

২৯

*বিবিধ বিভাগ

সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুর রহিম) : সভা এখন দাবি ৬৪ পেশ করবে না। বিবিধ বিভাগ আলোচনার পেশ করবে। এটা আগে বাকি ছিল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি মনে করি মাননীয় বন্ধু শ্রী অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার জানতে চেয়েছিলেন, কেন এখানে উল্লিখিত ১৫,২৬,০০০ টাকা স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় নি। আমি দফতরের কাছে জানতে চেয়েছি, এই টাকা কোন কোন বিষয়ের জন্য। এর মধ্যে মাননীয় সদস্যরা যদি এই বাড়তি মঞ্জুরি কিসের জন্য সেটা সাধারণভাবে জানতে চান, আমি তাতে রাজি।

শ্রী টি. এস. অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার : স্মারকলিপিতে এই সব জন্য রয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্ট্যান্ডিং ফিনান্স কমিটির রিপোর্টে চাকরি নিয়োগ কেন্দ্র প্রকল্প ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্রী টি. এস. অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার : আমরা সংখ্যাগুলির ব্যাখ্যা চাইছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বড় বিষয়ের ক্ষেত্রে ঘটনা হচ্ছে এই রকম। মাননীয় সদস্যরা জানেন, অদক্ষ শ্রমিকের জন্য সরকারের কাছে পূর্ত দফতরের কনট্রাকটর ও সাময়িক বিভাগ কর্মরতদের মধ্যে দারুন প্রতিযোগিতা রয়েছে। এই প্রতিযোগিতার কারণসমূহ দূর করার জন্য সরকার কয়েকটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রতিযোগিতার দরুন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের লোভ দেখিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয় এবং পরিণতিতে মজুরিও অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। সরকার দুটি ভিন্ন প্রকল্প চালু করে। একটা হচ্ছে শ্রমিক সরবরাহ কমিটি প্রকল্প, বাংলা বিহার অসমে এটা প্রযুক্ত হয়েছে এবং ৯টি সামরিক পরিচালনার কাছাকাছি করা হয়েছে। দ্বিতীয় কাজ, সরকার শ্রমিকদের ডিপো তৈরি করেছে, গোরখপুরে এরকম এক ডিপো করা হয়েছে। অদক্ষ শ্রমিকদের বেশিরভাগকে সংগ্রহ করে পাঠানো

---

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-২, ২৯ মার্চ ১৯৪৪। পৃ: ১৭২০।

হয় কয়লাখনি বা সামরিক কাজে। 'M' এর অন্তর্ভুক্ত এই ব্যয়—অদক্ষ প্রকল্পের শ্রমিক সমন্বয়—আসলে এই দুই প্রকল্পের জন্য ব্যয়। আমার বক্তব্য এইটুকুই।

শ্রী এন. এম. যোশি (মনোনীত, বে-সরকারি) : স্যার, মাননীয় সদস্য দুটি প্রকল্পের কথা বলেছেন, একটা হচ্ছে শ্রমিক সরবরাহ কমিটি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে শ্রমিক সংগ্রহ ও তাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠানোর জন্য ডিপো প্রতিষ্ঠা করার প্রকল্প। এখন, স্যার, এই শ্রমিক সরবরাহ কমিটির ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি বলুন গঠিত এইসব কমিটিতে শ্রমিকদের কোন প্রতিনিধি আছেন কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি উল্লেখ করতে চাই, গতকাল-ই অমি নির্দেশনামা পাঠিয়েছি, ঐসব কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধি গ্রহণের জন্য।

□ □ □

৩০

* নতুন দিল্লির মসজিদ সংরক্ষণ

সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুর রহিম) : সংশোধন পেশ করা হল :

"মূল প্রস্তাবের সঙ্গে নিম্নের অংশ পরিবর্তিত রূপে থাকবে :"

এই সভা কাউনসিলের গভর্নর জেনারেলের কাছে সুপারিশ করছে যে, নতুনদিল্লি এলাকার মসজিদগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সারাই-এর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

(ক) যে সব বাংলোবাড়ির মধ্যে মসজিদ রয়েছে, সংশ্লিষ্ট দফতর তা ন্যস্ত করবে নির্দেশ দেবে, তবে এর শর্ত হবে পুনরুদ্ধারে বাধা বা প্রার্থনার জন্য মুসলমানদের এই মসজিদ ব্যবহারে বাধা দেওয়া চলবে না ; এবং

(খ) সংশ্লিষ্ট দফতর ও নতুনদিল্লি পুরসভা কমিটিতে নির্দেশ দেবেন, তারা যেন নতুন দিল্লির যে কোনও মসজিদ সারাই, পুনরুদ্ধার বা পুনর্নির্মানে ইচ্ছুক মুসলমানদের বৈধ অনুমতি ও যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : স্যার, এই প্রস্তাব দুই অংশে রয়েছে, ক ও খ অংশ। আমি শুধু ক অংশের সঙ্গে যুক্ত। খ অংশ দেখবেন মাননীয় শিক্ষা সচিব, স্বাস্থ্য ও ভূমি দফতরের সচিব। ক অংশ যেটা আমার ব্যাপার, দুটি সুপারিশ করছে। একটা হচ্ছে, সরকার বাংলোবাড়ি সহ মসজিদ ভারত সরকারের মুসলমান কর্মচারীদের হাতে ন্যস্ত করবে। দ্বিতীয় সুপারিশ, ভোগদখলকারী বাসিন্দাদের নির্দেশ দেবে তারা যেন সেখানে আগত মুসলমানদের প্রার্থনা ও পুনরুদ্ধারে বাধা না দেন। দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি দুটির একটি সুপারিশও মানতে পারছি না। পারছি না, কারণ এই নয় যে প্রস্তাবক বন্ধুর আবেগকে সম্মান দিচ্ছি না, এই প্রস্তাব গ্রহণের সহজাত অসুবিধার জন্য আমি এটা

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৩০ মার্চ ১৯৪৪। পৃ: ১৭৯৮

গ্রহণ করতে অক্ষম। প্রস্তাবের প্রথম অংশ সম্বন্ধে মাননীয় বন্ধু স্যার ইয়ামিন খান বলেছেন যে, সরকার ইতিমধ্যে একটা বিশেষ বাড়ি জনৈক সদস্যকে দিয়েছে বা তার জন্য সংরক্ষিত করেছে, ঘটনাক্রমে তিনি একজন মুসলমান। আমার বিশ্বাস, তিনি এর উল্লেখ করে সমর্থনে বলতে চাইছেন। নীতি ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। স্যার, আমি সুনির্দিষ্টভাবে বলতে চাই, এটা ভ্রান্ত। কোনও বাড়ি কোনও মাননীয় সদস্যের জন্য সংরক্ষিত নয়। দুর্ঘটনাক্রমে উল্লিখিত বাড়ি ভোগদখল করছেন একজন মুসলমান সদস্য। কিন্তু আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, বাড়িটি খালি থাকলে আমার মনে হয় তা নেই, তা যে কোনও সদস্যের তিনি মুসলমান বা অ-মুসলমান যাই হোন না কেন, দাবির জন্য মুক্ত থাকবে।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খান : কিন্তু একটা দেওয়ালও তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সেটা অন্য ব্যাপার আমি নীতির কথা বলছি। সুতরাং, ভারত সরকার এই নীতি গ্রহণ করে নি। মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বলছি, বর্তমানে সরকারের পক্ষে এ ধরনের অনমনীয় নীতি গ্রহণ অসম্ভব।

স্যার, এই নীতি গ্রহণের অর্থ কী? এর অর্থ দু'রকম। এর অর্থ, সরকার প্রস্তাবে আলোচিত বাংলো ভোগদখলকারী অ-মুসলমান বাসিন্দাদের নোটিশ দিয়ে খালি করতে বলবে। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে পরিণতি তাই হবে। প্রস্তাব গ্রহণের দ্বিতীয় পরিণতি হবে এই : ধরা যাক এই ধরনের বাংলো খালি রয়েছে এবং একজন আধিকারিককে সেই বাংলা বাড়ি দেওয়া হল যিনি অ-মুসলমান এবং সরকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে যাকে বাইরে থেকে এনে দিল্লিতে রেখেছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার তাকে এই বাড়ি দেবে না। স্যার, আমার বিনীত বক্তব্য হচ্ছে, এ এক অসম্ভব অবস্থা, এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন ঘরবাড়ির দারুন অভাব এবং এখানে আসা উর্ধতন কর্মচারীদের ছোট কুটিরে ও নানা ধরনের বাড়িতে থাকতে হচ্ছে, সরকারের পক্ষে এ ধরনের নীতি আমার মতে কাউকে ভোগ করতে না দেওয়ার মতো ব্যাপার। আমার মাননীয় বন্ধু সহজেই বুঝবেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার এটা স্বীকার করতে পারে না।

প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে সরকার যেখানে ভোগদখলকারীদের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করার কথা বলছে, দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এটাও বিরাট অসুবিধা সৃষ্টি করবে। স্যার, এটা জানা ব্যাপার বাড়িওয়ালা ভাড়াটেদের ওপর কিছু বিধি-নিষেধ চাপায়। কিন্তু এতে আমার সন্দেহ নেই, মাননীয় বন্ধু

ইয়ামিন খান স্বীকার করবেন যে, বাড়িওয়ালা যেসব বাড়ি সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত, সেখানে ভাড়াটেদের ওপর বিধি-নিষেধ জারি করবেই। এবিষয়ে বিস্তারিতে যাওয়ার মতো সময় নেই। কিন্তু আমার মাননীয় বন্ধু সরকার ভাড়াটের ওপর যেসব বিধি-নিষেধ আরোপ করার পক্ষে বলছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়, কারণ বাড়ি সংরক্ষণের পক্ষে তা অনুকূল নয়।

স্যার, এবার দ্বিতীয় অসুবিধার প্রশ্নে আমি। এই ধরনের শর্তের অধীন ভাড়াটেদের অবস্থা কি হবে? স্যার, আমার সন্দেহ নেই এবং আমি নিশ্চিত যে আমি কিছু বাড়িয়ে বলছি না, এই প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দু বা মুসলমান সবার উপর শর্ত যদি করা হয় যে, কোনও ব্যক্তির প্রার্থনার জন্য বাড়ীর অঙ্গন মুক্ত করতে হবে, তাহলে বাড়ির গোপনতা ধ্বংস করা হবে এবং তা মুসাফির খানায় পর্যবসিত হবে। আমার সন্দেহ এই যে, অ-মুসলমান কারোর ওপর এই শর্ত আরোপ করা শক্ত হবে। এতেও সন্দেহ নেই যে, কোনও ইউরোপীয় বাসিন্দার ক্ষেত্রে এই শর্ত চাপানো মুসকিল। আমি সাহস সঞ্চয় করে এটাও বলছি, মুসলমান বাসিন্দা আমার বন্ধু যে ধরনের শর্তের কথা বলছেন, তা সহজে মানবেন না। এটা পরিষ্কার মাননীয় সহকর্মী প্রস্তাবে উল্লিখিত ধরনের বাড়ি যাবতীয় ধর্মীয় প্রবণতাসহ ভোগদখল করলেও গাদা লোককে প্রার্থনার জন্য বাড়িতে ঢুকতে দেবেন না। স্যার, আমি দুঃখিত, যেসব কারণ উল্লেখ করেছি, এবং আমার ধারণা মাননীয় বন্ধুও স্বীকার করবেন যে কারণগুলি ক্ষণস্থায়ী নয়। সেজন্যই আমি প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারছি না।

□ □ □

৩১

*কারখানা সংশোধন বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য) : স্যার, আমি পেশ করছি :

"কারখানা আইন ১৯৩৪, সংশোধনের জন্য এই বিধেয়ক বিবেচিত হোক।"

এই বিধেয়কটি খুব সাদামাটা ধরনের আইন এবং এটা অবিতর্কিত। বিধেয়ককে চারটি সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে এবং যেসব ধারায় সংশোধন করা হবে তা হল ৯, ১৯, ২৩, ৪৫, ৫৪।

৯ ধারায় কারখানার মালিককে কারখানা শুরুর আগে কারখানা পরিদর্শকের কাছে নির্দিষ্ট বিবরণ দিয়ে নোটিশ পাঠাবার বিধি রয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, এই ধারানুসারে কারখানার অধিকারীর কাছ থেকে কারখানা-পরিদর্শক নির্দিষ্ট বিবরণ চাইতে পারেন না, অধিকারীও তা দিতে বাধ্য নন। সম্প্রতি দেখা গেছে, কোনও কারখানার ভোগদখলকারী কারখানা শুরু করার সময়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে অস্বীকার করছেন, অথচ পরিদর্শকের পক্ষে সেটা পাওয়া দরকার। এই অসুবিধা দূর করতেই ৯ ধারা সংশোধন করা হচ্ছে এবং এই সংশোধন কারখানা পরিদর্শকের প্রয়োজনীয় তথ্য আদায় করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হয়েছে।

১৯ ধারায় জল সরবরাহ ও কারখানায় পরিষ্কার করার জায়গা সম্বন্ধীয় বিধি। এখন এই ধারার কারখানায় পরিষ্কারের ব্যবস্থা বলতে শুধুমাত্র শ্রমিকদের আঘাত ও নোংরা পদার্থ লেগে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই ধারায় কারখানার মালিকদের এই দুইয়ের কোনটার জন্যই পরিষ্কার করার স্থানের ব্যবস্থা করতে বলা হয় নি। এখন প্রস্তাব করা হয়েছে, এই সীমাবদ্ধতা দূর করতে শ্রমিকদের কাজও সব ধরনের নোংরার সংস্পর্শে আসার দরুন পরিষ্কারের জায়গা করতে বলা হচ্ছে। কাজেই এই সংশোধনে পরিষ্কার করার স্থান নির্মাণ সব কারখানাতেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

২৩ ধারায় কারখানায় অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে। এখানেও দেখা গেছে এই ধারা ত্রুটিযুক্ত। এই ধারা প্রয়োগ ভোগদখলকারীর ইচ্ছাধীন। এতে

---

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ৪ এপ্রিল ১৯৪৪। পৃ: ১৯২৯

সরকারের হাতে ক্ষমতা দেওয়া নেই যাতে বিশেষ কারখানায় কটা অগ্নিনিরোধক থাকা উচিত তা সরকার নির্ধারণ করে দিতে পারে। পরে এই বিধেয়ক দিয়ে ২৩ ধারা সংশোধন করা হয় যাতে সরকার প্রয়োজনীয় অগ্নিনির্বাপকের নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষমতা পায়, বিশেষ করাখানায় পরিস্থিতি অনুযায়ী কটা অগ্নি নির্বাপক দরকার সেটা কারখানা-পরিদর্শক ঠিক করতে পারেন।

এর পর ৪৩ ও ৪৫ ধারা সম্পর্কে অবস্থাটা এই রকম। কারখানায় কর্মরত শিশু ও মহিলাদের কাজের ঘণ্টা কত হবে, সে নিয়েই এই দুই ধারা। এই দুই ধারায় বিশেষ প্রয়োজনে কাজের ঘন্টা কত হবে সেটাও রয়েছে। বর্তমান সংশোধনে কারখানায় মহিলা ও শিশুর কাজের ঘণ্টা পরিবর্তনের কথা নেই, বিশেষ প্রয়োজনে ১৩ ঘণ্টা কাজের বিষয়েও এই সংশোধনের প্রস্তাব নেই। বর্তমান সংশোধন শুধুমাত্র প্রয়োজনে কাজ শুরুর সময় রাত ৭-৩০ এর বদলে রাত ৮-৩০ করেছে। এই পরিবর্তনটা দরকার হয়ে পড়েছে দুটি কারণে। প্রথমত: ভারতীয় 'স্টান্ডার্ড টাইম' পরিবর্তন, এবং দ্বিতীয়ত: বিদ্যুৎ বাঁচানো।

স্যার, আমার মনে হয়, বিধেয়কেটির ধারা নিয়ে আর বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই। আমি প্রস্তাব উথাপন করছি।

সভাপতি (মাননীয় আবদুর রহিম) : প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে :

"কারখানা আইন ১৯৩৪ সংশোধনের জন্য এই বিকেয়ক বিবেচনার জন্য রাখা হোক।"

আমি দেখছি সংশোধনের নোটিশ দিয়েছেন মৌলভি মহম্মদ আবদুল গনি, কিন্তু তিনি সভায় নেই। কাজেই সভার বিলটির আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুহম্মদ নাওমান (পাটনা ছোটনাগপুর-উড়িশা : মুসলমান) : স্যার, আমি এই বিধেয়ক ও এর নীতি সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যের বক্তব্যের সাথে একমত। আমার একমাত্র আপত্তি হল, মাননীয় সদস্য ব্যবসায়ী ও তাদের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় উদ্যোগী হন নি, এই সংশোধন দরকার কি না সেটা বোঝার পক্ষে তারাই যথার্থ। আমার আশঙ্কা, ১৯ ধারায় যেভাবে বিধি-নিষেধের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে কারখানা পরিচালকদের বা নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠাকারীদের আরও অসুবিধা হবে। এটাই আমার কাছে একমাত্র অসুবিধা। আমি যদি নিঃসন্দেহ হতে পারি যে, সরকার কষ্ট করে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মতামত সংগ্রহ করেছে এই বিষয়ে, আমি এটা সমর্থন করতে আনন্দিত হব।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, মাননীয় বন্ধু মুহম্মদ নাওমান যে প্রশ্ন তুলেছেন সে সম্বন্ধে বলতে চাই যে, সারা ভারতের কারখানা-পরিদর্শকের সম্মেলনের সুপারিশ অনুযায়ী এই বিধেয়ক রচিত। তাঁরাই মনে করেছেন, এই বিধেয়ক অভিজ্ঞতালব্ধ নানা কারণে ত্রুটিযুক্ত। সরকার সারা ভারতের কারখানা-পরিদর্শকের সম্মেলনের সর্বসম্মত সুপারিশ কার্যকরী করেছে মাত্র। আমার জানা নেই, হাতে কোনও কাগজপত্রও নেই যার সূত্রে আমি বলতে পারি, চেম্বার অব্ কমার্সের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, কি না। কিন্তু আমার ভাবা উচিত ছিল যে, কারখানা আইন বিষয়ে চেম্বার অব্ কমার্স যোগ্য সংস্থা নয় আদৌ। আমার বিশ্বাস, মালিকদের সংস্থার সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হচ্ছে :

'কারখানা আইন, ১৯৩৪ আরও সংশোধন করার জন্য বিধেয়ক বিবেচিত হোক"। প্রস্তাব গৃহীত হল।

মিঃ সি. সি. মিলার (বাংলা : ইউরোপীয়) : স্যার, আমি প্রস্তাব পেশ করছি :

"বিধেয়কের খণ্ড-২-এ প্রস্তাবিত (চ) উপধারায় নিম্নোক্ত শব্দ যোগ করা হোক : 'এই আইনের উদ্দেশ্যে'।"

স্যার, এই সংশোধন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারি। মূল ৯ ধারা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য ইতিমধ্যেই বলেছেন, বিশেষ কয়টি শিরোনামে তথ্য কারখানার মালিককে কারখানা পরিদর্শককে জানাতে হবে। ঘটনাক্রমে সন্দেহ করা যেতে পারে, বিধেয়কের ৭৭ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধন ধারার দরকার আছে কি না, কারণ আরও তথ্য দরকার হলে ঐ ধারাতে ফাঁক পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সরকারের সংশোধন ঠিক আছে ধরে নিলেও আমাদের ধারণা, এতে একটা বিরাট সংশোধনের মধ্যে অনেক কিছু ঢোকানো হচ্ছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য। আমরা যা চাই তা হচ্ছে, কারখানার পরিদর্শককে কারখানা আইন-য়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য চাইবার ক্ষমতা দিতে হবে। আশা করি যে, মাননীয় সদস্য এই সামান্য সংশোধন গ্রহণ করবেন।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : সংশোধন উত্থাপিত হল :

"বিধেয়কের খণ্ড ২-এ প্রস্তাবিত (১) উপ-ধারায় (চ) অংশে নিম্নোক্ত শব্দ যুক্ত করা হোক : 'এই আইনের উদ্দেশ্যে'।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই সংশোধন গ্রহণ করছি।

সভাপতি (মাননীয় স্যার, আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হল :

"বিধেয়কের খণ্ড ২-এ প্রস্তাবিত (১) উপধারার (চ) অংশে নিম্নোক্ত শব্দ যোগ হবে : 'এই আইনের উদ্দেশ্যে'।"

প্রস্তাব গৃহীত হল।

সংশোধিত আকারে খণ্ড ২ বিধেয়ক যুক্ত হয়।

৩, ৪, ৫ খণ্ড বিধেয়ক যুক্ত হল।

খণ্ড ১ বিধেয়কে যুক্ত হল।

শিরোনাম ও প্রস্তাবনা বিধেয়কে যুক্ত হয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি প্রস্তাব উত্থাপন করছি :

"এই বিধেয়ক সংশোধিত আকারে গৃহীত হোক।"

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রশ্ন হল :

"বিধেয়কটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হোক।"

প্রস্তাব গৃহীত হয়।

□ □ □

৩২

*কয়লাখনি শ্রমিক-কল্যাণ তহবিলের পরামর্শদাতা কমিটি

গত জানুয়ারিতে জারি করা কয়লাখনি শ্রমিক কল্যাণ অধ্যাদেশ পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি পরামর্শদাতা কমিটি বসায়। কমিটি গঠন সম্পূর্ণ হলে তাতে থাকবেন শ্রম দফতরের সচিব, কয়লা-মহাধ্যক্ষ, শ্রমিক-কল্যাণ উপদেষ্টা, প্রধান খনি-পরিদর্শক, রেলওয়ে বোর্ড মনোনীত একজন, বাংলা সরকার মনোনীত একজন, বিহার, বিদর্ভ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের মনোনীত একজন করে প্রতিনিধি ; ইন্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের একজন, ইন্ডিয়ান কোলিয়ারি ওনার্স এ্যাসো-র একজন, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ মাইনিং এ্যাসোসিয়েশনের একজন করে প্রতিনিধি দুজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার এবং কয়লাখনি মালিক বা শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রতিনিধি।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত ৫ জন কয়লাখনি শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার জন্য থাকবেন। চারজনকে ইতিমধ্যে মনোনীত করা হয়েছে। শীঘ্রই পঞ্চম ব্যক্তিকে মনোনীত করা হবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী পরামর্শদাতা কমিটিতে একজন মহিলা সদস্য থাকবেন এবং তাঁর মনোনয়ন অবিলম্বে করা হবে।

এই কমিটিতে ভারত সরকারের প্রতিনিধি রয়েছেন : শ্রী এস. লাল. সচিব, শ্রম দফতর, শ্রী আর. এস. নিম্বকর, শ্রমিক-কল্যাণ পরামর্শদাতা ; এবং ডব্লু. এইচ. কিরবি, প্রধান খনি-পরিদর্শক। রেলওয়ে বোর্ড, বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ সরকারের প্রতিনিধি : এ. ওর; এ . হিউজেস; আই. সি. এস. লেবার কমিশনার, বাংলা; এ. জি. বুন, আই. সি. এস. এ্যাডিশনাল ডেপুটি কমিশনার, ধানবাদ এবং সরদার বাহাদুর ঈশ্বর সিং, লেবার কমিশনার, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ। সর্বশ্রী জে. লাটিমার, এস. এফ. টার্লটন, এম. এন. মুখার্জী, আর. ডি. রাঠোড়, এবং এ. ই. ডগলাসকে মনোনীত করা হয়েছে কয়লাশিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে।

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, মে ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৫২২-২৩।

প্রথম সভা

কয়লা শ্রমিকের চারজন প্রতিনিধির মধ্যে সর্বশ্রী পি. ভট্টশালি, এবং এইচ. ঘোষাল ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার-এর অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং সর্বশ্রী নীরাপদ মুখার্জি ও চপল ভট্টাচার্য রয়েছেন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলির প্রতিনিধি। সর্বশ্রী এস. এন. মল্লিক ও ডব্লু. এন. বার্চ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মনোনীত হয়েছেন। পরামর্শদাতা কমিটির প্রথম বৈঠক হয় ধানবাদে, ২৭ এপ্রিল, ভারত সরকারের শ্রমিক সদস্য মাননীয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণে ডঃ আম্বেদকর গত ডিসেম্বরে ধানবাদে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বিবেচনার জন্য দুটি বিষয়ের কথা বলেন। প্রথমতঃ কয়লা উৎপাদনের সমস্যা, দ্বিতীয়, শ্রমিক সরবারহ নিয়মিত বজায়। তিনি বলেন সেই সভার সুপারিশ কাজে এসেছে। কয়লা উৎপাদনের সমস্যা পৃথকভাবে আলোচনা হয়েছে, এই সভায় ডাকা হয়েছে কয়লাখনি শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার জন্য। গত সভায় আলোচনা হয়েছে ভারত সরকার কয়লাখনি শ্রমিকদের কল্যাণার্থে তহবিল গড়ার জন্য একটা অধ্যাদেশ জারি করেছে এবং এই অধ্যাদেশের শর্ত অনুযায়ীই এই পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করা হয়েছে।

এরপর কমিটিতে পেশ করা খসড়া বিধেয়ক নিয়ে আলোচনা হয়, পরামর্শদাতা কমিটির বিন্যাস এবং তহবিল থেকে কল্যাণ প্রকল্পের ব্যয় সম্বন্ধে এই খসড়া। এই খসড়া বিধেয়ক পরামর্শদাতা কমিটিতে একটি সচিবালয় রাখার কথা বলা হয়, এর কেন্দ্রীয় দফতর হবে ধানবাদে, সভাপতির কার্যনির্বাহি ক্ষমতার অধীনে থাকবে এই দফতর। পরামর্শদাতা কমিটির কাজ-কর্ম চালাবার জন্য কয়েকটি উপ-সমিতি নিযুক্ত করবে। এই কমিটি একটি অর্থ নীতি বিষয়ক উপ-সমিতি তহবিল থেকে খরচ সম্বন্ধে পরামর্শ দেবে, একটি ওয়ার্কস সাব কমিটি নির্মাণ কার্য সংক্রান্ত প্রকল্প-এর খরচ সম্বন্ধে এবং বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ অসম প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি করে কোলফিল্ড উপ-সমিতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তহবিল থেকে ব্যয় সম্বন্ধে যাবতীয় পরামর্শ দেবে। উপ-সমিতি গঠনে সব কয়লাখনি মালিক ও শ্রমিকদের সমান প্রতিনিধি দেওয়া হবে।

তহবিল পরিচালনা

পরামর্শদাতা কমিটির সভায় বিধি নিয়ে আলোচনায় দেখা যায়, মঞ্জুরীকৃত বাজেটের মধ্যে প্রকল্পের ব্যয় সম্বন্ধে পরামর্শদাতা কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতির জন্য

প্রস্তাব করতে পারে। এইসব প্রকল্প দুই অংশে থাকবে—প্রশাসনিক খাতে সচিবালয়ের ব্যয়, সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি এবং বাধ্যতামূলক বা অনুমতিমূলক কল্যাণ কর্মসূচি প্রকল্প। বিধি অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা মালিক এজেন্ট বা ম্যানেজার যারা কয়লাখনি কল্যাণ-তহবিল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য টাকা পেয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের তাদের ওপর শর্ত আরোপ করার ক্ষমতা আছে। এই শর্ত আরোপ করা হবে যাতে অনুদান গ্রহণের নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়। পরীক্ষার জন্য পরিদর্শনের যাবতীয় সুযোগ দেওয়া হয় এবং মঞ্জুরীকৃত অনুদানের হিসাবপত্র রাখা হয়।

তহবিল থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা এজেন্ট বা ম্যানেজারকে টাকা দেওয়ার আগে কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট পক্ষকে শর্তপূরণের মুচলেকা দিতে বলবে। ঝরিয়া ও আসানসোল বোর্ড অব্ হেলথ, এবং ঝরিয়া ওয়াটার বোর্ড কার্যনিবাহি কর্তৃপক্ষ হিসাবে তহবিলের টাকা যতটা ব্যবহার করতে পারবে, কমিটিতে তাও আলোচনা হবে। বলা হয়, সৃষ্ট তহবিলের অর্থ কয়লাখনিতে চালু সংস্থাগুলি কল্যাণমূলক প্রকল্পে যাতে ব্যয় করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। কমিটি সভাপতির প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, অনুদানের টাকা স্থানীয় সংস্থাকে দেওয়া হবে কি না, সেটা সিদ্ধান্ত নেবে পরামর্শদাতা কমিটি। কমিটি আরও বিচার করে, কোন কাজে এখন-ই কল্যাণ তহবিল থেকে টাকা ব্যয় করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে যেসব কাজের ক্ষেত্র ঠিক হয় : কল্যাণকর্মে নিযুক্ত কর্মীদের খরচ, সচিবালয়ে নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, মধ্যপ্রদেশ ও বিদর্ভ বিহার, বাংলার ম্যালেরিয়া বিরোধী অভিযানের খরচ। অধ্যাদেশে কি হারে 'সেস' ধার্য হবে, কমিটি সেটাও আলোচনা করে।

□ □ □

৩৩

*অভ্রশিল্পের স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা

"ভারত সরকার এই শিল্পকে স্থায়ী ও দৃঢ় করার জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত" বিহারের কোডারমায় ২০ এপ্রিল অভ্রশিল্প সম্মেলনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি, বিহার সরকার, ব্যবসায়ী সংস্থা ও অভ্র শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের সামনে বক্তৃতায় মাননীয় শ্রমিক সদস্য ড: বি. আর. আম্বেদকর এই মন্তব্য করেন।

বিহার সরকারের পক্ষ হতে উপস্থিত ছিলেন মি: ই. সি. এনসোর্জ, পরামর্শদাতা, জে. এস. উইলকক, সচিব, রাজস্ব বিভাগ, এম. জেড খান, ডেপুটি কমিশনার হাজারিবাগ জেলা, শ্রী ডি. এল. মজুমদার, যুগ্ম সচিব, শ্রম দফতর, ড: ই. এল. জি. ক্লেগ, ডাইরেকটর, জিওলজিকাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, এবং জে. কে টি. ক্রসফিল্ড, সুপারভাইজরি ফিল্ড অফিসার, জিওলজিকাল সার্ভে, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

ড. আম্বেদকর বলেন, "ভারত সরকার যুদ্ধের পর বুঝে যে এখনকার মতো আর অভ্র শিল্পে একচেটিয়া প্রভাব বজায় রাখা যাবে না। তিনি এই ইঙ্গিতও দেন, এই শিল্পকে স্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার একটি তদন্ত কমিটি বসাবার প্রস্তাব করবে, এই কমিটি অভ্র শিল্পের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সমস্যা পর্যালোচনা করবে।

কমিটির আলোচ্যসূচীতে থাকবে : অভ্র শিল্প নিয়ন্ত্রণ আদেশ রূপায়ণ, যুদ্ধ উৎপাদন এবং দীর্ঘমেয়াদী নীতির ওপর এই নিয়ন্ত্রণের প্রভাব, এবং সরকার কর্তৃক অন্যান্য নির্দেশ এর মুল্যায়ন ; দেশে ও বিদেশে বর্তমান বাজার ব্যবস্থা গুণগত মান বজায় ; মস্কোয় মূল অভ্র সরবরাহকারী দেশ হিসাবে ভারতের অবস্থান অন্য বিকল্প সরবরাহের দ্বারা কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এবং অভ্রের বিকল্প হিসাবে অন্যান্য দ্রব্যের

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, মে ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৫৩৩-৩৫

ব্যবহার এই শিল্পকে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে ; সম্পূর্ণ পণ্য উৎপাদনে অভ্রের ব্যবহার ; গবেষণা ও উন্নয়ন ; অভ্রশিল্প ও ব্যবসার উন্নতির সাধনে কেন্দ্রীয় অভ্র কমিটির মতো সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা পর্যালোচনা করা।

ড. আম্বেদকর জানান, তদন্ত কমিটিতে থাকবেন একজন সর্বক্ষণের চেয়ারম্যান, আংশিক সময়ের দু'জন সদস্য-এর মধ্যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিশেষজ্ঞ একজন, আরেকজন বহির্বানিজ্যে বিশেষজ্ঞ এবং একজন সর্বক্ষণের সচিব। কমিটির সাতজন মূল্যনির্নায়ক থাকবেন। এর মধ্যে দু'জন বিহার সরকারের, দু'জন বিহার ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি, মাদ্রাজ ও রাজপুতানা অভ্র ব্যবসার একজন করে প্রতিনিধি এবং একজন অভ্র শ্রমিক প্রতিনিধি। এছাড়া কমিটিতে থাকবেন দুজন প্রযুক্তি বিষয়ক পরামর্শদাতা, এর একজন হবেন জিওলজিকাল সার্ভের ডাইরেক্টর, অন্যজন বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের।

শ্রমিক কল্যাণ

শ্রমিক ও শিল্প সম্বন্ধে উল্লেখ করে শ্রমিক সদস্য বলেন, শিল্পকে সরকার সাহায্য করতে চাইলে এই শিল্পের শ্রমিকদের শোষণ বরদাস্ত করবে না। শ্রমিক সদস্য বলেন, সরকারকে দেখতে হবে শ্রমিক কল্যাণ বজায়ের স্বার্থে শ্রমিক যাতে নূন্যতম মজুরি চাকরির ভদ্রস্থ শর্ত, ও সাধারণ কল্যাণ কর্মসূচী পায়। সাধারণ নীতির উল্লেখ করে তিনি জানান শিল্প থেকে টাকা সংগ্রহ করে, যেমন কয়লার ওপর সেস বসিয়ে সরকার এই কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, কল্যাণ কর্মের ব্যয় যোগাতে শিল্পকে বিশেষ সেস বহন করতে হবে।

শ্রমিক সদস্য তাঁর বক্তৃতায় আগেই ভারতের অভ্র শিল্পের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিদ্যুত প্রযুক্তি শিল্পের অস্তিত্ব এবং দেশের প্রতিরক্ষায় এই শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। সারা বিশ্বে অভ্র সিট উৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালে ১৭.০১৮ মেট্রিট টন, এতে ভারতের উৎপাদন ছিল ১৪৫৯৮ মেট্রিক টন অর্থাৎ ৮১.৭%। তবু ভারতের শিল্প জগতে অভ্রশিল্পের ভুমিকা নগণ্য।

তিনি বলেন, 'আমরা বস্ত্র, সূতা ও পাট শিল্প নিয়ে অনেক কথা শুনি, কিন্তু ভারতের অভ্র শিল্পের উল্লেখ শোনা যায় না।' এর কারণ প্রসঙ্গে ড: আম্বেদকর দুটি বিষয়ের কথা বলেন—প্রথম, ভারতে উৎপাদিত অভ্র এই দেশে ব্যবহৃত হয় না। পুরো অভ্রই রপ্তানী হয় এবং ভারতের মানুষ সেজন্য নিরুৎসাহ। বাইরের দেশ থেকে লাভ অর্জিত হয় এবং ভোগ্যপন্য ব্যবহারকারীরা তাই অভ্র শিল্পের ব্যাপারে উৎসাহী নয়। দ্বিতীয় কারণ, এই শিল্পের অকেজো অসংগঠিত অবস্থা। তিনি সংখ্যাতথ্য

দিয়ে বলেন, ভারতে অভ্র সিট-এর উৎপাদন ১৯০৫-এ ছিল ১৭১৪ মেট্রিক টন ১৯৩৭-এ হয়েছে ১৪,৫৯৮ মেট্রিক টন। এই শিল্পের বিকাশের আরেক উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হল, মন্দার মরসুমে খনি ও কারখানাগুলিতে ৬০,০০০ শ্রমিক এবং বাড়িতে অভ্র ভাঙ্গার কাজে ১,০০,০০০ লোক নিয়োজিত থাকে। এই বিরাট বিকাশ সত্ত্বেও মিলওনার্স এসোসিয়েশন বা নর্দার্ন ইন্ডিয়া এমপ্লয়ারস ফেডারেশনের সমগোত্রীয় সংস্থা অভ্র শিল্পে নেই।

দস্যুবৃত্তি

এই পরিস্থিতির কারণ হিসাবে তিনি বলেন, এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট লোকজন পারস্পরিক হিংসা ও ঝাগড়ায় মত্ত। প্রত্যেকেই অন্যের মূল্যে নিজের জায়গা গোছাতে ব্যস্ত। এটা এক সর্ব প্রতিযোগিতা, সহযোগিতাহীন অবস্থা। শিল্পের ভবিষ্যত সম্বন্ধে শ্রমিক সদস্যের বক্তব্য, ভারত সরকার এই শিল্পকে স্থায়ী সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত। সরকার জানে যে, শিল্পের দুটি সমস্যা রয়েছে, একটা তৎকালীন সমস্যা, অন্যটি চূড়ান্ত সমস্যা যার সাথে দীর্ঘমেয়াদীনীতি জড়িত। অব্যবহিত সমস্যা হচ্ছে, অভ্র পাচারের সমস্যা। ভারত সরকারের ধারণা ছিল, সাধারণ পরিস্থিতিতে চুরি ও চোরা জিনিস ধরতে আইনশৃঙ্খলাজনিত আইনই যথেষ্ট, কিন্তু অভ্রের গুরুত্ব বিচার করে সরকার এই শিল্পকে সাধ্যমতো সাহায্য করতে ব্যগ্র। অভ্র নিয়ন্ত্রন আদেশ রয়েছে, দোষত্রুটি সত্ত্বেও এর দ্বারা পাচারের সংখ্যা রোধ করার ব্যবস্থা নেওয়া যায়। শিল্পে যুক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতার জন্য তিনি আর্জি জানান এবং আশ্বস্ত করেন যে সরকার দস্যুবৃত্তি রোধ করতে ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত।

প্রস্তাব স্বাগত

সম্মেলনে উপস্থিত শিল্পের প্রতিনিধিরা তদন্ত কমিটি গঠনের প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। প্রস্তাব করা হয়, এই কমিটি যুদ্ধপরবর্তীকালে অভ্র শিল্প পুনর্গঠনের প্রশ্নও পর্যালোচনা করতে পারে। আগে সম্মেলনে শিল্পের অব্যবহিত প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি ধরনের অভ্র ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা, সারটিফিকেট মঞ্জুরের ব্যাপারে জেলা শাসক এবং প্রাদেশিক সরকারের হাতে বিশেষ কর্তৃত্বদান, লাইসেনসপ্রাপ্ত এজেন্টের ব্যাপক সংখ্যা রোধ করা, অভ্র মজুত রাখার গুদামের এলাকা সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসন যন্ত্রের উন্নতি। ইঙ্গিত দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় সরকার এগুলির ব্যবস্থা করতে অভ্র নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ ১৯৪০ (Mica Control Order) সংশোধন করবে।

অভ্র শ্রমিকদের কল্যাণের ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য সুযোগ ও মহার্ঘভাতার বর্তমান ব্যবস্থা, বাসস্থানের অবস্থা জল সরবরাহ, চিকিৎসার সুযোগ এবং মজুরির ব্যাপারে পর্যালোচনা

৩৪

*ট্রেড ইউনিয়ন স্বীকৃতি বিষয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনা

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন (সংশোধনী) আইন , ১৯৪৩ অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে বাধ্যতামূলক স্বীকৃতিদান ও স্বীকৃতিদানের বোর্ড গঠন সম্পর্কে স্ট্যান্ডিং কমিটির পঞ্চম বৈঠকে-এ আলোচনা হয়, নতুনদিল্লিতে ড: বি. আর আম্বেদকরের সভাপতিত্বে এই বৈঠক হয় ২৭ জুন।

ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্র বিচার সম্বন্ধে কর্মচারী ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা তাদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। মালিকদের প্রতিনিধিরা সাধারণভাবে মালিক ও কর্মচারীদের একত্রে আনার ব্যাপারে স্বেচ্ছা সহযোগিতা ও আইনবহির্ভূত ভিত্তির ওপর জোর দেন। বলা হয়, ট্রেড ইউনিয়নরে সুস্থ বিকাশ হলে স্বীকৃতির ব্যাপারে কোনও অসুবিধা হবে না। শ্রমিক প্রতিনিধিরা বাধ্যতামূলক স্বীকৃতির ওপর জোর দেন সাথে সাথে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ও সুযোগ প্রসারে বিল সংশোধনের অবকাশ রাখার আর্জি জানান।

ব্যবসা বাণিজ্যিক বিবাদের পরিসংখ্যান

এরপর কমিটি ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক বিবাদের পরিসংখ্যান আরও উন্নত করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করে, যাতে তথ্য সমাহারে সঙ্গতি এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও অন্য দেশের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনার সুবিধা হয়। ১৯৪২-এর ইন্ডাস্ট্রিজ স্ট্যাটিসটিকস আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হয়। এই পদ্ধতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ব্যবস্থা অনুযায়ী হবে। এই প্রস্তাবে সাধারণভাবে সহমত হয়। কর্মচারীদের সংখ্যা নির্বিচারে অথবা ১০ জনের অধিক কর্মচারী বা শ্রমিক আছে এমন সংস্থার মালিকদের ওপর নোটিশ

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, জুলাই ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৫২ ও ৫৭

জারীর বিকল্প নিয়ে কমিটিতে আলোচনা করে। প্রস্তাবিত বিধি অনুযায়ী পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য খসড়া আইন ও ফরম কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রচার করা হয়।

কাপড়ের কল পরিদর্শন

বৈঠকের পর ড. বি. আর. আম্বেদকর ও স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির অন্যান্য সদস্যরা স্যার শ্রী রামের আমন্ত্রণে দিল্লি ক্লথ মিল পরিদর্শন করেন, সেখান তাঁরা উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি ও মালিকদের শ্রম কল্যাণ কর্মসূচি প্রত্যক্ষ করেন। স্যার, শ্রীরাম তাঁদের শ্রমিকদের বাসস্থানে নিয়ে যান এবং পানীয় জল, স্নানের জল ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা দেখান। শ্রমিকদের আবাসনে একটি বিদ্যালয়, একটি ওষুধের দোকান রয়েছে, গ্রন্থগারে একটি রেডিওতে অল-ইন্ডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত সিনেমার গান হচ্ছিল। ঐ পরিদর্শক দলটি একটি সাঁতারের পুলও দেখেন, সেখানকার জলের গভীরতা নতুনদের জন্য ও দক্ষ সাঁতারুদের জন্য ভিন্ন করা হয়েছে। শ্রমিকদের ক্লাবে কাবাডি খেলা হচ্ছিল। পাশেই এক শ্রমিকদের থিয়েটার"এ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য নাটক হয় শ্রমিকরাই এতে অভিনয় করেন। নিম্নোক্ত প্রতিনিধি ও পরামর্শদাতারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, ভারতীয় রাজ্যসমূহ, শিল্প মালিকদের সর্বভারতীয় প্রতিনিধি, এমপ্লয়ারস ফেডারেশন, এ. আই. টি. ইউ. সি, ভারতীয় শ্রমিক ফেডারেশন এবং অন্যান্য মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিরা যোগ দেন।

মাননীয় মিঃ এইচ. সি. প্রায়র, সচিব, শ্রম দফতর এবং এস. লাল. যুগ্ম সচিব (কেন্দ্রীয় সরকার) ; সরদার বাহাদুর ইশ্বর সিং, লেবার কমিশনার, নাগপুর এবং সি. কে. বিজয় রাঘবন, আই. সি. এস. লেবার কমিশনার, মাদ্রাজ (মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশ-বিদর্ভ) ; এস. ভি. যোশি লেবার কমিশনার এবং ভি.পি. কেনি, এ্যাসিসটেন্ট লেবার কমিশনার (বোম্বাই); এ. হিউজেস, আই সি. এস. লেবার কমিশনার বাংলা; জে. ই. পেডলে, আই. সি. এস. লেবার কমিশনার (যুক্তপ্রদেশ); এম. এইচ. মাহমুদ, ডাইরেকটর অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ, পঞ্জাব, এবং পি. কে. কাউল, আই. সি. এস. সরকারের সচিব, বিদ্যুৎ ও শিল্প দফতর, পঞ্জাব (পঞ্জাব, সিন্ধু এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ); এ. এস. রামচন্দ্রন পিল্লাই, লেবার কমিশনার অসম, ও ডাইরেকটর উন্নয়ন এবং চীফ ইনসপেকটর অব্ ফ্যাকটরিজ (অসম ও উড়িশা); কে. এস. শ্রীকান্তন, ডাইকেক্টর অব্ ইন্ডাস্ট্রিজ, ইন্দোর, বি. এস. দেশাই, এ্যাসিঃ ডাইরেকটর অব্ লেবার বরোদা এবং এন. ডি. গুপ্ত, লেবার অফিসার গোয়ালিয়র (বরোদা ইন্দোর ও গোয়ালিয়র প্রদেশ); ঈ. আই. চাকো, ডাইকেটর অফ ইন্ডাস্ট্রিজ ও লেবার কমিশনার, ত্রিবাঙ্কুর, এবং এম. এ. মির্জা রাজ্য শ্রম অফিসার হায়দ্রাবাদ, দাক্ষিণাত্য (মহিশূর

ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য); মীর মকবুল মাহমুদ (চেম্বার অব্ প্রিন্সেস); স্যার শ্রীরাম, কস্তুরিভাই লালভাই ও ডি. জি. মুলহালকর, সচিব, নিখিল ভারত শিল্প কর্মচারী সংস্থা (অল ইন্ডিয়া, অগার্নাইজেশন অব্ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ারস); এইচ. এস. টাউন, সি. সি. মিলার, এম. এল. এ; জে. লাটিমার ও টি. এস. স্বামীনাথন, সম্পাদক এমপ্লয়ারস ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া; এস. এস. সিরাজকর; ভি. চাক্কারাই চেট্রিয়ার; কাজি মুজতবা ও ভি. জি. বালওয়াক (এ. আই. টি. ইউ. সি.)। অধ্যাপক পি. এন. ব্যানার্জি যমুনাদাস মেহতা, আবদুস সাত্তার, ও ভি.জি. করণিক (ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অব্ লেবার), রায় বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায় (অন্যান্য কর্মচারী); এস. সি. যোশি এম. এল. সি এবং পি. টি. দিওয়ারা (অন্যান্য শ্রমিক)।

□ □ □

৩৫

*যুদ্ধোত্তর পর্বে দক্ষ শ্রমিকদের চাকরি

'বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ ছাড়া ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনাই সম্পূর্ণ হতে পারে না। এটা যন্ত্রের যুগ, যুদ্ধের পর সেইসব দেশই জীবনমান বজায়ের লড়াইএ থাকবে যেখানে এই প্রশিক্ষণ সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হবে। ভারত সরকার এই বিষয়ে অবগত নয় এমন না, সরকার কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বজায়ই নয়, সারা দেশে বিস্তার এবং শিক্ষাব্যবস্থার স্থায়ী অংশ রূপে দেখতে চায়।" ভারত সরকারের শ্রম বিষয়ক সদস্য মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর ২৪ অগাস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প পরামর্শদাতা কমিটির বৈঠকে এই বক্তব্য রাখনে।

শিল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষণ প্রকল্পেক উপযোগী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার মনোনীত এই কমিটিতে রয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা, শিল্প মালিকদের সর্বভারতীয় সংস্থার প্রতিনিধি, এমপ্লয়ারস ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া, বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স, সরবরাহ বিভাগ, রেলওয়ে বোর্ড ইনস্টিটুট অব্ ইঞ্জিনিয়ারস-এর প্রতিনিধিরা সভা তিনদিন চলে।

শ্রম বিষয়ক সদস্যের বক্তৃতা

শ্রম সদস্যের বক্তৃতার পুরো বয়ান নিম্ন রূপ:

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এবং এই সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ। আজকাল আমরা আমাদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনে এত ব্যস্ত থাকি যে কোনও বাড়তি কাজ এসে গেলে চাপ পড়ে। আমি আপনাদের প্রতি আরও কৃতজ্ঞ এইজন্য যে, কারিগরি

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, সেপ্টেম্বর ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ২৭৪-৭৭

প্রশিক্ষণ দেশের পরিবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার সরকারি প্রয়াসে আপনারা সহায়তা করছেন।

এই কমিটির কাজে আমি কত গুরুত্ব দিচ্ছি সেটা বলার অবকাশ রাখে না। শেষ মুহূর্তের একটু বাধা সত্ত্বেও আপনাদের সাথে দেখা করতে আমি কলকাতায় এসেছি এবং আপনাদের শুভেচ্ছা, আপনাদের কাজের সাফল্য কামনা করার জন্য এসেছি এর থেকেই বুঝবেন আমার বক্তব্য কতটা সৎনিষ্ঠ।

আপনারা আজ এখানে সমবেত হয়েছেন, কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে, এর প্রবর্তন হয়েছিল সামরিক বিভাগের জরুরি চাহিদা মেটাতে এবং এর ফলে ভারত অশ্রুতপূর্ব এক বিরাট আধা-দক্ষ শ্রমশক্তির অধিকারী। কারিগরি প্রশিক্ষণে কাজকর্মের মাত্রা সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়ার জন্য আমি কারিগরি প্রশিক্ষণের আদি থেকে এর ইতিহাস উল্লেখ করছি। সাড়ে তিন বছর আগে এর শুরু মূলত: একটি বাধা সামরিক বিভাগে প্রয়োজনীয় দক্ষ কারিগর সম্পন্ন লোকের অভাব দূর করা। এককালীন ৩০০০ লোকের প্রশিক্ষণের লক্ষ্য সামনে রেখে এর শুরু, দু' বছরের মধ্যে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হয় ৪৮,০০০, যার জন্য ৩৯৪ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দরকার হয়। ১৯৪২-এর শেষে সৈন্যবিভাগে আমরা ৫৪,০০০ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক সরবরাহ করি। জুন ১৯৪৪ মধ্যে আমরা ৭৫,০০০ প্রশিক্ষণরত লোক দিই, এর মধ্যে ৬৩,০০০ প্রতিরক্ষা বিভাগের কারিগরি বিভাগে যুক্ত হয়, ৩০০০ যায় অর্ডিনানস কারখানায়। আমি নিশ্চিত আপনারা একে এই কম সময়ে অল্প কৃতিত্ব বলে গণ্য করবেন না।

আগেই বলেছি, এই প্রশিক্ষণ প্রকল্প শুরু হয় যুদ্ধের সময়ে সৈন্যবিভাগের চাহিদার জন্য। সবাই বুঝছেন, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পথে, এবং কারিগরি প্রশিক্ষণের চাহিদা এবার কমে আসতে বাধ্য। যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দুটি প্রশ্ন বিবেচ্য: প্রথম হল: যারা ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং সৈন্যবাহিনীতে কাজে নিযুক্ত, কিন্তু যুদ্ধের পর কর্মচ্যুত হয়ে চাকরির জন্য অপেক্ষা করবেন, তাদের কি হবে? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কি হবে? কেউ কেউ ধরে নিয়েছেন, সরকার এই প্রকল্প বন্ধ করে দেবে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। এটা ঠিক যে সরকার কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করেছেন। এখন আমাদের রয়েছে ১৭০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখানে ৩২,০০০ জন শিক্ষা পেতে পারে, ১৯৪২ সালে ছিল ৪০০ কেন্দ্র ৪৫,০০০ প্রশিক্ষণরত। এর নানা কারণ ছিল, মূল কারণ দুটো। একটা হচ্ছে সৈন্যবিভাগের কম কাজের সুযোগ, অন্যটা হল ছোট কেন্দ্র চালু রাখার বিরাট খরচ।

সরকারের অভিপ্রায়

এইসব পদক্ষেপ থেকে বুঝা যায়, সরকার পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী যথাযথ সামঞ্জস্য সাধন করছে। এর ইঙ্গিত এই নয় যে সরকার কারিগরি প্রশিক্ষণ তুলে দিতে চাইছে। যদি তাই হত, সরকার এই কমিটি গঠন করত না। কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ ছাড়া দেশের ভবিষ্যত উন্নয়নের কোনও প্রকল্পই পূর্ণ হতে পারে না। বর্তমান যুগ যন্ত্রের যুগ, যুদ্ধের পর সেইসব দেশই জীবনমান বজায়ের লড়াইয়ে টিকে থাকবে যেখানে কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত। ভারত সরকার এইসব বিষয়ে অজ্ঞ নয়, কারিগরি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বজায়ই নয়, সারা দেশে তার ব্যপ্তি ও শিক্ষার স্থায়ী অংশ হিসাবে সরকার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে রাখতে চায়।

শিল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরি

সরকারের লক্ষ্য এই, তবে প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরি প্রাপ্তির ওপর। প্রশিক্ষণ পাওয়ার পর শিক্ষার্থীরা যদি চাকরি না পায় তবে কারিগরি শিক্ষণ প্রকল্প ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পাশ করে আসা ছেলেদের প্রতি শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গি কি হয়, তার মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত। শিল্প এদের চাকরি দিতে অস্বীকার করলে স্বভাবতই কেউ কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে মাথা ঘামাবে না, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম এড়ানো সম্ভব হবে যদি দেশের শিল্পগুলি আমাদের শিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরি দিতে ইচ্ছুক হয়।

৬০০০ উদ্বৃত্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মধ্যে শিল্প মাত্র ৩০০০ জনকে নিয়েছে। বাস্তবে তারা অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করে এই আশায় যে, তারা যথাযথ দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ চাকরির মধ্যে বা শিক্ষানবিশ থাকাকালে অর্জন করে নেবে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলি থেকে শিক্ষণপ্রাপ্তদের নেওয়ার বিরুদ্ধে নানা কারণ থাকতে পারে। আমার কাছে অভিযোগ এসেছে যে, আমাদের প্রশিক্ষণ যথেষ্ট উপযোগী নয়। পূর্ত শিল্প আমাদের প্রকল্পের লোকদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত কারিগরি লোক চায়, যুদ্ধের চাপে আমরা চেষ্টা করেছিলাম ৮ মাসে কারিগরি শিক্ষণ দেব, যেটা যুদ্ধের আগে লাগত ৫ বছর। আমি অবশ্য সন্তুষ্ট যে শিল্পের চাহিদা মেটাতে প্রশিক্ষণ প্রকল্প পুরো ৫ বছর করার দরকার হয় না। অন্যান্য দেশে যুদ্ধকালীন কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে জোরদার প্রশিক্ষণ দিয়ে আধা দক্ষ লোকদের বেশিরভাগ শিল্পের জন্য উপযোগী দক্ষ করে তোলা যায়।

শিল্পের দায়িত্ব

সুতরাং, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সাথে আরও কিছু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকদের স্বীকার করে নেওয়া উচিত পূর্ত শিল্পের। অবশ্য আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত যে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রকল্পে গলদ রয়েছে। আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের শিল্পের পক্ষে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কোনও পরিবর্তনের প্রস্তাবও আমি মেনে নিতে রাজি। কিন্তু শিল্প যদি আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের চাকরি দিতে রাজি না হয় তবে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পে কোনও ভবিষ্যৎ নেই। সুতরাং শিল্পকে বুঝতে হবে যে তাদের কাঁধে এ ব্যাপারে বিরাট দায়িত্ব।

ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা শিল্পের চাহিদার ব্যাপারে আমার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। আমি যেটুকু বলতে পারি, প্রকল্প সফল করতে হলে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষকেই এর ভবিষ্যত নির্ধারনে সাহায্য করতে হবে। নষ্ট করার মতো সময় আর নেই, নতুবা আমরা হয়ত দেখব শুধু যুদ্ধে জেতাই হয়েছে, শান্তির জন্য আমরা কিছুই করি নি। আগেই বলেছি, আমাদের সামনে দুটি বিষয় রয়েছে :

১) যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য ও নির্দিষ্ট সময় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর তাদের চাকরির ব্যবস্থা করা,

২) যুদ্ধ পরবর্তীকালীন শিল্প পুনর্গঠনের অংশ হিসাবে প্রশিক্ষণ প্রকল্প আবার ঠিক করা। এই দুটিই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং আমরা পৃথকভাবেই দুটির মোকাবিলা করব। সেজন্যই আমরা দুই পর্বে অগ্রসর হওয়ার কথা ভেবেছি। দ্বিতীয় পর্বে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল: বর্তমানে শিল্পের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে মেটাতে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কি কি পরিবর্তন করা দরকার। এর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী নীতির ব্যাপার রয়েছে, দেশের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কারিগরসম্পন্ন লোকের ব্যবস্থা করাও রয়েছে।

দক্ষ শ্রমিকদের চাকরি

অন্যদিকে প্রথম পর্বে যে সমস্যা প্রাসঙ্গিক হবে তা হল, আমাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে উত্তীর্ণ হওয়া হাজার হাজার দক্ষ শ্রমিক যারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করছে কিন্তু যুদ্ধের শেষে কর্মহীন হয়ে পড়বে, তাদের কাজের ব্যবস্থা করা। আমাদের আশা, আমাদের শিল্পগুলির পক্ষে এদের নেওয়ার অসুবিধা হবে না, বিশেষ করে যখন আশা করা যায়, যুদ্ধের পর পূর্ত শিল্পের প্রসার এবং তজ্জনিত কারণে দক্ষ কারিগরদের জন্য চাহিদা হবে।

আমাদের সামনে বর্তমান সমস্যা হচ্ছে, শান্তির সময়ের শিল্প কাঠামোয় এদের কীভাবে যোগ্য করা যায়, এ ব্যাপারে যেসব অসুবিধা রয়েছে তা আমরা পরীক্ষা করতে চাই এবং আগেই তার মোকাবিলার পরিকল্পনা করতে চাই। এ ব্যাপারে সাফল্য পেতে হলে দেখতে হবে চালু শিল্পের উপযোগী করতে হলে আরও কত প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণসূচির কতটা পরিবর্তন সংযোজন করা দরকার। আপনাদের আলোচনার থেকেই ঠিক হবে পরবর্তী পর্বে আমরা কতটা অগ্রগতি করতে পারব। দুটি পর্ব পরস্পর সম্পৃক্ত এবং দ্বিতীয়টা প্রথমটার থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আপনাদের থেকে বেশি সময় নিতে চাই না, কারণ আপনাদের সামনে বড় আলোচ্যসূচি রয়েছে। তবে শেষ করার আগে বলতে চাই, দেশের ভবিষ্যৎ উজ্বল করতে হলে দক্ষ কারিগরের যথাযথ সরবরাহ কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সরকার মালিকপক্ষ ও শ্রমিকদের ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা দিয়েই কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রকল্প দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। মালিক ও শিল্পপতিদের কাছে আমি বিশেষ আবেদন রাখতে চাই। তাদের বিশেষজ্ঞ সুলভ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক, তবে সরকার প্রচলিত প্রশিক্ষণ প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণে এদের সহযোগিতার মূল্য কম নয়।

আরেকটা কথা, এরপর আমি শেষ করব। সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত শিক্ষানবিশদের ভবিষ্যৎ কি বেকারি এবং কারা অদূর ভবিষ্যতে নাগরিক জীবন ফিরে পাবে? তারা যে কাজ দিয়েছে এবং ঝুঁকি নিয়েছে তার প্রতিদান কি এই? আমরা যদি এদের অবজ্ঞা করি, তবে এরা শিল্পে অস্থিরতার একটা উৎস হয়ে উঠবে। যুদ্ধের পর নাগরিক জীবনে ঠিকভাবে গৃহীত হলে এরা শিল্পকে স্থায়িত্ব দেবে। সৈন্যবাহিনী থেকে অর্জিত শৃঙ্খলাবোধ দিয়ে এরা অসামরিক শিল্পে শৃঙ্খলা আনতে সহায়ক হবে। অসামরিক চাকরিতে তাদের পুনঃকর্মোপযোগী করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিতে পারে সেটা আপনারা বলুন। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করছি, আপনাদের পরামর্শের জন্য সরকার শুধু কৃতজ্ঞই থাকবে না, সেইসব ব্যবস্থা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত হলে কার্যকরী করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

কমিটির আলোচনা

পরে কমিটি কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি শিক্ষানবিশদের শিক্ষার মান উন্নয়নের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। শ্রী এস. লাল. যুগ্ম সচিব, শ্রম বিভাগ সভাপতিত্ব করেন।

* * * * *

কর্মনিয়োগ কেন্দ্র পরিদর্শন

ড. বি. আর. আম্বেদকর ২৩ অগাস্ট কলকাতায় পৌঁছাবার পর শ্রী এস. লাল, যুগ্ম সচিব, শ্রম বিভাগ এবং লন্ডনের প্রাক্তন ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন-এর সঙ্গে কলকাতা কর্মনিয়োগ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শ্রম সদস্য কলকাতায় কর্মনিয়োগ কেন্দ্রপ্রকল্প-এর কাজকর্ম সম্পর্কিত নানা বিষয় এবং ন্যাশনাল সার্ভিস (টেকনিকাল পর্সোনেল) অধ্যাদেশ নিয়ে আলোচনা করেন, বাংলা সরকারের লেবার কমিশনার মি: এ. হিউজেস-এর সাথে কথা বলেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বন্ধ করায় বাংলার পক্ষে ভারত সরকারের নীতি নিয়েও আলোচনা হয়। কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত করতে আসা বহু সংখ্যক শ্রমিককে ড: আম্বেদকর দেখতে পান। মি: হিউজেস ও মি: বেনেট (কেন্দ্রের ম্যানেজার) নথিভুক্তির পদ্ধতি ও কার্মসূচি ব্যাখ্যা করেন ড. আম্বেদকর কাছে।

কর্মনিযুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি

শ্রম সদস্য লক্ষ্য করেন, কর্মনিয়োগ কেন্দ্রে নাম নথিভুক্ত ও এর মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগের সংখ্যা বেড়েছে। তাঁকে জানানো হয় সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাবে ১০২৯ জন কারিগরি শিক্ষণ কেন্দ্রের প্রাক্তন শিক্ষানবিশ কর্মনিয়োগে নাম নথিভুক্ত করেন, এর মধ্যে ৩৮৮ জন চাকরি পেয়েছেন। জানুয়ারী-জুলাই ১৯৪৪ সময়কালে ঐ কেন্দ্রে কারিগরি দক্ষ ২২৬৪ জন নাম লিখিয়েছেন, এর মধ্যে ৫৩৭ জন কাজ পেয়েছেন। বাংলার কারিগর প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সর্বশেষ তথ্যের এক সারনিও ড. আম্বেদকরকে দেখানো হয়। তাঁকে জানানো হয়, ২৪টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৪১৬৪ জনকে প্রশিক্ষশ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তাছাড়া ১৫টি বাড়তি বাইরের কেন্দ্রে ২২৭০ জনকে প্রশিক্ষশ দেওয়া যায়। এর ১৭ কেন্দ্র হচ্ছে টেকনিকাল ইনস্টিট্যুট, ২টি শিল্প সংস্থা। জুলাই ৩১, ১৯৪৪ অবধি ২৫৪০ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আসামরিক শিল্পে কাজ পেয়েছেন। শ্রম সদস্য ভারত সরকারের প্রেস ও কেন্দ্রীয় স্টেশনারি দফতরও পরিদর্শন করেন। ঐদিন পরে বাংলা সরকার নিযুক্ত শ্রমিক ইউনিয়ন পরামর্শদাতা কমিটির সদস্যদের সামনে বক্তৃতা দেন এবং ন্যাশনাল সারভিস লেবার ট্রাইব্যুনাল এর নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৩৬

*ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশন

ড. বি. আর. আম্বেদকরের ভাষণ

২৭ অক্টোবরের নতুনদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশনের শুরুতে ভারত সরকারের শ্রম বিষয়ক সদস্য ড: বি. আর. আম্বেদকর সভাপতিত্ব করাকালে প্রস্তাব করেন, দু'বছরের অভিজ্ঞতায় সম্মেলনের কাজে যে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা গেছে, তা দূর করতে গঠনতন্ত্র বদল করা হোক। তিনি প্রস্তাবে বলেন, সম্মেলনের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি দু'ভাগে তালিকাভুক্ত করা হোক :

তালিকা-১-এ সাধারণ বিষয়সমূহ, যেমন চাকরির শর্ত ও নিয়মাবলী, শ্রম আইন ও শ্রম আইন প্রশাসন ও শ্রমিক কল্যাণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি এবং তালিকা ২-এ থাকুক শ্রম আইন প্রশাসন ও শ্রমিক কল্যাণ বিষয়ক যাবতীয় বিষয়গুলি।

ড. আম্বেদকরে ভাষণের পূর্ণ বিবরণ :

"সভাপতির পক্ষে সমবেত প্রতিনিধিদের স্বাগত ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিয়ে বক্তব্য শুরু করা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। রীতি অনুযায়ী সভাপতিকে আরও কিছু বলতে হয়। আমাদের এই শ্রম সম্মেলনের মতো ক্ষেত্রে সভাপতির পক্ষে বিষয় নির্বাচন করা সহজ নয়। এটা দার্শনিকদের সম্মেলন হয়। সুতরাং তাঁর পক্ষে সামাজিক মূল্যহীন বুদ্ধিবৃত্তির কসরত দিয়ে নিজেকে সবকিছু থেকে মুক্ত করে পণ্ডিতের ভূমিকা পালন সম্ভব নয়। এটা সমাজ পুনর্গঠনের জন্য সম্মেলন নয়, এবং পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ ও অন্যান্য মতাদর্শ নিয়ে আলোচনায় তার প্রারম্ভিক ভাষণ পূর্ণ হোক সেটাও কাম্য নয়।

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, নভেম্বর ১৫, ১৯৪৪। পৃ: ৫৯০-৯৭

"এই সম্মেলন কোনও নীতিবাদী সমাজের সভায় নয়, এবং আবেগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়নার জন্য আবেদনপূর্ণ ভাষণ দেওয়া ঠিক নয়। শ্রম সম্মেলনের সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণ-এর শ্রেষ্ঠ রীতি কী তাও আমি জানি না। এই অধিবেশনের জন্য আমি বাস্তব সমস্যার ওপর বক্তব্য দিয়ে এই অসুবিধা দূর করতে চাই। আমি নিশ্চিত, আপনারা একে বেমানান বলে মনে করবেন না।

"দুটি বিশেষ বিষয় রয়েছে বলার, সম্মেলনের সদস্যদের কাছে যা উৎসাহজনক। প্রথমতঃ সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে এবং যেসব প্রশ্ন এই ও স্ট্যাডিং লেবার কমিটিতে আলোচনা হয়েছে তার একটা সমীক্ষা আপনাদের দেওয়া, এবং ত্রিপাক্ষিক সংগঠনের পদ্ধতি ও সংবিধানে যেসব ত্রুটি রয়েছে তা বলা।

"প্রথম বিষয়টি বিরাট এই ভাষণের পরিসরের বাইরে। এতে আপনাদের আলোচ্যসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক সময় নিয়ে নিত, যেটা আপনাদের পক্ষে অপচয় করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমি এনিয়ে একটা পৃথক স্মারকলিপি এই বক্তৃতার সাথে মুদ্রিত আপনাদের সামনে রাখার কথা ভাবছি। আপনারা ইতিমধ্যেই সেটা পেয়ে গেছেন। এটা আমার বক্তৃতার অংশ হিসাবে গণ্য হতে পারে।

ত্রিপাক্ষিক সংগঠন

"আমাকে অন্য আরেকটা বিষয়ে বলতে হবে, বিশেষত: এই সম্মেলনের কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন নিয়ে। প্রকাশ্য সম্মেলন ও স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির কাছে আমাদের দু'বছরের অভিজ্ঞতা হয়েছে। এটা খুব দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলা যাবে না। খুব কম সময়ের মধ্যে আমাদের গড়া সংগঠনের দুর্বলতার বিষয়টি প্রকট হয়েছে। নিম্নোক্তগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ :

১) সম্মেলন ও স্ট্যান্ডিং কমিটির কাজের মধ্যে সীমারেক্ষা ভাগ করা নেই। এই নয় যে একটা স্বেচ্ছাকৃত সংস্থা ও অন্যটি কার্যকরী সংস্থা। দুটিই স্বেচ্ছাধর্মী।

২) এদের কাজে পরস্পরিক অন্তঃপ্রবেশ আছে। দুটির আলোচ্য বিষয় এক-ই ধরনের।

৩) সাধারণ প্রশ্ন ও নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে সুস্পষ্ট পার্থক্য না থাকায় সম্মেলন ও স্থায়ী সমিতির আলোচনা বড় সাধারণ, অকেজো হয়ে যায়, এমন কি সুনির্দিষ্ট সমস্যাও এমনভাবে বিবেচিত হয় যেন সেগুলি সাধারণ।

৪) বিশেষ সমস্যা পর্যালোচনা ও তা নিয়ে রিপোর্ট করার কোনও সংগঠনিক ব্যবস্থা নেই। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এর জন্য বিশেষ সংগঠনিক মাধ্যম গড়া দরকার।

৫) শিল্পওয়ারি শ্রমিক কল্যাণের সমস্যা পর্যালোচনা ও পরামর্শদানের মতো কোনও ব্যবস্থা নেই।

পৃথক সচিবালয়

"সম্মেলনের কিছু সদস্য দ্বিতীয় এক দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রম সম্মেলনের জন্য একটা আলাদা সচিবালয়ের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে তারা বলেন। প্রস্তাব করা হয়, একটা পৃথক সচিবালয় করে নিম্নোক্ত বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হোক :

ক) সভার প্রস্তুতিকার্য (অর্থাৎ কাগজপত্র প্রচার সভার দিন, আলোচ্যসূচি সম্বন্ধে সদস্যদের জানানো ইত্যাদি) :

খ) সভার কার্যবিবরণী লেখার প্রস্তুতি :

গ) সফর ও প্রচারপত্র মাধ্যমে প্রচার ;

ঘ) আর্থিক প্রশাসনের কাজকর্ম যেমন কর্মচারীদের বেতন, সম্মেলনে যোগদানকারী বেসরকারি সদস্যদের ভ্রমণভাগ দেওয়া ;

ঙ) আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তি রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা ; এবং

চ) সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা পর্যালোচনা।

"আরও দুটো ব্যাপারে অভিযোগের ভিত্তি রয়েছে। একটা হচ্ছে, শ্রম সম্মেলন ও স্থায়ী সমিতির আলোচ্যসূচি তৈরি করা নিয়ে। আলোচ্যসূচি তৈরির বর্তমান প্রথায় দুটো ত্রুটি রয়েছে। এক, সম্মেলনের সদস্য ও কমিটি সদস্যরা আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত তাদের দরকারী বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র ইচ্ছামতো পান না। দ্বিতীয় ত্রুটি হল, আলোচ্যসূচির সাথে দেওয়া স্মারকপত্র সদস্যরা এত দেরিতে পান যে তারা এ নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে আলোচনায় স্বকীয় মতামত দিতে পারেন না।

"আরেকটা ব্যাপার অভিযোগ উঠেছে সম্মেলন ও স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটিতে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে মালিকরা বলেছেন, মালিকপক্ষের তিনজন প্রতিনিধি মনোনয়ন করার ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা আপত্তিজনক। তাদের যুক্তি, এমপ্লয়ারস ফেডারেশন অব্ ইন্ডিয়া ও অল ইন্ডিয়া অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপ্লয়ারস

মালিকপক্ষের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা, কাজেই আরও প্রতিনিধি মনোনয়ন অপ্রয়োজনীয়। শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারেও একটা ত্রুটি রয়েছে যেমন, শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন এমন লোকদের কেউই শ্রমিক শ্রেণীর লোক নন।

"আপনারা স্বাভাবিকভাবেই চাইবেন, এক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা নিতে চায় সেটা আমি বলি। আমার দিক থেকে শ্রম সম্মেলন যাতে ঠিকমতো কাজ করে তার জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করার জন্য আমি ব্যাগ্র, সংগঠনের ত্রুটির জন্য এর কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হোক আমি চাই না। তবে আপনারা বুঝবেন যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার আগে এ ব্যাপারে অনেক পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজন। এইসব দুর্বলতার মধ্যে সরকার কয়েকটি পরীক্ষা করেছে ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আরও অনেকগুলি পরীক্ষা করা হয়নি। যেগুলি পর্যালোচনার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুলির উল্লেখ করব। এর মধ্যে আছে পৃথক সচিবালয়, আলোচ্যসূচি এবং প্রতিনিধিত্ব।

একটি মাত্র পরামর্শদাতা সংস্থা

"শ্রম সম্মেলনের জন্য পৃথক সচিবালয়ের দাবি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নজির অনুসরণ করেই হয়েছে বলে আমার ধারণা। সরকার মনে করে, আমাদের ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (I.L.O.) মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আই. এল. ও একটি স্বাধীন সংস্থা এবং এর সৃষ্টি ভাসাইয়ের শান্তিচুক্তি থেকে। এর রীতি ও সুপারিশ মেনে চলার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির এক নির্দিষ্ট দায়বদ্ধতা রয়েছে, এই নৈতিক বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করলে আন্তর্জাতিক দায় এসে পড়ে। নিজের সংবিধান দ্বারাই এই সংস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাছাড়া আই. এল. ও-র নিজস্ব অর্থ আছে, কোনও দায়িত্ব গ্রহণের জন্য একে অন্য কোনও রাষ্ট্র বা বিভাগের অনুগ্রহ দরকার পড়ে না।

"আমাদের ত্রিপাক্ষিক সংস্থা আই. এল. ও-র মতো সেই অর্থে স্বাধীন নয়। এর কোনও স্বাধীন অর্থনীতি নেই, থাকতে পারে না। শুধু একটি পরামর্শদাতা সংস্থা গঠন করা হয়েছে ভারত সরকারকে নানা উল্লেখিত বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য। এই সংস্থা কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এক্ষেত্রে তাদের অনুমতি দিলে আইনসভার কাজে হস্তক্ষেপ করা হবে। এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটা সুষ্ঠ যে শ্রম সম্মেলনের আলাদা সচিবালয় হলে সরকার ও সম্মেলনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেবে।

"এটা সত্যি যে আই. এল. ও-র দক্ষতা সচিবালয়ের জন্যই এবং ভাল উপাদান তৈরি করায় এর ক্ষমতার দরুন। তবে ভারত সরকার মনে করে যে 'গবেষণা ও তথ্য' ছাড়া অন্য সবগুলিই ভারত সরকারের শ্রম সচিবালয় দক্ষতা সহকারে সম্পন্ন

করতে পারে। 'গবেষণা ও তথ্য'-এর ব্যাপারে শ্রম বিভাগের কিছু প্রস্তাব বিবেচনাধীন রয়েছে, স্বকীয় কাজকর্ম পুনর্বিন্যাস করার জন্য শ্রম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংগঠন গড়ে তোলা হবে। এইসব কারণের জন্য ভারত সরকার এখনই ত্রিপাক্ষিক সংগঠনের জন্য পৃথক সচিবালয় করার পক্ষপাতী নয়।

আলোচ্য বিষয় ঠিক করার অধিকার

"আলোচ্য বিষয়ের প্রশ্নটি সরকার বিবেচনা করেছে। সরকারের সিদ্ধান্ত, আলোচ্য বিষয় ঠিক করার অধিকার সরকার ছাড়তে পারে না। সম্মেলন কোনও আইনসভা নয়। এটা পরামর্শদাতা সংস্থা মাত্র এবং সরকারই ঠিক করবে কি কি বিষয়ে পরামর্শ দরকার।

"সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়সূচি ঠিক করার অধিকার আর এক কারণে সরকার ছাড়তে পারে না। সরকারের পক্ষে কোনও বিষয়কে আলোচ্য বিষয়সূচিতে রাখার কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কেননা সেই বিষয়ে যথাযথ তথ্য সম্মেলনে পেশ করার মতো অবস্থা থাকলে একমাত্র তখন-ই এই বিষয় আলোচনায় সদস্যদের সাহায্য কাম সম্ভব এবং সদস্যরা সেই তথ্য পেলে তবেই স্বকীয় মতামত জানাতে পারে। যথোপযুক্ত নোটিশ ছাড়া সরকার এ বিষয়ে বক্তব্য পেশের জন্য তৈরি থাকতে পারে না। কিন্তু আলোচ্য বিষয় তৈরি করার অধিকার থাকলে সরকার সভার পরিচালনা পদ্ধতি বদলাতে পারে।

"বর্তমানে পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রম বিভাগ সভা শেষ হওয়ার পর সরকার মালিক পক্ষ ও শ্রমিক সংস্থাদের থেকে আগামী সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব আহ্বান করে আলোচ্যসূচি ঠিক করে। আলোচ্য বিষয়সূচি কোনও বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকার সম্মেলন বা কমিটির সাথে কোনও আলোচনা করে না। পরিবর্তিত পদ্ধতি অনুসারে যখনই সরকার, মালিকপক্ষ বা শ্রমিক সংস্থাগুলি প্রস্তাব পাঠাবে তখনই সরকার তা গ্রহণ করে বিষয়সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ ব্যাপারে তারা যদি ব্যর্থ হয়, সরকার প্রতিটি সভার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রস্তাব চাইতে পারে।

"অন্য যে পরিবর্তনটা সরকার গ্রহণ করতে রাজি তা হল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সরকারই নেবে, তবে আলোচ্য বিষয়সূচি রচনাকালে সব কটি প্রস্তাব আলোচনার জন্য প্রতিটি সভায় পেশ করা হবে। এর সূত্রে সরকার সদস্যদের ইচ্ছার বিষয়ে পরামর্শ করার সুযোগ পাবে, এবং সদস্যরাও তাদের অগ্রাধিকার সম্বন্ধে মত দিতে

পারবে। আমি নিশ্চিত আপনারা স্বীকার করবেন যে এটা বর্তমান অবস্থা থেকে এক বিরাট অগ্রগতি।

"সম্মেলনের বিন্যাস প্রশ্নে যেসব প্রস্তাব এসেছে তার যৌক্তিকতা আমি স্বীকার করি। মালিকদের দুটি সংস্থা দাবি অনুযায়ী যদি প্রতিনিধিত্বমূলক হয় তবে মালিকদের মনোনয়ন করার যুক্তি নেই। একইভাবে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শুধু তাদের কল্যাণ ও চাকরীর সমস্যাই নয়, তারা যাতে নিজেদের কাজ করার মতো দক্ষ হয়ে উঠতে পারে সেটাও দেখতে হবে। সব শ্রম সম্মেলনের পুরুষ ও মহিলা শ্রমিকদের যোগদান করার ব্যবস্থা দিয়ে এটা করা যায়। আমরা নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটা জানেন যে, সম্প্রতি কয়লাখনি কল্যাণ কমিটি যখন সংগঠিত কার হয়, সরকার কয়লাখনি থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা কর্মচারীকে ঐ কমিটিতে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়।

সংবিধান : কিছু প্রস্তাব

"কাজেই সরকার সম্মেলনের বিন্যাসে পরিবর্তন আনার বিপক্ষে নয়। একই সাথে, সরকার মনে করে যে এটা খুব জরুরী নয়, কিছুদিনের জন্য এটা স্থগিত রাখা য়েতে পারে। প্রথম ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনে বলেছি, যখন তখন গাছ উপড়িয়ে না ফেলে দেখতে হবে এটা শিকড় পেল কিনা। এটা গাছ মেরে ফেলার পদ্ধতি।

"আমি এখন সম্মেলনের গঠনতন্ত্রের দুর্বলতার বিষয় বলব। সরকার এই দুর্বলতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং এর নিরসন দরকার। কিন্তু সরকার কোনও সিদ্ধান্তে আসে নি। এ ব্যাপারে আমার মতামত কি আপনাদের সামনে রাখতে পারি? আমি সংবিধানে নিম্নোক্ত পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি:

১) সম্মেলনের আওতায় আসা বিষয়গুলিতে দুটি তালিকায় ভাগ করা। এবং নম্বর তালিকায় সব সাধারণ বিষয় থাকুক, যেমন (ক) চাকরির শর্ত ও নিয়মাবলী; (খ) শ্রম আইন: এবং (গ) সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়। দুই নম্বর তালিকায় থাকবে : (ক) শ্রমিক-কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়; (খ) শ্রম-আইন প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়। তালিকা-১-এর দায়িত্ব দেওয়া হোক পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনকে। আমার প্রস্তাব পূর্ণাঙ্গ ও ত্রিপাক্ষিক-এর বদলে একে বলা হোক শ্রম সম্মেলন।

২) শ্রমিক কল্যাণ কমিটি নামে এক নতুন সংস্থা সৃষ্টি করা হোক এবং খ-তালিকার বিষয়গুলি এর দায়িত্বে থাকুক।

৩) শ্রমিক কল্যাণ কমিটি গঠিত হোক এদের নিয়ে : (ক) স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ; (খ) সংগঠিত শিল্প এবং পুরসভা ও অন্যান্য শ্রমনিয়োগকারী সংস্থা থেকে একজন করে মালিক প্রতিনিধি ও শ্রমিক প্রতিনিধি ; (গ) সরকার মনোনীত বেসরকারি ব্যক্তি; (ঘ) ভারতীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ; (ঙ) প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ।

৪) স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির বিন্যাসে কোনও বদল হবে না। শুধু এর কাজে পরিবর্তন হবে। এটা স্বেচ্ছাকৃত সংস্থা হবে না। সম্মেলনের মাধ্যম হিসাবে এবং সম্মেলন সময় সময় যা কাজ দেবে সেই দায়িত্ব পালন করবে।

"এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনটি মুখপত্র থাকবে: সম্মেলন, স্থায়ী সমিতি ও কল্যাণ কমিটি।

সম্মেলনের কাজ ও ক্ষমতা হবে নিম্নোক্ত :

১) চাকরি শর্ত ও নিয়মাবলী সংক্রান্ত বিষয় এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক যাবতীয় প্রশ্ন যা আলোচ্য বিষয়সূচিতে রাখা যায়, সেসব সম্পর্কে সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

২) কোনও বিষয় বা তার সংশ্লিষ্ট কিছু ব্যাপার স্টান্ডিং লেবার কমিটির কাছে এই দিকনির্দেশসহ পেশ করা : (ক) সম্মেলনে বিষযটি আবার পেশ করা, বা (খ) সরকারের কাছে সুপারিশ করা।

৩) একটা এ্যাড হক কমিটি নিয়োগ করে আলোচ্য বিষয়সূচির বিশেষ বিষয় বিবেচনা ও রিপোর্ট করবে : (ক) সম্মেলন, (খ) স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটিতে, কমিটি সরকারের কাছে সুপারিশ ও সম্মেলনে আরও বিশদ রিপোর্ট দেবে।

স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির ক্ষমতা ও কাজ সম্মেলন ঠিক করে দেবে। এই কমিটি সম্মেলনের একটি এজেন্সি হবে এবং সম্মেলনের থেকেই কর্তৃত্ব অর্জন করবে, এবং নিম্নোক্ত ব্যতিক্রম ছাড়া সম্মেলনের দেওয়া দায়িত্ব ছাড়া কোনও কাজ করবে না। তবে সরকার ইচ্ছামতো কোনও বিষয়ে সরাসরি সম্মেলনকে সরাসরি সম্মেলনে বা সরকারকে মতামত দেওয়ার জন্য বলতে পারবে। কিন্তু সাধারণত: স্থায়ী সমিতির কোনও রিপোর্ট বা সুপারিশ সম্মেলনেই পেশ করা উচিত।

"স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির ক্ষমতা হবে ;

i) সম্মেলনের পাঠানো বিষয়ে সুপারিশ বা রিপোর্ট সম্মেলনকে দেওয়া ;

ii) কোনও ক্ষেত্রে সম্মেলন স্থায়ী সমিতিকে সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে বললে তা সরকারের কাছে সুপারিশ করা ;

iii) একটা এ্যাড হক কমিটি নিয়োগ, আলোচ্য বিষয়সূচীর কোনও বিষয়ে স্থায়ী সমিতির কাছে রিপোর্ট করতে বললে তা এই তদর্কা কমিটি করবে।

শ্রমিক কল্যাণ কমিটি

"শ্রমিক কল্যাণ কমিটির কাজ শ্রমিক কল্যাণ এবং শ্রম আইন প্রশাসনেই সীমাবদ্ধ থাকবে। কমিটিতে পেশ করা যাবতীয় বিষয় পর্যালোচনা ও সরকারের কাছে সুপারিশ করা" কমিটির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।

"যেসব সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা গেছে, তা দূর করতে এগুলিই আমার প্রস্তাব। এই সম্মেলনের সদস্য হিসেবে ব্যক্তিগত ক্ষমতাবলে এটা আপনাদের সামনে রাখছি। যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার কাছে খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হচ্ছে, এর গুরুত্ব দেওয়ার অবকাশ নেই। ভারত সরকার বিভাগীয়ভাবে এইসব প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখুক। যদি দেখা যায় এগুলি কার্যকরী করা সম্ভব, সরকারের সিদ্ধান্ত আপনাদের পর্যালোচনার জন্য রাখা হবে। এই সাংগঠনিক অসুবিধাকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি এবং জরুরী গণ্য করে আমি এর ব্যবস্থা করব।

"সম্মেলন সংক্রান্ত সব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সব কিছু আমি বলেছি, এর বিভিন্ন অংশের পুনর্গঠন, এর পদ্ধতি পুনর্বিন্যাস এবং পদগুলির সংস্কার। আশা করি আপনারা স্বীকার করবেন যে সরকার এর দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহী।

শ্রম আইনবিধি

"আরও দুটি ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই। বিধানসভার আগামী অধিবেশন শ্রম দফতরের পরিষদীয় কর্মসূচীতে তিনটি বিল রয়েছে: ফ্যাক্টরিজ এ্যামেন্ডমেন্ট বিল, সবেতন ছুটি সংক্রান্ত বিল হিসেবে পরিচিত: ট্রেড ইউনিয়ন এ্যামেন্ডমেন্ট বিল-এ ট্রেড ইউনিয়নের স্বীকৃতির বিষয় রয়েছে; এবং পেমেন্ট অফ ওয়েজেস এ্যামেন্ডমেন্ট বিল। প্রথম দুটি নিয়ে সম্মেলনে চর্চা হয়েছে। তৃতীয় বিলটা নতুন এবং আমাদের রীতি অনুসারে আপনাদের সামনে আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে।

"আপনারা জানেন, আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের ২৬তম অধিবেশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে গত এপ্রিলে হয়েছে। একটা ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগ দেয়। লন্ডনস্থ ভারতীয় হাইকমিশনার স্যার স্যামুয়েল রঙ্গনাথন এর নেতৃত্ব সি. ই. আই, আই. সি. এস., শ্রম সচিব, ডি. জি. মুলহারকার মালিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রী যমুনাদাস মেহতা, এম. এল. এ., আলতব আলি ও আর. আর. ভোলে কর্মচারীদের প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্মেলনে এঁদের বিরাট ভূমিকা ও মহান কাজের প্রকাশ্যে স্বীকৃতিদানে আপনারা আমার সহযোগী হবেন নিশ্চয়-ই। প্রতিনিধিদল একটা রিপোর্ট দিয়েছে, আপনাদের সমানে তা রাখা হয়েছে। আমি জানি, আপনারা এই রিপোর্টে অনেক কিছু জানতে পারবেন ও উৎসাহী হবেন।

"এতে আর কিছু যোগ করার নেই। সুতরাং আমার বক্তব্য ধৈর্য্য সহকারে শোনার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। সামনে যে দায়িত্ব রয়েছে আসুন আমরা সেই কাজ শুরু করি।"

ড. বি. আর. আম্বেদকরে স্মারকলিপি

ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলনের ও স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটিতে আলোচনার পর কেন্দ্রীয় সরকার যেসব ব্যবস্থা নিয়েছে, তার ইঙ্গিত রয়েছে শ্রম সম্মেলনে পেশ করা ড. আম্বেদকরের স্মারকলিপিতে। স্মারকলিপিতে যেসব বিষয় রয়েছে তার মধ্যে রয়েছে : ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মীমাংসা, শ্রমিক কল্যাণ, শিল্প শ্রমিকদের খাদ্য সরবরাহ, সরকারের চুক্তিতে যুক্তিসঙ্গত বেতনের ধারা, কর্ম নিয়োগ কেন্দ্র, শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, শিল্প সংস্থায় লেবার অফিসার, অনিচ্ছাকৃত বেকারী, শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব সামাজিক সুরক্ষা, মাগ্নীভাতা ও শিল্প কর্মচারীদের ক্যান্টিন।

মে, ১৯৪৩-এ অনুষ্ঠিত স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির তৃতীয় সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, ভারত সরকার কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপনের অগ্রনী হবে। কেন্দ্রীয় সরকার দক্ষ কর্মীর জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারির প্রস্তাব করে এবং তা গৃহীত হয়। এই উভয় প্রস্তাবই ইতিমধ্যে কার্যকরী হয়েছে। দক্ষ কর্মীদের চাকরীর জন্য বেশ কটি কেন্দ্রে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

এই সভায় সাধারণ মতামত ছিল নিম্নোক্ত বিষয়ের পক্ষে: ১) মীমাংসার মাধ্যমে অটুট রাখার জন্য আগের ধারা বজায় থাকবে এবং ২) ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের বিষয়টি নতুন করে প্রণীত হবে এবং এর জন্য পুরানো শ্রম-বিরোধ আইন ১৯২৯-এর স্থানে নতুন একটা আইন রচিত হবে আভ্যন্তরীন স্তরে মীমাংসা অগ্রাধিকার

দিয়ে। একেবারে নতুন বিধি প্রণয়নের বিষয় বিবেচনার আগে কেন্দ্রীয় সরকার উপরের (১) অংশটি প্রাদেশিক সরকারগুলির নজরে এনেছে, এইসব সরকার যথা সম্ভব পুরানো ধারা বজায় রেখেছে। ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের ব্যাপারে নতুন আইনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

বেভিন প্রশিক্ষণ প্রকল্প

এই সভা থেকে আর একটি বিষয়ের উদ্ভব হয়, সংগঠিত শ্রমিকদের বেভিন প্রশিক্ষণে নির্বাচনের জন্য ন্যাশনাল সারভিস লেবার ট্রাইব্যুনালের সাথে যুক্ত হওয়া দরকার এবং প্রার্থীদের নির্বাচিত করার সময়ে ট্রাইব্যুনালকে এলাকার প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে আলোচনা করতে হবে। শ্রমিক কল্যাণ কাজে কমিটির প্রস্তাব হল, আবাসন, শিক্ষা, ইত্যাদির জন্য কল্যাণ তহবিল গড়া, এটা সরকারের বিবেচনাধীন, কিন্তু স্মারকলিপি বলছে, কোনও বাস্তবসম্মত প্রকল্প রচনার অসুবিধা দুর্ভেদ্য।

জানুয়ারি, ১৯৪৩-এ স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির দ্বিতীয় সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শিল্প শ্রমিকদের খাদ্য মালিকদের মুদি দোকান মারফত সরবরাহ, এইসব দোকানে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নদের সহযোগী করা, শিল্প শ্রমিকদের জন্য সমবায় ভান্ডার স্থাপন ইত্যাদি সুপারিশ করা হয়। এইসব সুপারিশ সম্বন্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বড় শহর ও নগরে রেশন ব্যবস্থা ও ছোট শহরে এর প্রসারের পর এই সুপারিশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। কিন্তু রেশন কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব মালিকদের মুদীর দোকানের সাহায্য নিচ্ছে।

ন্যায্য মজুরি ধারা

মে, ১৯৪৩ স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির তৃতীয় সভায় সরকারি চুক্তিগুলিতে ন্যায্য মজুরীর ধারা রাখার ব্যাপারে যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছিল, স্মারকলিপিতে তার উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ত দপ্তরের চুক্তিগুলিতে ইতিমধ্যেই ন্যায্য মজুরীর ধারা অন্তর্ভুক্ত।

তাদের সংস্থাগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার সব বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানে লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার নিয়োগে সুপারিশ কার্যকরী করেছে। প্রাদেশিক ও রাজ্য সরকার এবং ব্যক্তি মালিকানার সবাইকে এটা করার অনুরোধ করা হয়েছে এবং ইন্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের রিপোর্ট অনুযায়ী এরা পার্সোনেল অফিসার নিয়োগও করেছেন।

কমিটির প্রস্তাব, বিবাদযুক্ত বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে মীমাংসার জন্য পাঠাতে হবে এবং সেইমতো ভারত রক্ষা আইন ৮১(ক) সংশোধন করা হয়েছে। যেসব শ্রমিকের

আচরণ তদন্তাধীন অথবা বিবাদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, বিচারের আগেই তাদের যাতে বরখাস্ত করা না যায়, তার জন্য রায় নির্দেশে ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। অবশ্য বিবাদের সাথে সংস্রবহীন ক্ষেত্রে অশোভন আচরণ বা বিচারকের বা অন্য কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে বরখাস্ত করার অবকাশ রাখা হয়েছে। মজুরি ও আয় সম্বন্ধে পরিসংখ্যান সংগ্রহ নির্বাচিত শিল্পে কাজের সময় নির্ধারণ সারা ভারতেই চালু করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে

অনিচ্ছাকৃত বেকারি

পঞ্চম শ্রম সম্মেলনের সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এর সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয় যে, কয়লার বা কাঁচা মালের অভাবের দরুন শ্রমিকদের অনিচ্ছাকৃত বেকারীর জন্য কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করা দরকার। কেন্দ্রীয় সরকার একটা নির্দেশিকা পত্রে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এ বিষয়ে কিছু নীতি গ্রহণের মাধ্যমে সাহায্য মঞ্জুর করতে বলেছেন, এবং এই চিঠির বিষয়টি রাজ্য সরকারগুলির কাছেও জানানো হয়েছে। এই অধিবেশনে শ্রমিকপক্ষ আইনসভা, স্থানীয় সংস্থা ও বিধিবদ্ধ কমিটিগুলিতে প্রতিনিধিত্বের পক্ষে জোরদার সাওয়াল করে। বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে, এবং স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে 'কেন্দ্রীয়' সরকারী কমিটিগুলিতে যেমন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সমীক্ষা, পুনর্নিমান নীতি উন্নয়ন কমিটি এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শদাতা কমিটিতে শ্রমিকদের প্রতিনিধি রয়েছেন।

মজুরি ও আয়

মজুরি ও আয়, চাকরি ও আবাসন এবং সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য একটি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত হয় এই অধিবেশনে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা সম্বন্ধে নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট তথ্য আহরনের লক্ষ্য নিয়েই এই সিদ্ধান্ত। এই প্রস্তাব অনুসারে একটি শ্রম অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয় এবং এর রিপোর্ট ১৯৪৫-এর মাঝামাঝি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। স্মারকলিপিতে বলা হয়, প্রাদেশিক ও রাজ্য সরকারসমূহ মালিকপক্ষ ও শ্রমিক সংস্থাগুলির সাথে ২৫০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্পসংস্থায় স্থায়ী নির্দেশ প্রচলনের বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভারত রক্ষা আইন বলে বিধিবদ্ধ ক্ষমতা দেওয়ার বিরুদ্ধে সবাই মতামত দেন। প্রস্তাব হয়, এই বিষয়ে যথাসম্ভব একটা স্থায়ী আইন প্রনীত হোক। এর মধ্যে দুটি সর্বভারতীয় মালিক সংস্থার কাছে অনুরোধ করা হয়, আইন প্রণয়নের অপেক্ষা না করে স্থায়ী নির্দেশ রচনা করুন। এই স্থায়ী নির্দেশাদি রচনায় মালিকদের সাহায্য করার জন্য একটি স্মারকপত্র রচিত ও প্রচারিত হয়।

স্ট্যান্ডিং লেবার কমিটির চতুর্থ সভায় বিধিবদ্ধ মজুরি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনা হয়, ফলে মজুরি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনা কি হবে, সে বিষয়ে একটা মোটমুটি সহমত হয়। কি কি শিল্পে এই আইন প্রযোজ্য হবে, সেই প্রশ্নটি শ্রম সম্মেলনের বর্তমান অধিবেশনে আলোচ্যবিষয়সূচীর মধ্যে ছিল।

শিল্প সংস্থায় ক্যান্টিন

বোম্বাই, বাংলা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ এই চারটি প্রদেশে কমিটি গঠিত হয়েছে, ব্যবসার সংজ্ঞায় মাপকাঠি আনার প্রশ্নটি এই কমিটি পর্যালোচনা করবে, কমিটিগুলির সুপারিশের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। এই সভার প্রস্তাব অনুযায়ী শ্রমিক প্রতিনিধিরা কর্মবিনিয়োগ কমিটির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এক্সচেঞ্জের সহযোগী হবেন কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র পরিচালনার ব্যাপারে ন্যাশনাল সারভিস লেবার ট্রাইব্যুনালকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এই কমিটি গঠিত হয়েছে।

শিল্প সংস্থায় ক্যানটিন খোলায় শ্রমিকদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে, স্মারকলিপিতে তার উল্লেখ আছে। তারা সরকার পরিচালিত বা শ্রমিক পরিচালিত বা যুক্তভাবে পরিচালিত ক্যান্টিনে প্রথম কন্ট্রাক্টর পরিচালিত ক্যান্টিনে শর্তাধীনে বিনা ভাড়ায় জায়গা এবং বিনা পয়সা আসবাবপত্র ও রান্নার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। রেশনের বাইরে রেশন দরে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহও মঞ্জুর করা হয়েছে।

□ □ □

৩৭

*কারখানা সংক্রান্ত বিধেয়ক দ্বিতীয় সংশোধনী কারখানার শ্রমিকদের জন্য সবেতন ছুটি

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) :

মহাশয়, আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি:

"১৯৩৪ সালের কারখানা আইনের (দ্বিতীয় সংশোধনী) সংশোধন করার জন্য এটি একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাছে পেশ করার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। নবাব সিদ্দিক আলি খান, খান বাহাদুর শেখ ফজল-ই-হক পীরাচা, শ্রী আর. আর. গুপ্ত, মি: এ.সি. ইনস্কিপ, স্যার ভিটল এন চন্দ্রভারকার, শ্রীরাও বাহাদুর, শ্রী শিবরাজ, শ্রী এন. এম. যোশি এবং প্রস্তাবক এই কমিটির সদস্য। এবং কমিটির সভা গঠিত হওয়ার জন্য যে সংখ্যক সদস্যের প্রয়োজন হবে তাদের সংখ্যা হবে পাঁচ।"

এই বিধেয়কের সংস্থানগুলি দুটি শ্রেণীতে পড়ে, এবং কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে বিধেয়কটি পেশ করা হবে আলাদা ভাবে তা যদি এখানে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে তা বুঝতে সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি।

এই বিধেয়কের প্রথম অংশে বলা হয়েছে কিভাবে বাধ্যতামূলক ছুটি নষ্ট হলে তার পরিবর্তে কিভাবে ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি দেওয়া যেতে পারে। সদস্যরা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে কারখানা আইনের ৩৫ নম্বর ধারায় কোনও কারখানার মালিক বা প্রবন্ধক কারখানার পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের সপ্তাহে একদিন বাধ্যতামূলক ছুটি দিতে বাধ্য। ৩৫ নম্বর ধারার এই যে সংস্থানের কথা বলা হয়েছে তা ৪৩ ও ৪৪ নম্বর ধারার উপরে নির্ভরশীল। ৪৩ নং ৪৪ নম্বর ধারায় এমন সংস্থান রয়েছে যাতে

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), চতুর্থ খন্ড, ৭ই নভেম্বর ১৯৪৪, পৃ: ৩৭২-৩৭৫

কারখানার পরিদর্শক কারখানার ম্যানেজার বা মালিককে এমন ছাড়ের সুযোগ দিতে পারেন যা ৩৫ নম্বর ধারায় যে শর্তে উল্লিখিত রয়েছে তা থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। এখন কথা হচ্ছে কখন ঐ ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হবে। বাধ্যতামূলক ছুটির দিনগুলিকে অন্য ছুটির দ্বারা পূরণ করতে হবে এবং তা হবে যতগুলি বাধ্যতামূলক ছুটিতে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হবে সমসংখ্যক অন্য ছুটির দ্বারা তা পূরণ করতে হবে। শ্রমিকদের দক্ষতা ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে হলে তাদের আইন মোতাবেক প্রাপ্য ছুটি দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান আইনে ক্ষতিপূরণ মূলক ছুটি দেওয়ার কোনও সংস্থান নেই। সেইজন্য এই অসংগতি দূর করার জন্য বিধেয়কটির দ্বিতীয় অংশটি এখানে সংযোজিত হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলি এ বিষয়ে যাতে আইন প্রণয়ন করে সেজন্য এটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে তবে এরজন্য প্রয়োজন হবে কিছু সমঝোতার। যেমন ৩৫এর ধারা অনুযায়ী যেখানে ছাড় দেওয়ার কথা বলা হবে সেখানে বাধ্যতামূলক ছুটির ক্ষেত্রে সমসংখ্যক ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি শ্রমিকদের দিতে হবে। এটিই হচ্ছে বিধেয়কটির প্রথম পর্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

শ্রম সম্মেলন—এখন আলোচনা করা যাক বিধেয়কটির দ্বিতীয় অংশ নিয়ে। এই বিধেয়কের সংস্থান রয়েছে তাতে শ্রমিকদের সবেতন ছুটির কথা বলা হয়েছে। এই বিধেয়কটির উৎপত্তি সম্পর্কে প্রথমেই সভাকে অবহিত করা ভাল। এই সভার অনেক সদস্যেরই স্মরণে আছে যে ১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে শ্রমিকদের সবেতন ছুটির বিষয়ে একটি চুক্তি হয়। ঐ আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। ভারত সরকার ঐ চুক্তি মানতে অনিচ্ছুক ছিলেন এবং সেজন্য এটি অনুমোদন করতে চাননি। এসম্পর্কে ১৯৩৭ সালের ২৬ শে জুলাই সরকারের পক্ষ থেকে আইনসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। ঐ প্রস্তাবে এই চুক্তি গ্রহণ না করার পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়। বিধানসভায় ঐ প্রস্তাবের ভারপ্রাপ্ত সদস্য বলেন, ঐ চুক্তি কার্যকর করার সব রকমের সম্ভাবনা সরকার খতিয়ে দেখছেন। পুরোটা না হলেও অন্তত অংশবিশেষ কার্যকর করার কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু তার আগে বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারসমূহ এবং নিয়োগকারী ও কর্মচারীদের সব সংস্থার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দেখা প্রয়োজন কিভাবে ঐ চুক্তির ব্যাপারে কতটা সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর দ্বিতীয় অংশটি হল বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা এবং খতিয়ে দেখার পর কর্মচারীদের সবেতন ছুটি দেওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে। বেশ কয়েক বছর ধরে বিষয়টি চলে আসছে।

দীর্ঘদিনের স্থায়ী কারখানা :- এখন বিধেয়কটি নিয়ে বিচার বিবেচনা করা থাক। দেখা যাবে এটি সব কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রযোজ্য শুধুমাত্র স্থায়ী কারখানার ক্ষেত্রে ১৯৩৬ সালের চুক্তিতে যে সব সংস্থান রয়েছে তবে তুলনায় এই বিধেয়কের সংস্থানগুলি অত্যন্ত সীমিত। বিধেয়কটির সংস্থানগুলিকে যদি চারটি অংশে ভাগ করা যায় তাহলে আশাকরি বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। শ্রমিকদের সবেতন ছুটির বিষয়টি নিয়ে বিধেয়কটি এখানে চারটি আলাদা আলাদা অংশে বিভক্ত করে দেখানো হচ্ছে। এগুলি হল: (১) কতদিনের ছুটি (২) ছুটির অধিকারের ক্ষেত্রে যোগ্যতা; (৩) শর্তের সীমিত করণ এবং (৪) ছুটির দিনগুলিতে বেতন এখন প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ কতদিনের ছুটি সে সম্পর্কে নতুন ধারা ৪৯ এর বি'তে বর্ণিত আছে। বিধেয়কে বিষয়টি কারখানা আইনে প্রযোজ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই বিভাগে বলা হয়েছে সে সব শ্রমিকের টানা একবছর চাকরী হয়েছে তাদের একনাগাড়ে সাত দিনের ছুটি নেবার অধিকার থাকবে। একথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করা যেতে কেন আমরা সাত দিন ছুটির কথা বলেছি? বেশি নয় কেন? এর উত্তরে বলা যেতে পারে সাত দিন যে ছুটির কথা আমরা বলেছি তা ১৯৩৬ সালের জেনেভা সম্মেলনের ভিত্তিতে। ঐ সম্মেলনে ছুটির দিন ছয় দিনে সীমিত করার কথা বলা হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা একদিন যুক্ত করেছি এই কারণে যে সপ্তাহে একদিন ছুটি বাধ্যতামূলক এবং ঐ দিনটি এর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। কারখানা আইনের ৩৫ নম্বর ধারায় কর্মীদের সপ্তাহে একদিন বাধ্যতামূলক ছুটির কথা বলা হয়েছে।

একজন শ্রমিক সাতদিন ছুটি পাওয়ার অধিকার কখন অর্জন করবে সে সম্পর্কে বিধেয়কে যে সব সংস্থান রাখা হয়েছে তা নিম্নে বর্ণনা করা হল। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে তারজন্য কেবল একটি মাত্র শর্তে আছে ক্রমে শর্তটি হচ্ছে তাদের একটানা বারো মাসের কাজ। এছাড়া অন্য কোনও শর্ত নেই। একটানা ১২ মাস কাজ বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে এই বিধেয়কে কিছু ছেদের কথা বলা হয়েছে এবং এই সামান্য ছেদ সবেতন সাতদিনের ছুটির ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না। বিধেয়কে যে সব ছেদের কথা বলা হয়েছে তা হল অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, স্বীকৃত ছুটি ভোগ, লকআউট এবং আইনানুগ ধর্মঘট ইত্যাদি জনিত করছে কারখানায় অনুপস্থিতি। এগুলি সাতদিন ছুটির ক্ষেত্রে অন্তরায় হবে না।

অনৈচ্ছিক বেকারত্ব : এই বিধেয়কে আরও একটি সংস্থান রয়েছে। এটি ঐ একই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি হচ্ছে অনৈচ্ছিক বেকারত্ব মালিকরা কারখানা বন্ধ করে এই অবস্থার সৃষ্টি করে। আমরা ঐ সময়কে ত্রিশ দিনের মধ্যে সীমিত

রেখেছি। কারখানা মালিকের মুখে ঐ অনৈচ্ছিক বেকারত্ব যদি শ্রম দিন অতিক্রম না করে তাহলে তা শ্রমিকদের সবেতন ছুটির ক্ষেত্রে কোনও প্রকার প্রভাব ফেলবে না। একথা এখানে বলার বোধ হয় প্রয়োজন আছে কেন আমরা ঐ সময়কে ত্রিশদিনে সীমিত রেখেছি। এখানে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের সবেতন ছুটি নির্ভর করে কারখানার ম্যানেজার বা মালিকের আর্থিক ক্ষমতার ওপর এবং এই বিধেয়কে ত্রিশ দিনের সময়সীমা নির্দেশ করা হয়েছে এই জন্য যে কারখানার ম্যানেজার বা মালিক কারখানা যদি ত্রিশ দিনের বেশি বন্ধ রাখে তাহলে ধরে নিতে হবে যে তার কারখানার কোনও ভবিষ্যৎ নেই এবং তার শ্রমিকদের সবেতন ছুটি দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু যদি এই সময়টা ত্রিশ দিন অতিক্রম না করে তখন মনে করতে হবে যে সে খরচ বহন করতে সক্ষম এবং তা তাঁর করা উচিৎ। এছাড়া এই বিধেয়কে সবেতন ছুটির ব্যাপারে সীমিত শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং সেই সীমিত শর্ত একজন শ্রমিকের মোট ছুটির সঙ্গে যুক্ত। এই বিধেয়কে এই সংস্থানও রাখা হয়েছে, যখন একজন শ্রমিক তার ছুটি জমা রাখার অধিকার অর্জন করে তখন দু'বছর ধরে যে তার ছুটি জমা রাখতে পারে। অর্থাৎ একজন শ্রমিক দু'বছরে মোট ১৪ দিন ছুটি জমাতে পারে।

ছুটির দিনে বেতন : ছুটির দিনগুলিতে বেতন সম্পর্কে আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমত যদিও মোট ছুটির দিন সাত তাসত্ত্বেও ছয় দিন সবেতন ছুটির কথা বলা হয়েছে। সপ্তমদিন সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি ত্রুটি হল সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন এবং ৩৫ নম্বর ধারায় এর সংস্থান রয়েছে। এই সপ্তম দিনে বেতন দেওয়ার সম্পর্কে মালিককে বাধ্য থাকার কথা এই বিধেয়কে বলা হয় নি। কিন্তু কর্মীকে ঐ দিন তার বেতন দাবী করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত করা হয় নি। সেখানে অবশ্যই একটি শর্ত থাকতে হবে যে তার চাকরীর শর্তে উল্লেখ থাকবে যে তার ঐ প্রাপ্য ছুটিটি সবেতন। তৃতীয়ত এই ছয় দিনে কর্মীদের কিভাবে বেতন দেওয়া হবে সেই বিষয়ে। এ সম্পর্কে আমরা এই বিধেয়কে যে সংস্থানের কথা বলেছি তা হল গড়। আমি মনে করি এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নিয়ম হল কর্মীদের তাদের তিন মাসের পূর্ববর্ত্তী বেতনের গড় হিসেব করে ঐ ছয় দিনের বেতন ঠিক করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে তাদের অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরি বাদ দিতে হবে। আমি মনে করি এটিই গ্রহণযোগ্যনীতি হওয়া উচিত। এছাড়া এই বিধেয়কে আরও সংস্থান রাখা হয়েছে কিভাবে একজন শ্রমিক ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে কিছুটা আর্থিক সুবিধা পেতে পারে। এইজন্য এই বিধেয়কে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রমিক ছুটিতে যাওয়ার পূর্বে তার ছুটির সময় প্রাপ্য অংশের অর্ধেক তাকে দিতে হবে।

এছাড়া এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টি হচ্ছে কোনও কারখানাকে এ বিষয়ে অব্যাহতি দেওয়া সম্পর্কে। যদি দেখা যায় কেমন কারখানার সবেতন ছুটির বিষয়টি চালু আছে যা এই বিধেয়কে উল্লিখিত সংস্থানের অনুরূপ এবং এ সম্পর্কে ঐ কারখানাকে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিদান। এই অংশের ব্যাখ্যা হল কারখানার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে এমন ঐচ্ছিক বোঝাপড়া থাকবে যেখানে আইন মোতাবেক শ্রমিককে কিছু সুবিধা দেওয়ার কথা থাকবে। এই ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ার বিষয় থাকলে সেখানে এই বিধেয়কে উল্লিখিত আইনের হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন হয় না।

মহাশয়, এই হচ্ছে এই বিধেয়কের প্রধান প্রধান বিষয়। আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি এ সম্পর্কে আরও দুটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। প্রথমটি হচ্ছে মালিক কর্তৃক শ্রমিককে বসিয়ে দেওয়া যাতে সে তার ছুটি পাওয়ার অধিকার অর্জন করতে না পারে। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে একজন শ্রমিকের ছুটি পাওনা থাকা সত্ত্বেও মালিক তাকে সেই ছুটি ভোগ করতে না দিতে পারে। আমি স্বীকার করছি এই বিধেয়কে এই দুটি বিষয় উল্লিখিত হয় নি। এমন নয় যে সরকার এটি জানেন না এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রকৃত বিষয় হল সরকারের অভিমত হল বর্তমান অবস্থায় কোনও প্রকারেই এই ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটছে তাহলে তা রোধে তাহলে এই আইনের সংশোধন করা যেতে পারে। এই মুহূর্তে আমার মনে হয় এই বিধেয়কে যে সংস্থান রাখছে তা কারখানার শ্রমিকদের সবেতন ছুটি মঞ্জুর করার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং আমি এই বিধেয়কটি পেশ করলাম।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাজ অপেক্ষাকৃত হালকা হয়েছে এই কারণে যে আমি বিধেয়কে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছি তার প্রতি একটা সাধারণ সমর্থন রয়েছে। এই কারণে এ বিষয়ে বিতর্ক চলাকালীন আমার উত্তর দেওয়ার সময় আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করব।

বরং আমি আমার মাননীয় বন্ধু ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমার বক্তব্য হল, তিনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে আসলে আমি কিছু বলতে চাইনা এবং আমি আশা করি এটি তার প্রতি কোনপ্রকার আমন্ত্রণ প্রদর্শন নয়। তিনি যা বলেছেন আমিও যদি তাই বলি তাহলে বিতর্কের জন্য যে বিধেয়কটি পেশ করা হল তার আর কিছুই করার থাকবে না। শ্রমিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি একটি অভিনব পদ্ধতির কথা বলেছেন এবং তা হল

অংশীদারিত্ব। আমি নিশ্চিত তিনি তার নতুন তত্ত্বে যে বিষয়ের অবতারণা করেছেন তাতে আমরা খুবই উপকৃত হব। আমি তাকে একথা সুনিশ্চিত করে বলতে পারি যখন আমাদের সাংবিধানিক কাঠামো নিয়ে আলোচনা হবে তখন তার বক্তব্য খুবই গুরুত্ব পাবে এবং তাতে শুধুমাত্র আমি যে একাই উপকৃত হব তাই নয়, এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকেই উপকৃত হবে।

এখন আসা যাক অন্য বক্তাদের কথায়, প্রথমে আমি আমার বন্ধু স্যার ভিঠল চন্দাভারকার যে পর্যবেক্ষণ করেছেন সেই কথাতে আসি। এই সভায় এর আগে স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস (Sir Frang Noyce) যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, তিনি তার উল্লেখ করেছেন। ছুটির দিনের বেতন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলন যে প্রস্তাব করে তিনি প্রস্তাবে তার উল্লেখ করেন। আমার প্রস্তাবে সে কথা নেই। যদি আমি তা করতাম তাহলে তিনি ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে যে কথার উল্লেখ করেছিলেন আমাকে তাই করতে হত। কিন্তু আমি তাকে বোঝানোর প্রয়োজন বোধ করেছি যে ভারত সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করেছেন।

স্যার বিঠল. এন. চন্দভারকার : না-না, তা নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ১৯৩৬ সালে তারা এতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু ঐ সম্মেলনের নীতি মেনে এখন তারা একে স্বীকৃতি দিতে চায়। এব্যাপারে ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। বিতর্কটি আমি বেশ যত্ন ও মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি এবং ভারত সরকার যে কারণে ঐ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়েছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট। এর কারণ হচ্ছে যদি ঐ প্রস্তাবকে স্বীকৃতি দিতে হয় তাহলে সামগ্রিকভাবে তা মেনে নিতে হবে। আংশিক ভাবে এটিকে জানা যাবে না এবং ভারত সরকারের পক্ষে তা ছিল অসম্ভব। কারণ, দেশের পরিস্থিতির পক্ষে তা অনুকূল ছিল না এবং এই কারণেই তা মানা হয়নি। সরকার যদিও এই নীতি গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না এবং সীমিতভাবে এর প্রয়োগ সম্ভব কিনা তা জানার জন্য বিষয়টি খতিয়ে দেখতে রাজী ছিলেন তবুও তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারে সামনে অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না।

আমার বন্ধু যোশি তাঁর ভাষণে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। আমাকে স্বীকার করতেই হবে তার বক্তব্যে দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি হচ্ছে যদিও আমরা এই বিধেয়কের পরিধিকে সীমিত করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই সীমিতকরণ শুধুমাত্র কারখানার ক্ষেত্রে এবং কোনও শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা এই

নীতি গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করিনি। আমি আগেই বলেছি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং ঐ একই সঙ্গে আমি একথা অবশ্যই বলব যে কোনও একটি শিল্পের ক্ষেত্রে যদি একে প্রয়োগ করা হয় তাহলে আমাদের এমন কিছু পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে যে যার মাধ্যমে ঐসব প্রতিষ্ঠানকে যাতে একটি বিশেষ শিল্পের আওতায় আনা যায় তার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এখন কথা হচ্ছে যদিও আমি বলেছি যে তিনি যে কথা বলেছেন তার সঙ্গে একটির ব্যাপারে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে তথাপি বর্তমান অবস্থায় কোনও প্রকার অভিজ্ঞতা ছাড়া সব কারখানাকে একটি বিশেষ শিল্পের আওতায় আনা সম্ভব নয় যাতে করে বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকদের বিভিন্ন সময়ের ছুটির বেতনের খরচ মেটানো যায়। ঠিক এই কারণেই এটি সামগ্রিকভাবে একটি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি যোশী উল্লেখ করেছেন তা হল তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে, এই আইনে যে ছুটির সংস্থান রাখা হয়েছে তা খুবই সংক্ষিপ্ত। আমিও মনে করি এটি ঠিক, সাতদিন অত্যন্ত কম ছুটি। কিন্তু সেখানে আমি অন্য এক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন। এই সমস্যা এমন যা আমি আশা করি যোশি এবং স্যার বিঠল চন্দভারকার বুঝতে সক্ষম হবেন। এই সমস্যার কারণ আমাদের শ্রমিকদের স্বভাব। যোশি এবং স্যার বিঠল চন্দভারকার উভয়ই জানেন যে শ্রমিকরা বিভিন্ন কারণেই দীর্ঘ ছুটি নেয় এবং তার ফলে তাদের এই খুশিমত ছুটি নেওয়ার অভ্যাস পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আমাদের শ্রমিকদের যদি বর্তমানের তুলনায় কারখানায় একটানা বেশী দিন কাজ করানোর জন্য প্রবৃত্ত করানো যায় অথবা সেইভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে আমি অবশ্যই বলবো যে তাদের জন্য বর্তমান যে ছুটির দিন ধার্য করা হয়েছে তার থেকে আরও বেশী দিন ছুটি ধার্য করার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেখানো যাবে; এবং আমি আশা করি বর্তমানে তাদের জন্য যে সাতদিনের ছুটি ধার্য করেছি আমাদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর উপর তার একটি অপ্রতক্ষ প্রভাব পড়বে এবং তারা একথা বুঝতে সক্ষম হবে যে যদি তারা বর্তমানের তুলনায় আরও বেশি একটানা কাজ করে তাহলে তাদের জন্য একটানা সাত দিনের বেশি ছুটির বিষয়টি আরও জোরালো হবে। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা বিচারে সাত দিনের বেশী ছুটি যুক্তিযুক্ত হবে না। এবং এই সময় সম্মেলনের সুপারিশ ক্রমেই ধার্য করা হয়েছে।

মহোদয়, এরপর আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে ,অস্থায়ী কারখানা গুলিতে এই আইনের প্রয়োগের পদ্ধতি নিয়ে। এ বিষয়ে আমার মাননীয় বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তুলেছেন? এ সম্পর্কে আমার উত্তর একই যেমন যে সমস্ত শ্রমিক

দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন এবং যথেষ্ট সংখ্যক ছুটি ভোগ করতে পারছেন না তাদের জন্যই সবেতন সাত দিন ছুটির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অস্থায়ী কারখানাগুলিতে শ্রমিকরা দীর্ঘদিন বিশ্রাম পায়। এমন হতে পারে যে এটি এক ধরনের ঐচ্ছিক বেকারত্ব। কিন্তু কাজ অথবা বেকারত্ব এই দৃষ্টিকোণ দিয়ে আমি বিষয়টি বিচার করতে চাই না। এই বিধেয়কের বিচার্য হল, বিশ্রামের দিন নিয়ে। অস্থায়ী কারখানায় শ্রমিকরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায় এবং স্থায়ী কারখানার শ্রমিক যারা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পায়না তাদের মত এদের সাতদিনের সবেতন ছুটির অত প্রয়োজন নেই।

মহোদয় স্যার ভিঠল চন্দভারকার একটি প্রশ্ন তুলেছেন। বিষয়টি হল কিছু সংশোধনী সম্পর্কে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেছেন 'অন্তত' শব্দটি নিয়ে। প্রাদেশিক সরকারগুলি কারখানায় মালিকরা যাতে সাতদিনের বেশী ছুটি দেয় শ্রমিকদের সে সম্পর্কে বাধ্য করতে পারে। এক্ষেত্রে আমি জানাতে চাই যে আমার আইনী উপদেষ্টার বক্তব্য অনুসারে সংশোধনী মেনে নিলেও প্রাদেশিক সরকারগুলি কারখানার মালিকদের শ্রমিকদের সাত দিনের বেশী ছুটি দেওয়াটা বাধ্যতামূলক করতে পারে না। স্যার বিঠল চন্দভারকার আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সেটি হল এই পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবে শেষপর্যন্ত হয়তো এই পদক্ষেপ গ্রহণ করার সম্ভব হবে? তার মতে শেষপর্যন্ত এটি করা উচিত। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই দুর্বল শিল্প বীমা আইন পাশের পূর্বে নয়। সরকার এখন বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এইমতের বিরুদ্ধে এবং আমার হাতে সময় থাকলে আমি আমার মতের সপক্ষে কিছু যুক্তি দেখাতাম। আমি তাকে অধ্যাপক আদারকারের মতামত পড়ে দেখতে বলতাম। অধ্যাপক আদারকার শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বীমা সম্পর্কে তাঁর মতামত দিয়েছেন। এটি হয়েছে তার বক্তব্যের ১১২ নম্বর পৃষ্ঠায় সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন কিছু জোরালো যুক্তির কথা। তাঁর বক্তব্য কর্মীদের সবেতন ছুটি তাদের অসুস্থ বিমার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক্ষেত্রে যদি কোনও দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় তাহলে শ্রমিকদের সামাজিক বীমার থেকে সবেতন ছুটির বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই প্রতিবেদনটি এখন আইনসভার সদস্যদের কাছে রয়েছে এবং ঐ প্রতিবেদনে অধ্যাপক আদারকার যা বলেছেন তার পুনরাবৃত্তি করে আমি তার সময় নষ্ট করবো না।

মহোদয়, এরপরেও কিন্তু রয়েছে আরও একটি বিষয়। উভয়পক্ষ থেকেই তা উত্থাপন করা হয়েছে। বিষয়টি হচ্ছে এই, যে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা বাধ্যতামূলক হবে না ঐচ্ছিক হবে। এই বিধেয়ক সম্পর্কে বলতে গেলে একথা

বলতে হয় এটি দুইয়ের মধ্যে এক চমৎকার সহাবস্থান। কারণ যে সব শ্রমিক বেশ কিছুদিন ধরে কাজ করছে তাদের জন্য সবেতন ছুটির সংস্থান করে এই বিধেয়কে আইনের মাধ্যমে তা বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে এব্যাপারে মালিক ও শ্রমিকদের সমঝোতার মাধ্যমেও বিষয়টি নিষ্পত্তির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই দেখেছেন যে, এই বিধেয়কে একটি অংশ আছে এবং তাতে বলা হয়েছে যদি সরকার দেখেন এই বিধেয়ক অনুসারে সবেতন ছুটির বিষয়টি চালু করা হয় এবং মালিক ও শ্রমিকপক্ষ বোঝাপড়ার মাধ্যমে ছুটির দিন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন সেক্ষেত্রে সরকার ঐ কারখানায় এই আইন প্রয়োগ হওয়ার ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিতে পারেন। আমি দেখিয়েছি, বিষয়টির সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের পরিস্থিতিরও সাদৃশ্য রয়েছে। ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী সবেতন ছুটির বিষয়ে সেখানে আইন আছে। ১৯৩৮ সালের ঐ আইনে ২৩ লক্ষ শ্রমিককে সুরক্ষা দেওয়া হয়। বাকী ৫০ লক্ষ শ্রমিক ঐচ্ছিক চুক্তিভুক্ত। এছাড়া আইনের বাইরে ৪০ হাজার ৭০০ শ্রমিক দীর্ঘস্থায়ী প্রচলিত ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত।

স্যার জেহাদির : এমন সংস্থান কোথায় আছে যার দ্বারা একজন মালিক শ্রমিকদের ছুটি দেওয়া স্থগিত রাখতে পারে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ঐ বিষয়ে যাচ্ছি।

মহোদয়, এখন আমি আর একটি বিষয়ে নিয়ে বলতে চাই। আমি আগেই বলেছি যে বিষয়টি হল বাধ্যতামূলক বনাম ঐচ্ছিক। আমার বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গ এবং চেট্টিয়ার অন্য যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন তাহল কোনও কারখানার মালিক তার শ্রমিকদের ছুটির অধিকার হরণ করার জন্য কোনও প্রকার অসদুপায় অবলম্বন করতে পারে এমন কোনও সংস্থান এই বিধেয়কে রাখা হয়নি। এ বিষয়ে আমি আমার প্রারম্ভিক ভাষণে উল্লেখ করেছি। আমি আমার উত্থাপিত প্রস্তাবে বলেছি যে এই ধরনের ঘটনা যে ঘটতে পারে, সে সম্পর্কে সরকার সচেতন। তার সরকার মনে করেন না যে তারা এই ধরনের কোনও পদক্ষেপ তারা নিতে পারে। তার থেকে সরকার বরং অপেক্ষা ও পর্যক্ষেণ নীতিতে বিশ্বাসী। সরকার অপেক্ষা করে দেখতে চান কোনও পক্ষ অন্য পক্ষকে টপকে কতদূর যায় তা দেখার জন্য। কিন্তু একথা আগেই বলেছি যে যারা শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের মনোভাব যদি এ সম্পর্কে যুক্ত হয় তাহলে তারা বিষয় নির্বাচনী কমিটিকে প্রভাবিত করে মালিকপক্ষ যাতে খুশিমতো শ্রমিকবিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারে সেজন্য এই বিধেয়কে কোনও সংস্থান রাখার জন্য চেষ্টা করতে পারেন। তারা তা খোলাখুলি

ভাবেই করতে পারেন এবং তাতে কাজ হবে। সরকার একে নীতি বহির্ভূত কাজ বলে মনে করেন না এবং এটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে যাওয়ার ব্যাপারে বিরোধিতা করবেন না।

আমি আর একটি যে বিষয়ে বলতে চাই তা হল, এই ছুটি সম্পূর্ণভাবে শ্রমিকদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে কিনা। যেমন, কোনও কর্মী কত তারিখ এবং কোন সময় থেকে ছুটি নেবে তা সে নিজে নির্ধারণ করবে কিনা। এখন আমরা এই বিধেয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনও সংস্থান রাখিনি এবং আমরা বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ছেড়ে দিয়েছি। প্রাদেশিক সরকারই এব্যাপারে করণীয় কি স্থির করবেন। আমার মনে পরীক্ষামূলক ভিত্তিতে এর প্রয়োজন রয়েছে। সব কিছু প্রচলিত নিয়মের মধ্যে থাকা উচিত নয়। আমি মনে করি বিষয়টি আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত, এবং এই কারণেই এই বিধেয়কে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে। তার কারণ সভার প্রত্যেকেই জানেন যে আইন যত সহজে পরিবর্তন করা যায়, প্রচলিত বিধি তত সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু একটা বিষয়ে আগেই বলেছি যে এই বিধেয়কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষেই যদি পদ্ধতির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন, তাহলে বিষয়ে নিবাচনী কমিটিও সেইভাবে মত দেবেন। মাননীয় সদস্যগণ এখানে যে সব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন আমি মনে করি, তার প্রতিটিই আমার বক্তব্যে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং, আমি আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আর কিছু বলতে চাই না।

শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত (সহ-সভাপতি) : প্রশ্ন হচ্ছে; ১৯৩৪ সালে কারখানা আইন সংশোধন করার জন্য (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিষয়ে নির্বাচনী কমিটিতে পাঠানো হচ্ছে। ঐ কমিটির সদস্য হচ্ছেন নবাব সিদ্দিক আলি খান বাহাদুর, শেখ ফজল-ই-হক পীরাচা, শ্রী আর. আর. গুপ্ত, শ্রী এ. সি. ইনসকিপ, স্যার ভিঠল চন্দ্রভারকার, রাও বাহাদুর এন শিবরাজ, শ্রী এন. এম. যোশি, শ্রী ভি. এস. যোশি এবং প্রস্তাবক এছাড়া ঐ কমিটির গঠন করার জন্য যেসব সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন তাঁরা থাকবেন এবং তাদের সংখ্যা হবে পাঁচ।

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

□ □ □

৩৮

*শ্রমিকদের মজুরি সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : উপ সভাপতি, আমি প্রস্তাব পেশ করছি:

"এই বিধেয়কে ১৯৩৬ সালের মজুরি আইন পুনরায় সংশোধনের কথা বলা হয়েছে। এটি বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাছে পাঠানো হচ্ছে। এই কমিটিতে আছেন শেখ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন, মহম্মদ হোসেন চৌধুরি, শ্রী লালচাঁদ নভলরাই, শ্রী এ. সি. ইন্‌সকপ, শ্রী ভিঠল এন. চন্দ্রভাকার, শ্রী এন. এস. যোশি, ডঃ স্যার রতনজি হিনশ দালাল, শ্রী ভি. এস. যোশি এবং প্রস্তাবক নিজে। এছাড়া ঐ কমিটি গঠন করার জন্য যেসব সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। এঁদের সংখ্যা হবে পাঁচ।

মহোদয়, মজুরি সংক্রান্ত এই আইনে বর্তমান বিধেয়কটি কয়কটি সংশোধনী আনার প্রস্তাব করেছে। আইনটি পাশ হয় ১৯৩৬ সালে। এই বিলটি যখন পাশ হয় তখন এটিকে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। এর কারণ ছিল এই যে বিলটির খসড়া যখন তৈরি হয় তখন আমাদের সামনে এ বিষয়ে কোনও প্রকার আইন ছিল না যার দ্বারা আমরা একটি আদর্শ আইন প্রণয়নের কথা বলতে পারতাম। এখন আমরা বলতে পারি যে আমাদের এ ব্যাপারে ছয় বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে এবং এই সময়ে এটা দেখা গেছে যে এই বিধেয়কে অনেক ত্রুটি রয়ে গেছে। আমি সভাকে অন্তত ৩০ থেকে ৪০টি সংশোধনী প্রয়োজন। তবেই এই মজুরী আইন ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। ভারত সরকার মনে করেন বর্ত্তমানে সরকারের হাতে প্রয়োজনীয় সময় না থাকায় এত সংশোধনী সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এইসব সংশোধনী সুপারিশ করেছেন। ফলে এই আইনের ত্রুটি দূর করার জন্য ঐসব প্রস্তাব রাখা হয়নি। বর্ত্তমান এই বিধেয়কে সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার যা করতে চান তাহল এই আইনের কিছু ত্রুটি দূর করা। উদ্দেশ্য এর প্রশাসনিক

পরিবর্তন। কারণ তা নাহলে যে উদ্দেশ্যে এই আইন প্রণীত হয়েছিল তা পূরণ হবে না।

মহোদয়, বিধেয়কটি আমরা এক একটি অংশ ধরে আলোচনা করছি। বিধেয়কের দ্বিতীয় অংশে 'মজুরির' সংজ্ঞা নির্দেশ সংক্রান্ত কিছু সংশোধনীর প্রয়োজন আছে। এই বিধেয়কের ত্রুটি দূর করার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি যে সব সুপারিশ করেছেন তার সব পুনরাবৃত্তি করে আমি এই সভাকে ক্লান্তিকর করতে চাই না। কিন্তু আমি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। বোম্বাই উচ্চ আদালত তার বিচার বিভাগীয় রায়ে জানিয়েছেন, মজুরির বর্তমান সঙ্গা এমনভাবে নির্দেশ করা আছে যাতে শ্রমিকদের শুধুমাত্র যে তাদের মজুরি দাবি করতে পারবে তাই নয়, যে ছুটি যে অর্জন করবে তার জন্যও সে মজুরি দাবি করতে পারবে। প্রথম পদক্ষেপে নিশ্চয়ই এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল না। এই সঙ্গা সম্পর্কে আরও একটি ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে এবং তাহল অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনও শ্রমিক নিয়োগ করা হলে সেই অতিরিক্ত কাজের জন্য ঐ শ্রমিক অতিরিক্ত মজুরি দাবি করতে পারে। এই সজ্ঞার মধ্যেও কিছু অংশ আছে কারণ একটি সময় ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ এবং অতিরিক্ত উৎপাদনের জন্য শ্রমিক নিয়োগ এর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য রাখা হয় নি। কোনও কোনও মহল থেকে একথাও বলা হয়েছে এই সঙ্গায় যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। ঐসব শব্দের কোন প্রয়োজন নেই এবং থাকলে তাতে বিভ্রান্তি ছড়াবে। আমি এখানে তার উল্লেখ করতে পারি। "এতে কোন বোনাস বা অতিরিক্ত পারিশ্রমিক যা ঐ ধরনের কিছু অন্তর্ভূক্ত করছে কিনা যা শ্রমিকদের প্রাপ্য", আমাদের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে এইসব কথার কোনও অর্থ হয় না। এই সঙ্গার পূর্ববর্ত্তী অংশে ইতিমধ্যেই এটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া আরও বলা হয়েছে মহার্ঘ্যভাতা প্রবর্তনের পূর্বে মজুরির এই সঙ্গা যথাযথ ছিল। যুদ্ধের সময় এটি চালু হয়। এই সঙ্গা এখন অপ্রয়োজনীয় কারণ একজন মালিক বলতেই পারে যে মহার্ঘ্যভাতা মজুরির অংশ নয়। এখন সংশোধনের জন্য যে বিধেয়কটি আমরা পেশ করছি তাতে যে সঙ্গা নির্দেশ করা হয়েছে তা এইসব ত্রুটি থেকে মুক্ত। এই সজ্ঞার ব্যাঘাত খুব সহজ। আমি সভাকে জানাতে চাই যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করিনা যে বিধেয়কটি পেশ করা হচ্ছে সংশোধনের জন্য তার বিষয়বস্তু মূল বিধেয়কের অপেক্ষা খুব বেশি কিছু আছে। এখন বিষয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যরা যদি এর থেকে আরও ভাল কিছু সুপারিশ করতে পারেন তাহলে বর্তমান সংশোধনের জন্য যে বিধেয়কটি পেশ করা হচ্ছে তার আবার সংশোধনের জন্য আমি কোনও প্রকার আপত্তি করবো না।

এখন আসা যাক, বিধেয়কের তৃতীয় অংশে, পাঁচ নম্বর ধারার এই অংশে দুটি সংশোধনীর প্রস্তাব আছে। সভার মাননীয়, সদস্যগণ নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারবেন যে পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে সময়ের জন্য শ্রমিকদের অবশ্যই মজুরি দিতে হবে এবং শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে তাতে কারখানাকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার কথা বলা হয়েছে। একটি শ্রেণীর এমন সব কারখানাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলির শ্রমিক সংখ্যা এক হাজারের কম। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সব কারখানা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের শ্রমিক সংখ্যা এক হাজারের বেশি। এই শ্রেণী বিভাগ করার পরে ঐ ধারায় বলা হয়েছে যে সমস্ত কারখানা এক নম্বর শ্রেণীতে পড়বে তার শ্রমিকদের বেতন সাতদিনের মধ্যেই দিতে হবে। আর যেসব কারখানা অন্য শ্রেণীতে পড়বে তার শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার ক্ষেত্রে সয়মসীমা দশদিন ধার্য করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এই ধারায় শর্ত রক্ষা করা দুরূহ এবং তার কারণ খুবই সহজ। কারখানার এই শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করছে কর্মী সংখ্যার ওপরে। সদস্যগণ নিশ্চয়ই জানেন যে কোনও কারখানার শ্রমিকসংখ্যা কখনই এক থাকে না। সবসময় এই সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে শ্রমিক সংখ্যা যদি একজন কমে যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবে ঐ কারখানার শ্রেণী বদল হয়ে যায়। পক্ষান্তর শ্রমিকসংখ্যা যদি একজন বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রেও সেই কারখানার শ্রেণীবদল ঘটে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটি মনে করার সঙ্গত কারণ আছে এবং আমিও তাই করিয়ে এই বিভেদনীতি একদিকে যেমন ঠিকনয় অন্যদিকে প্রশাসনিক দিক থেকেও এর পরিচালনা সম্ভবও নয়। এই কারণেই এই বিধেয়কে এই বিভেদনীতি দূর করার কথা বলা হয়েছে। দুই ধরনের কারখানা শ্রেণীবিন্যাস না করে সব কারখানার ক্ষেত্রে একটি মাত্র শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে। কারখানার কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করছে তা বিচার না করে সব কারখানাকে একই শ্রেণীভূক্ত করার কথা বলা হয়েছে। সব কারকানার ক্ষেত্রে একই নিয়ম-নীতি প্রযোজ্য হবে। সব কারখানাকে একটি মাত্র শ্রেণী করে শ্রমিকদের দশ দিনের মধ্যে বেতন দেওয়ার নিয়ম চালু করতে হবে। তিন নম্বর অংশে দ্বিতীয় যে সংশোধনীর কথা বলা হয়েছে মাননীয় সদস্যরা দেখবেন সেটাও বেশ জরুরি। পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া কর্মীকেও বেতন দিতে হবে। ঐ ধারার এখন এমন সংস্থান আছে যাতে বলা হয়েছে ঐ বরখাস্ত কর্মীকে দ্বিতীয় কাজের দিনে তার প্রাপ্য দিতে হবে। মহোদয়, এখন যদি মজুরি আইন শুধুমাত্র স্থায়ী কারখানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যেখানে সারা দিন ধরেই কাজ হয় তাহলে বর্তমানে এই ধারার যে অসুবিধা আছে তা আর থাকবে না।

কিন্তু সাময়িক কারখানাগুলির ক্ষেত্রে যে অসুবিধা হবে তা সত্যিই যুক্তিসঙ্গত। যেমন ধরা যাক কোনও কর্মী যদি সপ্তাহে কাজের শেষ দিনে বরখাস্ত হয় এবং ঠিক তার পরেই কারখানা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার দ্বিতীয় কাজের দিন শুরু হবে অনেক পরে। কখন যে শুরু হবে তা কেউ পূর্বে অনুমান করতে পারবে না। এর ফলে ঐ কর্মীর মজুরি দীর্ঘদিন ধরে আটকে থাকবে। এই বিধেয়কে সংশোধনীর যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা যদি কার্যকর না হয় তাহলে এই ধরনের অসুবিধা দেখা দেবে। এই জন্যই প্রস্তাবিত এই সংশোধনীতে আমরা যা প্রস্তাব করেছি তা হল 'কর্মরত' এই কথাটি তুলে নেওয়া এবং দ্বিতীয় এই শব্দের পরিবর্তে 'তৃতীয়' এই শব্দটি ব্যবহার করা। এতে সুবিধা হবে এই যে কারখানা অস্থায়ী হক আর স্থায়ী হক সবক্ষেত্রেই প্রতিটি বরখাস্ত শ্রমিক-ই কাজের সপ্তম দিনে মজুরি পাবে। ঐ শ্রমিককে তখন অস্থায়ী কারখানার শ্রমিকদের মতো আর অপেক্ষা করতে হবে না। বর্তমান আইন অনুসারে অস্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বর্তমানে ঐ অপেক্ষা করতে হয়।

এখন আমি বিধেয়কের চার নম্বর অংশে আসছি। মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়-ই দেখবেন যে এই আইনের সাত নম্বর ধারায় এই অংশে কয়েকটি সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে, ঐ আইনে বলা হয়েছে কিভাবে শ্রমিকদের মজুরি থেকে কেটে নেওয়া যায়। মাননীয় সদস্যগণ এখানে দেখবেন যে ঐ ধারায় বর্তমান অবস্থায় সবক্ষেত্রে মজুরি থেকে কেটে নেওয়ার বিষয়টি আইনসঙ্গতভাবে করা যায় না। বর্তমান আইনে কি কি সমস্যা রয়েছে তা আমি মাননীয় সদস্যগণের কাছে তুলে ধরব। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে বর্তমানে আইনে বা এই আইনের কোন ধারায় যে কর্মী তার কাজ ছেড়ে দিয়েছে এবং তার ভবিষ্যনিধি এবং গ্র্যাচুইটির প্রাপ্যও নিয়ে নিয়েছে এবং চাকরিতে থাকলে সে যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করত তার সব সংস্থান নেই। এমন হতে পারে কোনও কারণবশত হয়তো কোন শ্রমিককে আর্থিক অবস্থার ফেরে তার ভবিষ্যনিধি ও গ্র্যাচুইটি বা এককালীন প্রাপ্য নেওয়ার জন্য বরখাস্তের কাগজপত্র যোগাড় করতে হয়। এরপরে সে যদি পুনরায় কাজে বহাল হয় তাহলে সে তার পূর্বের সুযোগ সুবিধা আবার ফেরত পেতে চাইবে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে সে তার ভবিষ্যনিধি এবং এককালীন প্রাপ্য অর্থ সে নিয়েছে তা আবার ফেরত দিতে তৈরি আছে কিনা তার উপর, শ্রমিক যদি তার বেতন থেকে অর্থ কাটার ব্যাপারে রাজি থাকেও তাহলেও আইনে পরে কিন্তু অনুমোদন নেই। আমি মনে করি বেতন থেকে কেটে নেওয়া বিষয়টি অনুমোদিত হওয়া উচিত কারণ এতে শ্রমিকের নিজের স্বার্থ জড়িত, কিন্তু আমি আগেই জানিয়েছি এই আইনে বর্তমানে তার কোনও সংস্থান নেই। মহোদয়, বেতন থেকে কেটে

নেওয়ার এমন কয়েকটি ক্ষেত্র আছে যাতে কর্মীদের সুবিধা হতে পারে এবং এক্ষেত্রে ঐ শ্রমিক কর্মী এই ভেবে উৎসাহিত হতে পারে যে অর্থ সে ইতিপূর্বে নিয়েছে তা পূরণ করার জন্যই তার মজুরি থেকে কিছু অংশ এখন কেটে নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া এই আইনে এমন কোনও সংস্থানও নেই যার দ্বারা শ্রমিক তার সুবিধার জন্য এই টাকা কেটে নেওয়ার ব্যাপারে স্বেচ্ছায় রাজী হতে পারে। সংশোধনীর মাধ্যমে এই আইন তৈরি করা হয়েছে যাতে এর উদ্দেশ্য কল্যাণমূলক হতে পারে। এছাড়া সাত নম্বর ধারায় আরও অনেক ত্রুটি আছে এবং এই ত্রুটিগুলি এমন সব কর্মীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাদের নিয়োগ হয় বছর অন্তে বেতন বৃদ্ধির ভিত্তিতে। বিধেয়কে এটি একটি নতুন বিষয়। আমি সভার কাছে ব্যাখ্যা করে বলতে চাই শুধুমাত্র সংস্থানগত কারণেই নয় অন্য কি কি কারণে আমরা এই বিধেয়কে সংশোধনী আনতে চেয়েছি। চার নম্বর ধারার তিন এর উপধারায় তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ভিত্তিতে নিযুক্ত কোনও কর্মীর কিভাবে বেতন বৃদ্ধি আটকে দেওয়া যেতে পারে তা এতে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত উঁচু পদ থেকে কিভাবে একজন কর্মীকে নামিয়ে দেওয়া যায় এবং ফলস্বরূপ তার বেতন কাটা যায় তাও এতে বলা হয়েছে। তৃতীয়ত কর্মদক্ষতা হ্রাস পাওয়ায় কিভাবে একজন কর্মীকে একই পদে রেখে কিভাবে তার বেতন ছাঁটাই করা যায় তাও এতে বলা হয়েছে। চার নম্বর ধারার তিন নম্বর উপধারায় যে সব আইনের কথা বলা আছে তার সংশোধনী কেন প্রয়োজন হল তার কারণ খুঁজতে গেলে আমাদের যেতে হবে সিন্ধুর বিচার বিভাগীয় কমিশনার এ সম্পর্কে যে রায় দিয়েছিলেন তা জানতে। এব্যাপারে যতদূর আমি জানি জনৈক ইঞ্জিন চালক যুক্ত ছিল। তার পদমর্যাদা অক্ষুন্ন ছিল কিন্তু বেতন কাটা হয়েছিল। সে এর প্রতিকারে আদালতের দ্বারস্থ হয়। তার অভিযোগ ছিল স্বপদে বহাল থাকা অবস্থায় তার বেতন কাটা বে-আইনী, বিচারক এই মামলায় রায় দেন যে তার বেতন কাটা আইনানুগ নয়। কিন্তু বিচারক তার রায়ে আরও বলেন যে, শ্রমিক কর্মীর সঙ্গে যদি নতুন কোনও চুক্তি হয় এবং দেখা যায় ঐ কর্মীকে যে কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে সেই ইপ্সিত মানে সে পৌঁছাতে পারছে না সেই অবস্থায় এবং নতুন ঐ চুক্তিতে যদি সে সম্মত হয় সেক্ষেত্রে তার বেতন কাটা ন্যায্য হবে। এখন আমি এই বিধেয়কে যা অন্তর্ভূক্ত করেছি তা হল বিচারকের ঐ রায়কে মেনে নেওয়া। যেমন যদি, দেখা যায় কোনও কর্মীর পদমর্যাদা ক্ষুন্ন করা হয়নি কিন্তু তার বেতন কাটা হয়েছে এই কারণে যে দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল তার জন্য সে উপযুক্ত নয়। তবে এর জন্য তাকে আগে থেকে নোটিশ দিয়ে জানাতে হবে। মহোদয়, এখন

এই সংস্থান রাখার উদ্দেশ্য হল তাকে এক মাসের নোটিশ দেওয়া। এক্ষেত্রে পূর্ণ ও সরলীকৃত পদ্ধতি হল তাকে আইনানুগ নোটিশ দিয়ে জানানো এবং বলা, তোমাকে আগে যে বেতন দেওয়া হত বর্ত্তমানে আমরা সেই একই বেতন দিতে ইচ্ছুক নই। এখন যদি তুমি ইচ্ছা কর তাহলে নতুন চুক্তি করে কাজে থাকতে পার। আর যদি তা না কর তাহলে চাকরি ছেড়ে চলে যাও। এখন নোটিশ দেওয়া এবং তার উত্তর পাওয়া এই দীর্ঘায়িত পদ্ধতির পরিবর্তে আমরা দুটি পদ্ধতিকে একত্র করেছি। এক সময়ভিত্তিক নোটিশ জারি করে আমরা তার বেতন কাটার সময়কে দীর্ঘায়িত করতে চেয়েছি এবং ঐ সময়ের মধ্যে সে যদি মালিককে নোটিশের জবাব দিয়ে জানায় যে সে নতুন শর্ত গ্রহণে রাজি নয় তাহলে সে কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারে। এই বিষয়টি আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই কারণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। বিতর্ক হতে পারে যে এই ধরনের সংশোধনীর সুপারিশ করে আমরা ঐ অতিরিক্ত বিচার বিভাগীয় কমিশনারের রায় বাতিল করতে চেয়েছি অথবা তার অন্যথা কাজ করতে চেয়েছি। কিন্তু আমি সভাকে একথা বলতে চাই যে আমি এর কোনওটিই করছি না বরং এই বিধেয়কে সংশোধনীর প্রস্তাব করে আমি ঐ বিচার বিভাগীয় কমিশনারের ঐ রায়কে অনুসরণ করতে চেয়েছি।

অন্য দুটি সংশোধনী যেমন বেতন বৃদ্ধি বন্ধ রাখা এবং উঁচুপদ থেকে নিচু পদে নামিয়ে দেওয়া এসব ব্যাপারে কোন প্রকার বিতর্ক নেই। তার কারণ কোনও কর্মী একটি নির্দিষ্ট সময় পরে নিচু থেকে উচু পদে যাবার জন্য তখনই বিবেচিত হয় যখন মালিক তার কর্মদক্ষতায় খুশি হয় এবং আরও উচুপদে কাজ করার জন্য সে তার দায়িত্ব আরও ভালভাবে পালন করতে পারবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সে উঁচুপদে উঠতে পারে নি তাহলে বুঝতে হবে যে তার যে যোগ্যতা অর্জন করার প্রয়োজন ছিল তা সে পারেনি।

অনুরূপভাবে অন্যান্য সংস্থান যেমন উঁচু পদ থেকে নিচুপদে নামিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে আমি মনে করিনা এব্যাপারে কোনও আইনসঙ্গত অভিযোগ থাকতে পারে। এর কারণ যখন একজন কর্মীর দক্ষতা এতটাই হ্রাস পেয়েছে যে ঐ অস্থায়ী মালিক তাকে আর স্বপদে বহাল রাখতে পারে না। আমি মনে করি এটি যুক্তিসঙ্গত কারণ তার বেতন কমে যাওয়ার ব্যাপারটি তার দায়িত্ব কমে যাবার সঙ্গে যুক্ত।

এখন এই বিধেয়কের পাঁচনম্বর অংশ নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই অংশটি খুবই সহজ। এই অংশে আট নম্বর ধারার ছয় এবং সাত উপধারায় সংশোধনী আমার কথা বলা হয়েছে, এই অংশে মালিক কর্ত্তৃক ধার্য জরিমানা কত

দিনের মধ্যে উসুল করা যেতে পারে তা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল কখন সেই সময়টা শুরু হবে? শ্রমিক যখন থেকে তার কাজে গাফিলতি শুরু করছে তখন কি সময় ধরা হবে না মালিক যখন তার এই অপরাধ ধরতে পেরেছে তখন থেকে এই সময় শুরু হবে? খুব স্বাভাবিক ভাবেই তা সম্ভব নয়। কারণ মালিকের পক্ষে সব সময় জানা সম্ভব নয় কখন থেকে শ্রমিকটি তার অপরাধ শুরু করেছে। অনেক সময় দেখা যায় শ্রমিকের কাজে গাফিলতির খবর মালিকের কাছে অনেক দেরিতে পৌঁছায়। এই অবস্থায় এখন কথা হচ্ছে কখন থেকে এই সময় হিসেব করা হবে। অপরাধ করার সময় থেকে না অপরাধ জ্ঞাত হবার সময় থেকে। এব্যাপারে আমি সভাকে বলতে চাই যে এই ব্যাপারে সংশোধনীর সুপারিশ করে আমরা নতুন কিছু প্রবর্ত্তন করছি না। এই সভার যে সব আইনজ্ঞ সদস্য আছেন তারা ভাল করেই জানেন যে, আইনে এমন সংস্থান আছে যেখানে দেখা যায় ক্ষেত্র বিশেষে এই সময় শুরু হয় অপরাধের দিন থেকে আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা শুরু হয় অপরাধ জানার দিন থেকে।

এখন আসা যাক, নয় নম্বর ধারার ছয় নম্বর অংশ সম্পর্কে। সাত নম্বর ধারার দুইয়ের খ উপধারায় বলা হয়েছে শ্রমিক যদি তার কাজে গরহাজির থাকে তাহলে তার বেতন কাটা যাবে। কিন্তু কাজে গরহাজির বা অনুপস্থিত বলতে কি বুঝায় তার ব্যাখ্যা দুর্ভাগ্যক্রমে এই আইনে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই অংশে এই ত্রুটি দূর করার কথা বলা হয়েছে এবং এরজন্য নয় নম্বর ধারায় এর একটি ব্যাখ্যা যোগ করা হয়েছে। কারণ এর আরও কাজে অনুপস্থিত বলতে কি বুঝায় তার কোন ব্যাখ্যা দেওয়া ছিল না। সাত নম্বর অংশে ১৩ নম্বর ধারা সংশোধনের কথা বলা হয়েছে এবং তা হল পুরোপুরি কার্যকরণ ভিত্তিক। এটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংস্থান নয়, এই বিধেয়কের চার নম্বর ধারায় যে নতুন দুই প্রকারের বেতন কাটার কথা বলা হয়েছে তা ঐ ১৩ নম্বর ধারায় প্রযোজ্য। মাননীয় সদস্যগণ অবহিত আছেন যে, ১৩ নম্বর ধারায় যে মজুরি কাটার কথা বলা হয়েছে যা একমাত্র প্রাদেশিক সরকারই ধার্য করে থাকে। আমরাও চাই নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে যে মজুরি কাটার কথা বলা হয়েছে তা ঐ একই সংস্থানের আওতায় যাক।

এই বিধেয়কের শেষ অংশে ১৭ নম্বর ধারার সংশোধনীর কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় আপিল করার অধিকার নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। এই ধারার একজন কর্মীর আপিল করার অধিকার রয়েছে কিন্তু কারখানার পরিদর্শককে ঐ অনুমতি দেয় না। অথচ ঐ পারিদর্শকই ঐ অধিকার নিয়ন্ত্রণ করার প্রশাসনিক কর্ত্তৃপক্ষ। এখন সবার স্বার্থে বিশেষে করে কর্মীদের স্বার্থে কারখানার পরিদর্শকেরও আপিল করার অনুমতি থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি।

মহোদয় এই হল এই বিধেয়কের সংস্থান সমূহ। আমি এগুলি পেশ করছি। আমি মনে করি এগুলি বিতর্কের উর্দ্ধে এবং আশা করি যে সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন।

মহোদয়, আমি প্রস্তাব করি:-

শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত, উপসভাপতি—প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে:

"১৯৩৬ সালের মজুরি আইন সংশোধনের জন্য এই বিধেয়কে সুপারিশ করা হয়েছে এবং এটি একটি বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাছে পাঠানো হচ্ছে। ঐ কমিটির সদস্য হলেন শেখ ইউসুফ আবদুল্লা হারুন, মহম্মদ হোসেন চৌধুরি, শ্রী লালচাঁদ নাভালরাই, শ্রী এ. সি. ইন্‌সকিপ, স্যার ভিঠল এন. চন্দ্রভারকার, শ্রী এন. এম. যোশি, ড: স্যার রতনজি হিনশ দালাল, শ্রী ডি. এস. যোশি এবং প্রস্তাবক নিজে। এছাড়া ঐ কমিটি গঠন করার জন্য যাঁদের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে এবং তাঁদের সংখ্যা হবে পাঁচ।

* * * * *

শ্রী এন. এস. যোশি : মহোদয়, মাননীয় সদস্য আরও কয়েকটি সংশোধনীর কথা বলেছেন। এর মধ্যে একটি রয়েছে অনুপস্থিতির জন্য বেতন কাটা বিধেয়ক।

মাননীয় ড. বি. আর আম্বেদকর : আমি শুধু মাত্র অনুপস্থিতির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছি। আমি বেতন কাটার অনুমতির কথা বলিনি। বিষয়টি পূর্বেই ছিল।

শ্রী এন. এম. যোশি : আমি জানি, মাননীয় সদস্য খুব সহজ সরল মানুষ। তিনি অনুপস্থিতির সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছেন এবং এর ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বেতন কাটার সুযোগ পাওয়া যাবে। মূল আইনে একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পর্যন্ত অনুপস্থিতির জন্য বেতন কাটার অনুমতি ছিল। যে সময়টা নষ্ট হয়েছে বা যে সময়টা শ্রমিক কাজ করেনি তার জন্য মজুরি কাটা যেতে পারে। কিন্তু যদি এই সংশোধনী গ্রহণ করা হয় এবং আমার ধারণা যদি সঠিক হয় তাহলে কিন্তু একজন মালিক তার শ্রমিকের উপরে দ্বিগুণ জরিমানা ধার্য করতে পারে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এমন ধারণা ঠিক নয়।

শ্রী এন. এম. যোশি : আচ্ছা ঠিক আছে। আমরা উপযুক্ত সময়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। এখন যা হতে পারে তাহল একজন শ্রমিক এক ঘণ্টার জন্য কাজে অনুপস্থিত হল। যেহেতু সে একঘণ্টার জন্য কাজ করতে পারেনি এবং

এক্ষেত্রে যদি সময় ধরে মজুরি দেওয়া হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তার মজুরির অংশ কাটা যাবে। এখন যদি এই সংশোধনী গৃহীত হয় তাহলে এ সময়ের জন্য কম মজুরি পাওয়া ছাড়াও তার মজুরী আরও বেশি কাটা হতে পারে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না-না, তা কখনই হতে পারে না।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : উপ-সভাপতি মহোদয়, বিতর্ক কমানোর স্বার্থে এই অবস্থায় আমি এই সংশোধনী মেনে নিতে তৈরি।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে আমার বন্ধু যোশি যে প্রস্তাব করেছেন তা মেনে নিতে রাজি আছি এবং এক্ষেত্রে আমার আর বক্তব্য রাখার কোনও অর্থ হয় না। আমি যা বলতে চাই তা হল মজুরী কেটে নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে বলে যে ধারণা হচ্ছে তা আমি মানতে রাজি নই। এই ব্যাপারেই আমি যুক্তি দেখিয়েছি। আমি অত্যন্ত পরিস্কার করে বলতে চাই যে সংশোধনীর প্রস্তাব আমি এখানে উপস্থাপন করেছি তা হল প্রশাসনিক। কারণ এর ফলে প্রশাসনিক আইনে যে সব ত্রুটি আছে তা দূর করা সম্ভব হবে। এই বিধেয়কে যে সব সংশোধনীর কথা বলা হয়েছে তা এই বিষয়ে নির্বাচনী কমিটির সদস্যদের কোনওটাই দুর্বোধ্য এবং তাদের জ্ঞান বুদ্ধির আওতার বাইরে নয়। মহোদয়, আমি অবাক হচ্ছি এইভেবে যে আমার মাননীয় সদস্য বন্ধু যোশি তাঁর বক্তব্যে নিজের প্রতি সুবিচার করেননি। আমি যদি বিধেয়কের এই বিষয়টি বিলি করতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের মতামত নেওয়ার জন্য আমি এটি বিলি করার দায়িত্ব পেয়েছি। এক্ষেত্রে আমি অবাক হচ্ছি এই ভেবে শ্রমিকরা তাদের বক্তব্যস্থলে ধরার জন্য শ্রী যোশি না শ্রী লালচাঁদ নভলরাই কাকে নিয়োগ করবে। শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব তাদের সম্পর্কে জ্ঞান ও তথ্যের ভিত্তিতে আমি বিষয়ে নির্বাচনী কমিটির সমীপে এটি পেশ করেছি। মহোদয়, এখন যদি দেখা যায় যে তারা আমার উপর বিশ্বাস স্থাপনে অক্ষম এবং তাকে বিতর্কিত বিষয় বলে মনে করি না তাহলে আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে একমত হয়ে এই সংশোধনী গ্রহণ করব।

উপ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : এখন প্রশ্ন হল, জনমত যাচাইয়ের জন্য বিধেয়কটি বিলি করা যেতে পারে এবং ১৯৪৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে তা করতে হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

৩৯

*দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা কলকাতা সম্মেলনে ভাষণ

"ভারত সরকার দেশের বর্ত্তমান জল সম্পদ সমস্যা সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবগত আছেন এবং দেশের প্রতিটি মানুষর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে অন্যান্য দেশের মতো সরকার দেশের জলসম্পদ ব্যবহার করার জন্য নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হতে চান।" ভারত সরকারের শ্রমবিষয়ক সদস্য মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর মধ্য প্রদেশ, বাংলা এবং বিহার সরকারের প্রতিনিধিদের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন, কলকাতায় বাংলা সচিবালয়ে ৩রা জানুয়ারি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনে দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকরের : ভাষণ এখানে পুরোপুরি তুলে দেওয়া হল।

ভারত সরকারের পক্ষে আমি এই সভা আহ্বান করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের নোটিশে অনেক অসুবিধা করেও এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। দামোদর নদ বন্যা অনুসন্ধান কমিটির প্রস্তাব মতো কিভাবে তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় তা বিবেচনার জন্যই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছে। বাংলা সরকার ১৯৪৪ সালে এই কমিটি নিয়োগ করেন। আলোচনা শুরু করার আগে আমি বাংলা সরকারকে এই কমিটি নিয়োগ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ঐ কমিটি তাদের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি পেশ করার জন্য তাদেরও আমি ধ্যবাদ জানাই। দামোদর নদের বন্যাজনিত সমস্যা এবং দেশের জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য যেসব সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে ঐ কমিটি জোরালো তথ্য পেশ করেছে।

কমিটির সুপারিশ : আমি এই কমিটির দুটি সুপারিশের উল্লেখ করতে চাই। সুপারিশ দুটি হচ্ছে ৮ ও ১৩ নম্বর সংক্রান্ত, ৮ নম্বর সুপারিশে কমিটি বলেছে,

আলোচনার সময় কমিটির সদস্যদের মনে হয়েছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ভূমি সংরক্ষণ জনিত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে যদি ভারতের বনভূমির এবং নদী সমূহের কর্ত্তৃত্ব কেন্দ্রিয় সরকারের আওতায় আনা যায়। ৮ নম্বর সুপারিশে কমিটি প্রস্তাব করেছে যে দামোদর নদে বাঁধ নির্মান করলে শুধু মাত্র যে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে তাই নয় এর ফলে জল বিদ্যুৎ তৈরি হবে এবং সেচের জন্য জল সরবরাহ করা যাবে। যারা বর্তমান এই নীতি সম্পর্কে অথবা তার অন্যথা বিষয়ে অবহিত তারা স্বীকার করবেন যে এই সুপারিশের গুরুত্ব কোনও মতেই অতিরঞ্জিত নয়। এই সুপারিশে দেশের জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কথা বললে নিশ্চয়ই সত্যের অপলাপ হবে না যে জলসম্পদ ব্যবহারের জন্য এ পর্যন্ত সর্বভারতীয় নীতি তৈরি হয়নি। দ্বিতীয়ত আমাদের জলসম্পদ সম্পর্কে নীতি যে বহুমুখী হতে পারে এবং তাতে সেচ, বিদ্যুৎ এবং নৌ চলাচল অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের সম্পূর্ণ কোনও ধারণা ছিল না।

রেল এবং জলপথ : আমাদের জলসম্পদ নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সেচ। উপরন্তু আমরা রেল এবং জলপথের মধ্যে কোনও প্রভেদ যে নেই সে সম্পর্কে কোনও বিস্তারিত খোঁজ খবর করিনি। এমন রেলপথকে যদি প্রাদেশিক সীমার মধ্যে না রাখা যায় তাহলে জলপথকেও এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশের জন্য কাজে লাগানো যাবে না। কিন্তু আমাদের সংবিধানে রেলপথ এবং জলপথের মধ্যে বিভাজন করা হয়েছে এবং এর ফলে রেলকে ধরা হয়েছে কেন্দ্রিয় সরকারের আওতায় এবং জল পথকে ধরা হয়েছে প্রাদেশিক সরকারের আওতাভুক্ত।

স্বাভাবিক ভাবেই এই ভুলের জন্য অসুবিধা ও ক্ষতি অনেক। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। কোনও প্রদেশে বিদ্যুতের দরকার এবং এর জন্য প্রয়োজন জলসম্পদ ব্যবহারের। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সে নদীতে বাঁধ দিতে পারেন কারণ নদীর যে অংশে বাঁধ দেওয়া যায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সেটি রয়েছে অন্য প্রদেশের এলাকা এবং ঐ প্রদেশ কৃষিভিত্তিক হওয়ায় বিদ্যুতের ব্যাপরে তার আগ্রহ নেই। এছাড়া অর্থের অভাব থাকতে পারে। অথচ যে প্রদেশের বিদ্যুতের প্রয়োজন তাকে অন্য প্রদেশের এলাকার নদীতে বাঁধ তৈরি করতে দেওয়া হবে না। প্রদেশগুলির স্বায়ত্বশাসনের নামে তারা এই ধরনের অবন্ধুসুলভ আচরণ করতে পারছে। এরকম অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

জল সম্পদের ব্যবহার : দ্বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই বক্তব্য রেখেছি। এখন এই পশ্চাদপর্বের ভিত্তিতে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক গঠিত দামোদর নদ বন্যা

নিয়ন্ত্রণ কমিটির সুপারিশ আপনারা আরও ভাল মূল্যায়ণ করতে পারবেন। আমি বিষয়টির উল্লেখ করেছি মাত্র। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের জানানো যে ভারত সরকার এই সব অসুবিধা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ এবং এজন্য এমন একটি নীতি প্রমাণ করতে চান যার দ্বারা দেশের জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হতে পারে। আর এর ফলে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশের জল সম্পদ দেশের প্রতিটি মানুষের কাজে আসতে পারে।

রেলপথের মতো পথকেও এক-ই ভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের সংবিধান সংশোধন করতে পারাটা একটি শুভপদক্ষেপ হতে পারে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভারত সরকার সেই সংবিধান সংশোধনের সময়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করতে না পারেন। শুধু তাই নয় প্রদেশগুলি জলসম্পদ ব্যবহারের জন্য যদি কোনও যৌথ প্রকল্পে সহযোগিতা করতে রাজী হয় তাতে সংবিধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে বলে কেন্দ্র মনে করেন।

ভারত সরকার এব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদী উপত্যকা প্রকল্পের কথা চিন্তা ভাবনা করছেন। সরকার ঐ প্রকল্পের বিষয়টি নিয়ে পর্যালোচনা করে ভারতে ঐ প্রকল্পের অনুরূপ কিছু একটা করা যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা করছেন। সরকার এটিও খতিয়ে দেখছেন প্রদেশগুলি তাদের প্রাদেশিক বাধা অতিক্রম করে পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে কিনা। এই সহযোগিতার অভাবের জন্যই বহু উন্নয়ন প্রকল্প আটকে পড়ে আছে। দেশের জলসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সরকার একটি কেন্দ্রীয় সংবিধান তৈরি করেছেন এবং এর নাম হচ্ছে কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি উন্নয়ন পর্ষদ এবং এছাড়া আরও একটি সংস্থা গঠনের কথা ভাবছেন যার নাম হবে কেন্দ্রীয় জল, সেচ এবং নৌ চলাচল আয়োগ। এই দুটি সংস্থা গঠন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রদেশগুলি কিভাবে তাদের জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করবে এবং সেটি ব্যতীত অন্য কি প্রকল্প তৈরি করা যায় সে ব্যাপারে তাদের পরামর্শ দেওয়া, এছাড়া এর জন্য আরও সংস্থা যেমন কেন্দ্রীয় উপযোগিতা পর্ষদ অথবা সাময়িক অনুসন্ধান আয়োগ প্রভৃতি গঠনের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। বিদ্যুৎ পর্ষদ, কেন্দ্রীয় জল সম্পদ, সেচ এবং নৌ আয়োগ প্রভৃতি গঠন করার পরও এগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এক্ষেত্রে দমোদরনদ প্রকল্প সবার আগে আগে। এটি হবে একটি বহুমুখী প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণই নয়। এর দ্বারা সেচ, নৌ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হবে।

এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবার পর যে কর্তৃপক্ষ এর নিয়ন্ত্রণে থাকবেন যতদূর সম্ভব তাদের সামনে আর্দশ হিসেবে থাকবে আমেরিকার টেনেসি নদী উপত্যকা প্রকল্প। এই প্রকল্পের কাজ হবে সমবায় ভিত্তিতে এবং কেন্দ্র, বাংলা ও বিহার প্রদেশ এর অংশীদার হবে। ভারত সরকার চান এই প্রকল্পকে রূপ দিতে এবং এই প্রকল্পের কাজ শুরু করার জন্য কোনও প্রকার সময় নষ্ট করতে চান না।

জলপথের জন্য নতুন নীতি : প্রাথমিক কয়েকটি কাজ শেষ না হলে সরকারের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। সর্বপ্রথম এব্যাপারে যে বিষয়টি আসে তা হল বাঁধের জন্য স্থান নির্বাচন। শুধুমাত্র বাংলার ইচ্ছানুযায়ী এব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র বিহারের ইচ্ছাতেও এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। এরপর দুটি প্রদেশ একত্র হয়ে যদি, স্থান নির্বাচন করে তখন প্রয়োজন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ। কারণ তাদের মতামত ছাড়া বিষয়টি চূড়ান্ত করা যায় না। এইসব বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা প্রয়োজন। আমি আগেই বলেছি যে দামোদর উপত্যকা প্রকল্প হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রকল্প। আমরা মনে করি এই প্রকল্প শুধুমাত্র বন্যাজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণেই সাহায্য করবে না এর দ্বারা সেচ, বিদ্যুৎ এবং নৌ চলাচল ব্যবস্থারও সুযোগ বাড়বে। বাঁধ নির্মানের জন্য স্থান নির্বাচনের সঙ্গে এইসব বিষয়গুলিও পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই কাজের জন্য সব থেকে ভাল পদ্ধতি নিয়োগ করা। আমি আশা করি এ ব্যাপারে সমস্ত প্রকার অনুমদিত অন্যান্য বিষয়কে দূরে সরিয়ে রেখে সঠিক উদ্যম নিয়েই আমরা সামনে এগিয়ে যেতে পারব। এবং এইভাবে আমাদের জলপথ সম্পর্কে একটি নতুন নীতি প্রণয়নের মধ্যে দিয়ে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের জন্য একটি নতুন যুগের সূচনা করতে পারব।

সম্মেলনে আলোচনা

দামোদর উপত্যকা প্রকল্প হচ্ছে এটি বহুমুখী প্রকল্প। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেচ, বিদ্যুৎ এবং নৌ চলাচলের জন্য দামোদর নদের জল ব্যবহার করা। ড: বি. আর. আম্বেদকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। এই প্রকল্প সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিলি করা বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এই আলোচনা হয়।

এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় বাংলা, বিহার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষজ্ঞদের মতের ভিত্তিতে এবং তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে এইসব প্রয়োজনীয় তথ্য যোগাড়

করতে হবে। এতে যদি প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগৃহীত না হয় তাহলে নতুন করে আবার তা করতে হবে। এরপরই সহমতের ভিত্তিতে দামোদর নদ বহুমুখী প্রকল্পের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি প্রাথমিক স্মারকলিপি তৈরি করতে পারেন। তিনটি সরকার এরপর একত্রে মিলিত হয়ে কেন্দ্র এবং প্রদেশদুটির প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একটি প্রকল্প তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে পারে।

সাধারণ সহমত : দামোদর প্রকল্পকে একটি বহু মুখী প্রকল্প হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সাধারণ ভাবে সহমত প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বাংলার প্রতিনিধিরা বেশী গুরুত্ব দেন দামোদর প্রকল্পকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্প হিসেবে গড়ে তোলার জন্য। তারা জোর দিয়ে বলেন এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ। কিছু আলোচনার পর এটি ঠিক হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ মতো এব্যাপারে অনুসন্ধানের কাজ করবেন সেচ বিভাগের বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী মান সিং। বাংলা সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এই অনুসন্ধানের কাজ করবেন। তবে এ ব্যাপারে বিহার সরকারের সেচ বিভাগের প্রধান উপ প্রকৌশলী শ্রী এ করিম শ্রী মান সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন।

ইতিপূর্বে আলোচনার সময় ভারত সরকারের শ্রম বিভাগের সচিব এইচ. সি. প্রায়র জলপথ সমস্যার প্রশাসনিক দিকগুলির কথা বলেছেন এবং জানিয়েছেন কিভাবে কেন্দ্র এ ব্যাপারে তার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

* * * *

এই সম্মেলনে যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগ দেন তাঁরা হলেন, বাংলা সরকারের যোগাযোগ ও পূর্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী বি. পি. পাইন, যোগাযোগ ও পূর্ত বিভাগের সচিব শ্রী বি. সরকার, আই. সি. এস, বাংলা সরকারের মুখ্য প্রকৌশলী শ্রী বি. এল. সাবারওয়াল, শ্রী জে. এফ. রামেল, সেচ বিভাগের বিশেষ প্রকৌশলী শ্রী মান সিং, নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা শ্রী এন. কে., যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির সচিব শ্রী এন. দার, উন্নয়ন কমিশনার শ্রী এইচ. এম. ইশাক, বিহার সরকারের সেচ বিভাগের প্রধান উপ প্রকৌশলী শ্রী এ. করিম। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই বিষয় যাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তারা হলেন, কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি শক্তি পর্ষদের সভাপতি শ্রী এইচ. এম. ম্যাথুস, ঐ পর্ষদের জল বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সদস্য শ্রী ডব্লু. এল. ভুরদুন এবং শ্রী ভি. এল. মজুমদার।

□ □ □

৪০

*যুদ্ধোত্তর সময়ের বিদ্যুৎ ও শক্তি উন্নয়ন

ভারতের যে বিরাট পরিমাণে বিদ্যুৎ শক্তি দরকার যুদ্ধ মিটে গেলে সে বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ভারত সরকারের শ্রম সদস্য মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর বলেছেন যে, দেশে যাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা করছেন। দোসরা ফেব্রুয়ারি নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত পূর্ত দফতরের কাজ কর্ম এবং বিদ্যুৎ শক্তি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কমিটির দ্বিতীয় বৈঠকে ড. আম্বেদকর একথা বলেন।

ড. আম্বেদকরের পূর্ণ ভাষণ এখানে তুলে দেওয়া হলঃ এই সভায় উপস্থিত সব প্রবীন ও নবীন প্রতিনিধিদের আমি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি প্রবীন ও নবীন প্রতিনিধির কথা বলেছি কারণ এখন আমাদের কমিটিতে যেসব নতুন সদস্য আছেন গত বৈঠকে কমিটিতে তারা ছিলেন না। তারা বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির সংগঠনের এবং ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য। বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ এবং সংগঠিত শ্রমিকগুলি ভারতের বিদ্যুৎ উন্নয়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এসম্পর্কে তাদের যদি মতামত ব্যক্ত করতে হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাদের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা থাকা দরকার। আমি দুঃখিত যে গত বৈঠকে যোগদানের জন্য তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এখন আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এবার তারা আমাদের সঙ্গে আছেন এবং এবারের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সময় এইসব নতুন সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলন : চেয়ারম্যান হিসাবে যদি আমি শুরুতেই কয়েকটি কথা বলি তাহলে বোধহয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে সুবিধা হবে। বিষয়টি হচ্ছে গত ২৫শে অক্টোবর ১৯৪৩ সালে কমিটির শেষ বৈঠকের পর যুদ্ধোত্তর কালে দেশে বিদ্যুতের উন্নতির জন্য ভারত সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন তার

উল্লেখ করা। তার কারণ আপনাদের অনেকে-ই এ বিষয়ে কোনও ধারণা নেই। এই নীতি নির্ধারণ কমিটির শেষ বৈঠকের পর ভারত সরকারের বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কমিশনার মিঃ ম্যাথুজ সরকারের অনুমোদন নিয়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারদের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। তাতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ইঞ্জিনিয়ারগণই যোগ দেন। সম্মেলনে যুদ্ধোত্তর সময়ে দেশের বিদ্যুৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ সম্মেলন প্রথম যে কাজটি করে তা হল ঠিক যুদ্ধের পর দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নের কাজ করতে গেলে কি ধরনের সরঞ্জাম প্রয়োজন সে সম্পর্কে তারা একটি তালিকা প্রস্তুত করে। এছাড়া ঐ কমিটি কয়েকটি প্রস্তাবও পাশ করে এবং তা কমিটির প্রতিবেদন উল্লেখ করা হয়। তাহল, আলোচনা, সমীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এগুলি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :-

১) এ সম্পর্কে গৃহীত প্রথম সুপারিশটি হল যে সমস্তরাজ্য এবং প্রদেশে তাদের এলাকাধীন বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি হবে যে সমস্ত রাজ্য ও প্রদেশগুলিকে কিছু কিছু মতামত দেওয়া ;

২) দ্বিতীয় বিষয়টি হল কারিগরী বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন ;

৩) তৃতীয়ত সম্মেলনের মতে যে সব প্রদেশে বিদ্যুৎ উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে সেখানে সমীক্ষার কাজ শুরু করা।

৪) চতুর্থ বিষয়টি হল রেলে বৈদ্যুতিকরণ কৃত্তিম সার তৈরি এবং গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ সংক্রান্ত।

সম্মেলনে উপস্থিত সদস্যগণ তাদের প্রতিবেদনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চিঠিতে বলেছেন, এই প্রথম দেশে বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং এই পর্যালোচনা হচ্ছে সমন্বয়ের মাধ্যমে। এই কাজে যে সব ইঞ্জিনিয়ারগণ যুক্ত তারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ। তাদের এই অভিজ্ঞতা আঞ্চলিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন।

ভারি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি :- আমি আশাকরি এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত হব যে এই সম্মেলনের কাছে আমরা সবাই ঋণী। কারণ সারা ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই সম্মেলন এক বিরাট সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এ সম্পর্কে সমস্ত প্রকার বিবাদ বিরোধ দূরে সরিয়ে দিতে একটি সঠিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলন তার সুপারিশের ভিত্তিতে ভারত সরকারকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করে। সরকারের কাছে সম্মেলনের পেশ করা দুটি সুপারিশ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে। বিষয় দুটি হচ্ছে বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য সাজ সরঞ্জাম যোগাড় করা এবং বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদ গঠন করা সম্পর্কিত।

যুদ্ধোত্তর সময়ে ভারতে বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য কি ধরনের ভারী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতে পারে। অতি দ্রুত তার একটি তালিকা তৈরি করা হয়। স্থির হয় ভারতের প্রয়োজন ৮৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের এবং এর জন্য আনুমানিক খরচ হবে ৫০ কোটি টকা। এই তালিকায় যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা বলা হয় তা ভারতের বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতার প্রায় ৬৫ শতাংশ। আরও বিস্তারিত অনুসন্ধান করলে হয়তো জানা যাবে এই তালিকায় যে যন্ত্রপাতির কথা বলা হয়েছে আমাদের প্রয়োজন তার থেকে অনেক বেশি। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পক্ষে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার ভিত্তিতে অবিলম্বে কাজ শুরু করতে হয় কারণ এব্যাপারে বিলম্ব ঘটলে তাতে দেশের স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে।

বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদ : ১৯৪৪ সালের ৮ই নভেম্বর সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, ভারত সরকার একটি বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদ গঠন করেছেন। চেয়ারম্যান ছাড়াও এই পর্ষদে প্রথম দিকে দুজন পুর্ণ সময়ের সদস্য এবং তিনজন আংশিক সময়ের সদস্য থাকবেন। ভারত সরকারের বিদ্যুৎ কমিশনার ম্যাথুজকে সরকার বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিঃ ডব্লিউ এল ভুরদুইনকে এই পর্ষদের সদস্য মনোনীত করেছেন। ভারতে আসার আগে মিঃ ভুরদুইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টেনেসি নদী উপত্যকার প্রকল্প আধিকারিক ছিলেন। এছাড়া আরও একজন সদস্যকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি হবেন এই প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত কাজের তদারকির সদস্য। এই প্রকল্পের কাজের সঙ্গে ধারণা থাকা একজন যোগ্য প্রকৌশলীও নিয়োগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এইসব নিয়োগ থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে ভারত সরকার এই পর্ষদকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে কতটা সচেষ্ট। প্রাদেশিক এবং দেশীয় ব্যক্তিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে কিভাবে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমীক্ষার কাজ করা ও নতুন নতুন চিন্তাধারা আলোকপাত করার জন্য ভারত সরকার এই প্রযুক্তি পর্ষদ গঠন করেছেন। আমি এগুলির উল্লেখ করছি এই কারণে যে আপনাদের জানা প্রয়োজন কতদূর কাজের অগ্রগতি হয়েছে। আর একথা আপনাদের জানাচ্ছি যে ভারত সরকার যথেষ্ট দ্রুততা এবং আন্তরিকতা নিয়েই এ ব্যাপারে অগ্রসর হচ্ছেন।

ত্রিদফা কর্মসূচী : বিদ্যুৎ নীতি সম্পর্কে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি এখানে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে নীতি নির্ধারণ কমিটির গত সভায় বোম্বাই সরকারের পক্ষে মি: কলিন্স বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গ্রিড প্রথা চালু করা নিয়ে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন, গত বছর আমরা ভারত সরকারের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলাম। আমাদের একথা মনে হয়েছে যে বিদ্যুৎ পরিষেবার সুফল যদি উৎপাদক এবং গ্রাহকদের কাছে দক্ষতার সঙ্গে এবং অত্যন্ত সুবিধাজনক ভাবে পৌঁছে দিতে হয় তাহলে পর্যায়ক্রমে আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শুরু থেকেই যুক্তরাজ্যের কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ পর্ষদের ধাচে ত্রিদফা কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এই ত্রিদফা কর্মসূচি হল—

১) প্রধান প্রধান শিল্প এলাকায় বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা। সরকারী সরবরাহগুলি দ্বারা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হবে ;

২) বিদ্যুৎ সরবরাহের বড় বড় সরবরাহ লাইনের সঙ্গে ছোট ছোট লাইনের সংযুক্তিকরণ যাতে কৃষি কাজের জন্য এবং দূরবর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ পৌঁছে দেওয়া যায়। এরফলে বড় বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সমগ্র এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে ;

৩) এলাকার মধ্যে কিভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে সে সম্পর্কে যতটা সম্ভব একটি পদ্ধতি নির্নয় করা।

এই ত্রিদফা কর্মসূচিই হচ্ছে গ্রিড প্রথার ভিত্তি। ১৯২৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে এই পদ্ধতি চালু আছে। আমার ধারণা আমাদের দেশে যদি এই ধরনের আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাহলে দেশের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সব গ্রাহকদের কাছে আমরা সস্তা দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারব। আপনাদের প্রত্যেকের জানবার আগ্রহ থাকতে পারে যে যুক্তরাজ্যে যখন প্রথম গ্রিড পদ্ধতি বৃহদাকারে প্রবর্তন করা হয় তখন এক হিসাবে ধরা হয়ে যে ১৯৪০-৪১ সালে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন বেড়ে দাঁড়াতে পারে ২৫০ কোটি ইউনিট। ব্যাপকভাবে বিদ্যুতের এই উৎপাদন বাড়ার জন্য ইউনিট প্রতি বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ ১৯২৫-২৬ সালে ৯.৪ পেন্স থেকে কমে দাঁড়াবে মাত্র ৪ পেন্সেরও কমে। শুধু তাই নয় বড় শিল্পে প্রতিষ্ঠানগুলি কম দামে তাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাবে। এর জন্য তাদের ব্যয় করতে হবে ইউনিট প্রতি মাত্র অর্ধ পেন্স।

আলোচনার বিষয় সমূহ : এখন আমি আজকের বৈঠকের আলোচ্যসূচি নিয়ে কথা বলব। আপনাদের জানাচ্ছি যে আজকের আলোচ্যসূচীতে সর্বমোট চারটি বিষয় আছে। চার নম্বর বিষয়টি আপনাদের বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে। এতে দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এক বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্যদ গঠন এবং দ্বিতীয়—বিদ্যুৎ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয়দের বিদেশে পাঠানো এ দুটির কোনওটিই বিতর্কিত নয়। সুতরাং এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমি আপনাদের সময় নষ্ট করব না। চার নম্বর বিষয়ের মতো দুই নম্বর বিষয় কিন্তু অবিতর্কিত নয়। বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির আয় ব্যয় এবং লাভ সম্পর্কে জানার জন্য নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ দুই নম্বর আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। তবে যতটা মন হয় ততটা বিতর্কিত নয় কিন্তু বিষয়টি। এই বিষয়ের সঙ্গে দুটি প্রশ্ন জড়িত একটি নয়। এই দুটি বিষয় যদি আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে কিন্তু বিতর্ক অনেক কমে যাবে।

প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কোনও বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থার লভ্যাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য দেয় মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কভুক্ত হবে কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে উচিত লভ্যাংশ কিভাবে ঠিক করা হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলতে চাই যে এ বিষয়ে এমন কোনও বিতর্ক নেই। উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ হচ্ছে মানুষের প্রধান প্রয়োজন। সুতরাং অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য সরবরাহকারীর খুশিমত নির্ধারিত. হতে পারে না। সস্তাদরে এবং প্রচুর পরিমাণে যদি বিদ্যুৎ সরবারহ সম্ভব না হয় তাহলে সারা ভারতের শিল্পে সম্ভাবনা সঙ্কটের মুখে পড়বে। সুতরাং লভ্যাংশ ও বিদ্যুতের খরচের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। এটি যদি অনুমিত হয় তাহলে খরচ বিধি প্রয়োগ করার ব্যাপারে কোনও প্রকার বিতর্ক হবে না। এর ফলে একাদিকে যেমন বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি ন্যায়সঙ্গত লাভ করতে পারবে অন্যদিকে বে-আইনি লাভের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যাবে।

হিসাব নীতি : এই বিষয়টি গুরুত্বের দিক থেকে দ্বিতীয় মাত্রার। হিসাব নীতির কথা বলে আমরা বিপ্লবাত্মক কিছু প্রবর্তনের চেষ্টা করছি না। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত ব্রিটিশ আইনে যা রয়েছে আমরা তার অনুসরণ করছি মাত্র। ১৯২৫ সালের লন্ডন বিদ্যুৎ আইন এবং ১৯২৬ সালের বিদ্যুৎ সরবরাহ আইনে এর সংস্থান রয়েছে। ভারত সরকারের বিদ্যুৎ কমিশনার একটি স্মারকলিপি তৈরি করেছেন। ঐ স্মারকলিপিতে তিনি সব বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির জন্য একটি করে হিসাবনীতি চালু করার প্রস্তাব করেছেন। তাঁর ঐ স্মারকলিপি মতামতের জন্য প্রাদেশিক সরকার এবং বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির মধ্যে বিলি করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সম্পর্কে একইমত পাওয়া যায়

নি। মতামতের মধ্যে যেসব বিভিন্নতা রয়েছে তার পার্থক্য কমিয়ে আনতে ভারত সরকার একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করার কথা বলেছেন। ঐ পর্ষদ এব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দেবেন। আমি আশা করি আপনারা এটিকে একটি সন্তোষজনক সমাধান হিসাবে মেনে নেবেন।

এখন বাকি থেকে যাচ্ছে আলোচ্যসূচীর এক এবং তিন নম্বর বিষয়। এই দুটি আমাদের আলোচ্যসূচীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ ব্যাপারে আলোচনা করতে যদি আমি একটু সময় নিই তাহলে আশাকরি আপনারা কিছু মনে করবেন না।

এক নম্বর বিষয় সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ কমিটির গত সভায় কি ঘটেছিল তা আপনাদের সরণ করিতে দেওয়া প্রয়োজন। বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার পর নীতি নির্ধারণ কমিটি স্থির করলেন যে শ্রম দফতর একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করবে। বৈঠকে আলোচনার বিষয় ঐ খসড়া প্রস্তাবে থাকবে এবং কমিটির পরবর্তী বৈঠকে ঐ খসড়া আলোচনার জন্য শেষ করা হবে। সেই অনুযায়ী একটি খসড়া প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ,—"এই বৈঠকে এই মর্মে সুপারিশ গৃহীত হয়েছে যে, ভারতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আরও উন্নতির জন্য সরকারি অথবা আধা সরকারি স্তরে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে এবং এক্ষেত্রে প্রদেশগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যে সব বাধা উপস্থিত হবে তা দূর করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে, তা সেই বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা সরকারি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা বাণিজ্যিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত যাই হোক না কেন।"

তবে এই খসড়া প্রস্তাবটি খুব পরিষ্কার ছিল না বলে মনে করা হয়। প্রস্তাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার আরও উন্নতির কথা বলা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যেসব সংস্থা ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে সেগুলির সম্পর্কে এই প্রস্তাবে কিছু বলা হয় নি। বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্য কোনও বাধা সামনে উপস্থিত হলে সেগুলি সম্পর্কে প্রস্তাবে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কি সেই বাধা সে সম্পর্কে, কোনও উল্লেখ নেই। এই পরিস্থিতিতে সবার মনের সব রকম সন্দেহ নিরসনে একথা ঠিক হয় যে নীতি নির্ধারণ কমিটির পরবর্তী বৈঠকে বিষয়গুলি নিয়ে আরও ভাল করে আলোচনা করা হবে। এই ভাবে এক নম্বর বিষয় এখন যা আছে তা স্থির করা হয়।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ এবং মালিকানা : নীতি নির্ধারণ কমিটির গত বৈঠকে একথা সুস্পষ্টভাবে স্থির হয় যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য যে সব এলাকায় উদ্যোগের

অভাব সেখানে সরকারি বা আধা সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যে সব এলাকায় বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই কাজ করছে সেখানে সরকারের অংশগ্রহণ নিয়ে একটি সংশয় থেকেই যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে লাইসেন্স সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দিলে রাষ্ট্রীয় বা অন্য কর্তৃপক্ষ সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানাকে অধিগ্রহণ করবে। তবে আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে অধিকতর বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অথবা বিদ্যুৎ উৎপাদনের নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সরকার কি বেসরকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। এক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে সঠিক আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্য কোনও প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ সরবরাহ অন্য আর একটি সংস্থাকে দেওয়া হল এবং বর্তমান সংস্থার পরিচালন এবং সম্প্রসারণের যাবতীয় বিষয় আঞ্চলিক উন্নয়নের কথা সামনে রেখেই করতে হবে। অতএব আমরা এই আলোচনার বিষয়টি পরিষ্কার করে নিতে চাই কিভাবে এবং কতটা পরিমাণে রাষ্ট্রীয় মালিকানা কাজ করবে এবং যেখানে এখনই রাষ্ট্রীয় মালিকানা কাজ করতে পারছে না সেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পরিধি কতটা হবে।

জেভনের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য : রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সর্বদাই একটি বিতর্ক রয়েছে। ভারত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই বিতর্ক আরও জোরদার হয়েছে। অভিজ্ঞ জেভন (Jevon) তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'রাষ্ট্রের সঙ্গে শিল্পের সম্পর্ক' (State Relation of Industry) তে কতকগুলি অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সীমারেখা টানা যায় এবং জেভনের তত্ত্বই বেসরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জেভন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ক্ষেত্রে চার ধরনের বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল (১) মূলধনের স্বল্পতা (২) নিয়মমাফিক পরিচালনা (৩) ডাক, তার ও টেলিফোন পরিসেবার মধ্যে সমন্বয় এবং (৪) জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাচুর্য যা কোনও প্রকল্প স্থাপনের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য।

এদেশে জেভনের অনুরাগীরা আরও অতিরিক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগের পরিধিকে সীমিত করা। এই বিষয়টি হচ্ছে যেসব ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগে লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা নেই। এই ক্ষেত্রে তারা সরকারি উদ্যোগের পরিধিকে সম্প্রসারিত করার কথা বলেছেন। যেহেতু বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্র রয়েছে সেইহেতু এই দুইয়ের মধ্যে বিতর্ক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান সময়ে বেসরকারি উদ্যোগে

একটি পর্যায় মাত্র। যখন শিল্প বিরাট বিরাট যৌথ মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন অর্থনীতির বিচারে বেসরকারি উদ্যোগ বলে কিছু থাকে না। একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য যখন দুঃসাহসী কোনও পরিকল্পনা নয় বরং সাবধানতা এবং বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠানের বিবেচ্য হল মুনাফাকে সুস্থিত করা তখন অর্থনৈতিক বিচারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ বলে কিছু থাকতে পারে না। এই বিতর্কে যাওয়া আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করি। রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা তেমন নেই। সুতরাং বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হবে না। তিন নম্বর বিষয়ে বলা হয়েছে যখন বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কোনও সংস্থাকে লাইসেন্স দেওয়ার পর তার সময় সীমা বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর কার উপর দায়িত্ব বর্তাবে। বিষয়টি বিদ্যুৎ সংস্থা ক্রয় করা সংক্রান্ত ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের সাত নম্বর ধারার এর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সংস্থান রয়েছে। এই ধারা অনুযায়ী এই বিদ্যুৎ সংস্থা ক্রয় করার ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দিতে হবে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে। কিন্তু এব্যাপারে স্থানীয় কেউ এগিয়ে না আসলে এই দায়িত্ব বর্তায় প্রাদেশিক সরকারের উপর। আলোচ্য বিষয়সূচিতে তিন নম্বর বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে। আর যদি যায় তাহলে তা কোন পর্যায়ে এবং কোন পরিস্থিতিতে। এখানে প্রস্তাব করা হচ্ছে বিদ্যুৎ সংস্থা ক্রয় করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারেরও একটি ভূমিকা থাকা উচিত। বিদ্যুৎ যেহেতু জনস্বার্থ বিষয়ক সেইকারণে কোনও বিদ্যুৎ সংস্থা ক্রয় করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

প্রাদেশিক না কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ? দুর্ভাগ্যক্রমে এই নীতি গ্রহণের ব্যাপারে কিছু অসুবিধা আছে। ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় জড়িত। এক রাষ্ট্রীয় বনাম বেসরকারি পরিসেবা এবং প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় পরিসেবা। দুটি বিষয়েই আমরা সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং তিন নম্বর বিষয়ে মূলত দ্বিতীয় প্রসঙ্গটি সংশ্লিষ্ট। যারা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিশ্বাসী তাদের কাছে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক উদ্যোগ নিয়ে সমস্যার প্রশ্ন ওঠে না এবং যেখানে প্রাদেশিক উদ্যোগ যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব সেখানে কেন্দ্রীয় উদ্যোগকে এগিয়ে আসতে হবে। এ নিয়ে কোনও প্রকার আপত্তির কারণই থাকতে পারে না। তাছাড়া আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে প্রকল্পের স্থান প্রাদেশিক সীমানা বাইরে সেখানে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণই আবশ্যক। জলপথের মতো বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলিকে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও সহযোগিতা থাকতে হবে। আঞ্চলিক উন্নয়নের স্বার্থে যেখানে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন

সেখানে কেন্দ্রেরই এগিয়ে আসা উচিত। এসব ক্ষেত্রে প্রদেশ অপারগ হলে কেন্দ্রকেই এগিয়ে আসতে হবে।

আলোচ্য বিষয়েসূচির বাইরে যেসব প্রশ্ন উঠতে পারে সে সম্পর্কে আমি যা বলেছি তার অতিরিক্ত আর কিছু বলার থাকতে পারে তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক না আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি একথা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে ভারতীয় অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য আপনারা যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন দেশের জনমতের সঙ্গে তার যেন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। এটা মনে করা ভুল হবে যে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনমতের কোনও ভূমিকা নেই একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে জনমতের অর্থ হচ্ছে যুক্তিহীন ভাবে প্রাচীন ধ্যান ধারণায় আকড়ে থাকা। বরং আমি মনে করি জনমত বামপন্থীদের ধারণা থেকেও আরও উন্নত।

যে বিষয়ের উপরে আমি গুরুত্ব দিতে চাই তা হল কোনও প্রকল্প সম্পর্কে জনমতের সমন্বয়। ভারতের মতো দেশে যেখানে সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সেখানে জনমতের উপর গুরুত্ব দেওয়াটা কোনও বাড়াবাড়ি নয়। লোকে রাশিয়ায় পরিকল্পনার সাফল্যের কথা বলে থাকে। কিন্তু তারা ভুলে যায় যে এই সাফল্যের সবথেকে বড় কারণ হল রাশিয়ায় কোনও সংসদীয় সরকার নেই। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যারা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তাদের মনে সব সময় একটি ভীতি থাকে যে তাদের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনা হতে পারে এবং তারা কখনও নিশ্চিত হতে পারেন না যে যে পরিকল্পনা তারা প্রণয়ন করছেন তা রূপায়ণ করার জন্য যথেষ্ট সময় তারা পাবেন কিনা, পরিকল্পিত অর্থনীতি সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কিনা এবং যদি হয়েও থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যাবে তা একটি বড় প্রশ্ন এবং এটি তার আলোচনার জায়গা নয়। অতএব আমি আপনাদের প্রত্যেককে সতর্ক করে দিচ্ছি এই বিষয়ে যদি আমাদের উত্তরাধিকারীরা যাতে আমাদের প্রকল্পকে বাতিল করতে না পারে সে ব্যাপারে আমরা সাবধান হবো এবং আপনাদের দেখতে হবে যে এ ব্যাপারে বেশীর ভাগ মানুষের সম্মতি আছে এবং এতে দেশের অধিকাংশ মানুষের কল্যাণ জড়িত।

কমিটির সুপারিশ : 'পূর্ত ও বিদ্যুৎ শক্তি' সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ কমিটি এই মর্মে সুপারিশ করে যে বর্তমান লাইসেন্সপ্রাপ্ত এলাকার বাইরে বিদ্যুৎ উন্নয়নের বিষয়টি সরকারি অথবা আধা সরকারি উদ্যোগে যত শীঘ্র সম্ভব দ্রুততার সঙ্গে

কার্যকর করতে হবে। যদি কোনও একটি কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ এলাকায় এই প্রকল্পের কাজ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্রহণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগের কথা ভাবতে হবে। ঐ কমিটি আরও সুপারিশ করে যে যদি দক্ষতা এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে পরিসেবা যদি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে যে কোনও লাইসেন্স এর আওতায় বেসরকারি উদ্যোগের কথা ভাবা যেতে পারে। তবে দেখতে হবে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় যে কোনও উদ্যোগেই হোকনা কেন অথবা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে হোক না কেন স্বাভাবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প উন্নয়নের পথে যদি কোনও বাধা আসে তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।

আর একটি সুপারিশে কমিটি জনস্বার্থে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর্থিকনীতি স্থির করার উপর জোর দেয়। এই অর্থিকনীতি স্থির করার জন্য বিদ্যুৎ আইনের ৩৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী একটি উপদেষ্টা পর্ষদ গঠন করার কথা বলা হয়। এই উপদেষ্টা পর্ষদে দুইজন প্রতিনিধি থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের দুইজন থাকবেন প্রাদেশিক স্তরের এবং একজন প্রতিনিধি থাকবেন বিদ্যুৎ সংস্থা সংঘ থেকে। প্রাদেশিক প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন প্রদেশগুলির মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে। পর্ষদ প্রয়োজন মতো পরামর্শদাতা নিয়োগ করতে পারবে বলেও ঐ সুপারিশে বলা হয়।

বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি স্থির করার উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালের ভারতীয় বিদ্যুৎ আইনের সাত নম্বর ধারা সংশোধন করার জন্য যে আলোচনা হয় তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমীক্ষার জন্য কয়েকটি বিষয় উত্থাপিত হয়। কমিটি এই মর্মে একমত হয় যে আইনটি এমনভাবে সংশোধিত হবে যে কোনও সংস্থা অধিগ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে আন্তপ্রাদেশিক উন্নয়নের জন্য যদি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় তাহলে অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অগ্রাধিকার থাকবে। কয়েকটি প্রশ্নের আলোচনায় অবশ্য মতপার্থক্য থেকে যায় এবং স্থির হয় যে প্রদেশগুলির সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিষয়টি পুনরায় সমীক্ষা করা হবে।

সরকারের প্রশিক্ষণের প্রকল্প : নীতি নির্ধারণ কমিটি কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিদ্যুৎ পর্ষদ গঠন এবং দশজন ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের বিদেশে গিয়ে বিদ্যুৎ শিল্পের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের বিষয়টিকে স্বাগত জানায়। এই দশজন ইঞ্জিনিয়ারের চারজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি উপত্যকা কর্তৃপক্ষত্বে, চারজন যুক্তরাজ্যে এবং দুইজন কানাডায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতেন। এদের মধ্যে দুজন কেন্দ্রীয় সরকারের, চারজন প্রাদেশিক সরকারের দুইজন দেশীয় রাজ্যগুলির এবং বাকী দুইজন সরকারি

বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা থেকে আসবেন। দুই কেন্দ্রীয় সরকারের ইঞ্জিনিয়ারের জন্য সব খরচই বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। এছাড়া আরও বলা হয়। পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারগণ বিদ্যুৎ শিল্পের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেবেন। সরকার এরপর প্রযুক্তিগত বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য আরও দুটি ব্যাচকে বিদেশে পাঠাতে চান।

নীতি নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর। আর এই বৈঠকে অংশ নেন ভারত সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সদস্য মাননীয় স্যার এ. আর. দালাল, বাংলার বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী মাননীয় কে. সাহাবুদ্দিন, সিন্ধুপ্রদেশের পূর্ত মন্ত্রী মাননীয় রায় বাহাদুর গোকুলদাস, স্যার মিরজা ইসমাইল এবং রাজা ধরম করম বাহাদুর। এছাড়া কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিবর্গ, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বেসরকারি প্রতিনিধিগণ, বিদ্যুৎ সংস্থা সংঘ এবং ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার সংস্থার প্রতিনিধিগণও এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

□ □ □

৪১

*ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারের নীতি

শ্রী কে. সি. নিয়োগি : মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শুরু করেছি।

"ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এই খাতে দাবি একশো টাকা হ্রাস করা যেতে পারে।" বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ভারতের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে সরকারি নীতি কি তা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই। কিন্তু সময়ের দিকে তাকিয়ে আমি বলছি আমার বন্ধুকে এ সম্পর্কে আমার বিবৃতি দেওয়ার জন্য যতটা সময় দরকার তা যেন বরাদ্দ করেন, কারণ এই আলোচনা আমরা সবাই চাই। আমি এখন এখানে যা বলব তার অনেক বিষয় আমি ইতিপূর্বেই তাঁকে জানিয়েছি। এখন এখানে বলার জন্য আমার সময়ের প্রয়োজন। যেহেতু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমার বক্তৃতার অপেক্ষা বেশি প্রয়োজন এ সম্পর্কে তার একটি বিবৃতি। আমার মাননীয় বন্ধু যদি এ বিষয়ে একটি তথ্যমূলক বিবৃতি দেন তাহলে অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ হবে।

মাননীয় সহ সভাপতি (শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত) : ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হল।

"ভারতের ভূতাত্ত্বিক সংক্ষেপ এই খাতে দাবি একশো টাকা কমানো যেতে পারে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : মাননীয় সহ-সভাপতি, আমি সত্যিই খুবই আনন্দিত যে শ্রী নিয়োগি এখন যে ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তা অনেক আগেই তার আনা উচিত ছিল কারণ ছাঁটাই প্রস্তাব সরকারের কাছে সুযোগ এনে দেয় তার খনিজনীতি ব্যাখ্যা করার। এ পর্যন্ত সরকার এই কাজটি করেননি। এই বিষয়টির অজ্ঞতা ও ভুল বোঝাবুঝি এতই বেশি যে আমি মনে করি প্রত্যেকের স্বার্থে খনিজ সম্পদের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই সভার কাছে ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। মহোদয়, আমি দুঃখিত এবং আমার কোনও সন্দেহ নেই এবং সভার অন্যান্য সদস্য আমার সঙ্গে একমত হবেন যে একমাত্র সময়ের অভাবের জন্যই

শ্রী নিয়োগি এ সম্পর্কে তার মৌখিক বিবৃতি পূর্ণ করতে সক্ষম হন নি। এটি অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে এবং আমি তার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তিনি তার বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত করে আমাকে বলার সুযোগ করে দিলেন।

মহোদয়, এটি খোলাখুলি বোধ হয় বলা ভাল যে ভারত সরকারের এ পর্যন্ত কোনও খনিজ নীতি ছিল না। এ বিষয় নিয়ে অভিযোগ তোলা যায়। কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু নেই। খনিজ-নীতি না থাকার জন্য ভারতের ভূতাত্ত্বিক সংক্ষেপকে দায়ী করা যায় বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু আমি মনে করি এটি একটি অন্যায় অভিযোগ। এই ভুল ধারণা দূর করার জন্য আমি আমার বক্তৃতার প্রথমে কিছুটা সময় নিতে চাই।

আমি মনে করি এটি স্বীকৃত ঘটনা যে, যে কোনও সরকারের খনিজনীতি নির্ভর করে সেই সরকারের শিল্পনীতির ওপর। দেশের শিল্পায়ন খনিজ সম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এবং কোনও দেশের শিল্পনীতিই যদি না থাকে তাহলে মুখতই খনিজনীতি থাকার প্রশ্ন ওঠে না। এই সভা ভাল করেই অবগত আছেন যে যতদিন পর্যন্ত না ভারত সরকার দেশের আর্থিক ও শিল্প জাগরণে কোনও লক্ষ্য স্থির করছে ততদিন বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর কালে দেশে শিল্পের উন্নতিতে সরকারের বিশেষ ভূমিকা নেই।

ড: পি. এন. ব্যানার্জী : কি দুঃখজনক ঘটনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটি দুঃখজনক ঘটনা হোক আর ক্ষোভের কারণ হোক না কেন এই মুহূর্তে তা আমার আলোচ্য নয়। এখানে আমি যা বলার চেষ্টা করছি তা হল খনিজ নীতি না থাকার জন্য ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ দায়ি করা যায় না। এর জন্য দায়ি হল বর্তমান সরকার। এই জন্য সম্ভবত দায়ি করা যায় আইন বিভাগকে এবং অন্য আরও অনেক সংগঠনকে যারা ভারতের আর্থিক ও শিল্পের উন্নয়নে আগ্রহী ছিল।

এরজন্য দ্বিতীয় কারণ হল কেন ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভুতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে নি। এর একটি বড় কারণ এই যে এই বিভাগটির কর্মীসংখ্যা অনেক কম। ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের কর্মীসংখ্যা এবং এর বিশেষত কারিগরী কর্মীসংখ্যা বিষয়ে আমি সভাকে কিছু কথা জানাতে চাই। ১৯২০ সালে ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের জন্য একজন সিনিয়র অফিসারের পদ অনুমোদিত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় একজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোকও ঐ পদের জন্য পাওয়া যায় এবং শূন্যপদগুলিতে লোক নিয়োগ করতে দীর্ঘ নয় বছর

সময় লাগে। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় এই হল যখনই খালি পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হল তখনই ১৯৩১ সালে আইন সভায় একটি ব্যয় সঙ্কোচ প্রস্তাব আনা হল এবং যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের প্রায় প্রত্যেককেই আবার ছাঁটাই করা হল। আমি এর উল্লেখ করছি এই কারণে যে যদি ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ দেশে খনিজ সম্পদের ব্যাপারে কোনও নীতিগ্রহণ না করে থাকে তাহলে তার জন্য আইনসভাও কিছুটা পরিমাণ দায়ি।

আমার সীমিত সময়ের মধ্যে অতীতের ঘটনা নিয়ে বেশি বলে লাভ নেই। আমি ভবিষ্যৎ নিয়েই বলতে চাই। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে ভারত সরকার এখন একটি নির্দিষ্ট খনিজ-নীতির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। এর সবচেয়ে বড় কারণ এই যে সরকার এখন দেশের শিল্পায়নে আগ্রহী, পুনর্গঠন এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ১৪ নম্বর ধারায় ভারত সরকারের খনিজ-নীতির কথা বলা হয়েছে। এই ১৪ নম্বর ধারা বা তারে সংক্ষিপ্তসার আপনাদের পড়ে শোনান সময় আমার নেই। তবে আমার মনে কোনও প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই যে যারা এব্যাপারে আগ্রহী তারা নিজেদের উদ্যোগে ১৪ নম্বর ধারায় কি আছে তা তারা দেখে নেবেন।

বিষয়টি সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ধারায় যে ভারত সরকারের খনিজনীতি এর ঐ নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে ভারত সরকারের ভূমিকাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত: আমরা ভারতের ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণকে পুনর্গঠিত করতে চাই। এবং কারণ আমাদের নীতিকে আরও কার্যকর করে তোলা। সেই অনুযায়ী সমীক্ষার ভিত্তিতে একটি বিস্তারিত সম্প্রসারণ প্রকল্প তৈরি করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা অনুমোদনও করা হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের নতুন যে শাখা গঠনের আমরা প্রস্তাব করছি তাতে ইঞ্জিনিয়ারিং, খনিজ সম্পদকে শিল্পে ব্যবহার, খনিজ সম্পদের উন্নয়ন, ভূপ্রাকৃতিক কাজকর্ম, বিল উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এতে থাকবে একটি প্রাকৃতিক ইতিহাস সংক্রান্ত যাদুঘর নির্মাণের কথা এবং কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জনসাধারণকে জানানোর জন্য একটি জনসংযোগ বিভাগ।

আমাদের খনিজ-নীতির দ্বিতীয় অংশে রয়েছে আইন বিষয়ক ব্যাপার। এই আইনের মাধ্যমে খনিজ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। খনিজ সম্পদের উপর আইনের নিয়ন্ত্রণের সীমা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে। প্রথমত সর্বভারতীয় খনিজ সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিরক্ষার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত—খনিজ সম্পদের প্রযুক্তিগত দিক।

তৃতীয়ত—কি উদ্দেশ্যে খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা হবে। চতুর্থত—খনিজ সম্পদের মূল্য অথবা খনিজ সম্পদের সাহায্যে যে পণ্য প্রস্তুত করা হয় তার মূল্য এক্ষেত্রে আইনের সংস্থান দুটি শ্রেণীতে পড়ে অথবা খনিজ সম্পদকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেসব খনিজ সম্পদ সাধারণ নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে পড়ে, সাধারণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আমরা রাখতে চাই সম্ভাবনায় খনিজ শিল্প এবং খনিজ সম্পদের ইজারা দেওয়া, লাইসেন্স দানের শর্ত এবং তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া প্রভৃতি। এরপর থাকছে অন্যান্য খনিজ সম্পদ। এগুলির উপর আরও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তাদের শ্রেণী নির্বাচন করতে হবে। আরও বেশি করে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যেসব খনিজের কথা বলা হয়েছে তার সংখ্যা প্রায় ২৮টি। এগুলি সম্পর্কে আমি এখানে বিস্তারিত বলতে চাই না। অধিক নিয়ন্ত্রণের তালিকায় যেসব বিষয় থাকছে তার মধ্যে আছে লাইসেন্স দেওয়া ছাড়াও খনিজ সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি, শ্রেণী বিন্যাস, মান নির্ধারণ, নিষ্কাশন, খনির উন্নয়ন, খনিজ আহরণ এবং খনিজ সম্পদের বহুল ব্যবহার এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে গবেষণার কাজ শুরু করা।

খনিজ সম্পদের ভারত সরকার যে সাধারণনীতি গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যতটা সংক্ষেপে সম্ভব আমি আপনাদের বুঝিয়ে বললাম।

আমি এখন শ্রী নিয়োগির কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের আলোচনায় যাবো। শ্রী নিয়োগি এর জন্য আগেই নোটিশ দিয়েছেন। প্রথম যে বিষয়টি, তিনি উল্লেখ করেছেন তাহল খনিজ সম্পদের রপ্তানি। আমি সভাকে এই মর্মে আশ্বস্ত করতে চাই যে আইনে যে সংস্থান রাখার কথা বলা হয়েছে তাতে ভারতের বাইরে খনিজ সম্পদ রপ্তানি করার বিষয়টি নিঃসন্দেহে থাকবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা আমাদের খনিজ সম্পদ দেশের বাইরে রপ্তানি বন্ধ করতে পারবো কিনা, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই অন্য আর একটি প্রশ্নের উপর নির্ভর করছে। প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা যদি আমাদের খনিজ সম্পদ রপ্তানি করা সম্পূর্ণ বন্ধ করি তাহলে ভারতে যেসব খনিজ সম্পদের ঘাটতি রয়েছে তা কি আমরা আমদানি করতে পারবো? মাননীয় সদস্যগণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ভারতে তৈল, তামা, সীসা, দস্তা, টিন এবং সালফারের মতো গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং দেশে যে সব খনিজ সম্পদের অভাব রয়েছে তা আমদানি করার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিদেশে খনিজ সম্পদ রপ্তানির বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে নিরাপদ রাস্তা হল ভারত সরকারের উচিত দেশে যে সব খনিজ সম্পদের সরবরাহ কম এবং দেশের শিল্পায়নে যে সব খনিজ সম্পদের প্রয়োজন তার রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করা। দ্বিতীয়ত— আমাদের দেখতে হবে দেশ থেকে কোনও খনিজ সম্পদ যেন কাঁচা অবস্থায় রপ্তানি না হয়। বরং

আমাদের দেখতে হবে যাতে অন্য দেশে রপ্তানি করার পূর্বে আমাদের কাঁচা খনিজ সম্পদ যেন দেশেই নিষ্কাষণ করার ব্যবস্থা হয়। আর একটি বিষয় যার প্রতি শ্রী নিয়োগি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তা হল তেল সম্পর্কে ছাড়। শ্রী নিয়োগির মতো সভার অন্য সদস্যগণ ও অবগত আছেন যে বর্তমানে দেশে তেল, খনির অনুমোদন ও লাইসেন্স দানের ব্যাপারে স্বেচ্ছা ছাড় রয়েছে। এই স্বেচ্ছা ছাড়ের বিষয়টি প্রবর্তন করা হয় এই কারণে যে ভারত সরকার চাননি যে বিভিন্ন তেল কোম্পানি তাদের নিজেদের লাভের জন্য প্রযুক্তিবিদদের নিয়োগ করুক, কারণ দেশে এখন প্রযুক্তিবিদদের একান্তই অভাব রয়েছে। এই স্বেচ্ছাছাড় বিষয়টি যুদ্ধ শেষ এবং তার পরেও কিছুদিন চলতে পারে। মহোদয়, এখন লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে বলতে গেলে ভারত সরকারের আইন প্রণয়নের সময় থেকেই বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারগুলি এপর্যন্ত যে আইন এই বিষয়ে অনুসরণ করে আসছে তা হল ১৯১৯ সালের 'ভারত শাসন আইন'। চালু এই আইনের নীতি ছিল অ-ব্রিটিশ প্রজাদের জন্য 'দরজা বন্ধের' নীতি। ভারত সরকার এই আইন প্রণয়ন করেন এবং এতে এমন সংস্থান ছিল যে কোনও কোম্পানিকে যদি লাইসেন্স পেতে হয় তাহলে দেখতে হবে যে ঐ কোম্পানির লোকজন ভারতীয় অথবা ঐ কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের অধিকাংশ সদস্যরা ব্রিটিশ প্রজা। ভারতীয় প্রজা এবং ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে যে প্রভেদ রয়েছে এই প্রশ্নটি করার আগে শ্রী নিয়োগির সেকথা মনে হয়েছিল কিনা তা আমার জানা নেই। অবশ্য এই বিতর্কে প্রবেশ করার কোনও ইচ্ছা ও আমার নেই। আমি যা বলতে চাই তা হল এই বিষয়টি অন্য আর একটি বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিষয়টি হচ্ছে ভারতীয় আইনের তিন থেকে ১১৮ নম্বর ধারার এবং বিষয়টির উপর অন্য আর একটি প্রস্তাবের উপর সভায় বিতর্ক চলছে। কয়লা সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের নতুন আইনে এ বিষয়ে সংস্থান থাকবে। আমার বন্ধু নিশ্চয়-ই বুঝবেন বিষয়টি বেশ দুরুহ। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে খনি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন পণ্যের মান, বিপনন এবং নিম্নমানের কয়লার ব্যবহার প্রভৃতি। এর সমাধান নির্ভর করে খনির মালিক এবং আমাদের আইনকে ফলপ্রসু করার জন্য যে সব ব্যবসায়ী আছেন তাদের মধ্যে সমন্বয়ের উপর। আমি সভাকে আশ্বস্ত করে বলতে চাই যে যুদ্ধোত্তর পর্বের নীতি হিসেবে আমরা রিপোর্ট সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবো।

ভারত সরকারের নীতি সম্পর্কে আমার সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সাধারণভাবে আমি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। এখন উপসংহারে আমি শুধু একথাই বলবো যে ব্যাপক এবং গতিশীল খনিজনীতি তিনটি অবস্থার উপর নির্ভর করছে। প্রথমত

এটা নির্ভর করছে দেশের শিল্পায়নের গতির উপর। দেশে যদি শিল্পায়নের কাজ শুরু হয় তাহলে অতীতের চেয়ে নিঃসন্দেহে খনিজনীতি আরও গতিশীল হবে। আমাদের খনিজনীতি সফল হবে কিনা এবং তা আরও বেশী মানুষের কাজে আসবে কিনা তা অন্য দুটি অবস্থার উপর নির্ভর করছে। এই বিষয় দুটি হল এক সাংবিধানিক অবস্থার প্রদেশ এবং কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং এক্ষেত্রে দেশীয় রাজ্যগুলির ভূমিকারও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার তার খনিজ নীতি সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আশা করি আমি সভাকে বুঝিয়ে বলেছি।

জনৈক মাননীয় সদস্য : আমি প্রস্তাব করছি যে প্রশ্নটি এখন উত্থাপিত হতে পারে।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : প্রশ্নটি এখন উত্থাপিত হবে। (কয়েকজন সদস্য না না করে উঠলেন) তাহলে আমি সাধারণভবে সভার মত নিয়ে জানলাম যে, প্রশ্নটি এখন উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়।

জনৈক মাননীয় সদস্য : আপনি আলোচনা মুলতুবী ঘোষণা করতে পারেন।

শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ ইসাক সাইত (পশ্চিম উপকূল, নীলগিরি, মুসলমান) ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে এবং সেজন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে (শ্রী এইচ. এ. সাত্তার এইচ. ইসাক সইট) জাতীয়তাবাদী দলকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ এক ধরনের গিলোটিন। এখন অন্য দলকে সুযোগ দিতে হবে। এখন সভার পক্ষে কোনও মতামত দেওয়া উচিত নয়।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : এমন অবস্থা এই যে এই ছাঁটাই প্রস্তাব এখন সভায় উত্থাপন করা যাবে না।

৪২

ভারত সরকারের শ্রম-নীতি

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : শ্রী যোশির গতকালের উত্থাপিত ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে এখন আলোচনা শুরু হবে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : মহোদয়, আমি এবং আমার দল শ্রী যোশি যে ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন তার সঙ্গে নিজেদের সর্বান্তকরণে যুক্ত বলে মনে করি।

কয়েকজন মাননীয় সদস্য : প্রশ্নটি এখন উত্থাপন করা যেতে পারে।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : প্রশ্নটি হচ্ছে.......................

শ্রী এইচ. এ. সাত্তার. এইচ, ইসাক সাইত (পশ্চিম উপকূল ও নীলগিরি - মুসলমান) : এব্যাপারে সরকারের উত্তর কি?

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : আমি অপেক্ষা করলাম, কিন্তু কেউই উঠলেন না।

(এই অবস্থায় দেখা গেল ড. বি. আর. আম্বেদকর তাঁর আসন থেকে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।)

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : মাননীয় সদস্য কি কিছু বলতে চান?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : হ্যাঁ বলতে চাই।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : সভা অধৈর্য হয়ে উঠেছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি ধৈর্য ধরার চেষ্টা করবো আমি কথা দিচ্ছি।

শ্রী যোশি গতকালের তাঁর ছাঁটাই প্রস্তাবের সমর্থনে শ্রম-দফতরের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ তোলেন। তিনি তার বক্তব্যের উপসংহারে শ্রম-দফতরের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেন যে ঐ দফতর তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে

এবং শুধুমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করতে পারেনি যে তাই নয়, যে কথা বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেছেন তাকে আমি মনে করি এক প্রকার অতিরঞ্জিত বক্তব্য। তিনি বলেছেন শ্রমিকদের প্রতি শ্রম-দফতরের সামান্য সহানুভূতিও নেই। মহোদয়, আমার মাননীয় বন্ধুর বক্তব্য অনেকটা টেলিগ্রাফের ভাষার মতো, গ্রামারের ধার তিনি ধরেন নি এবং তিনি তার উপসংহারে তার বক্তব্যের সমর্থনে বিশেষ কোনও যুক্তিও তুলে ধরতে পারেন নি। আমি মনে করি তার এই ছাঁটাই প্রস্তাবে কিছু অসুবিধা রয়েছে। আমি অবশ্য তার অভিযোগের জবাবে যথাসম্ভব কিছু করার চেষ্টা করবো।

মহোদয়, শ্রম দফতরের বিরুদ্ধে তার প্রথম অভিযোগ হল মহার্ঘভাতা সম্পর্কে। তার অভিযোগ ভারত সরকার যে মহার্ঘভাতা দিয়ে থাকেন তা পর্যাপ্ত নয়। তার দ্বিতীয় অভিযোগ হল যদি আমি তার কথা ঠিকমত বুঝে থাকি তাহলে তিনি বলতে চেয়েছেন ভারত সরকারের এই মহার্ঘ্যভাতা প্রদান করার মধ্যে কোনও প্রকার সমতা নেই। তার প্রথম অভিযোগের উত্তরে আমি বলতে চাই, এবং আশা করি শ্রী যোশি এব্যাপারে একমত হবেন যে পর্যাপ্ত কথাটির অর্থ অবশ্যই প্রত্যেকের কাছে আলাদা হতে পারে। এমন দুজন লোক খুঁজে পাওয়া সমস্যা হবে যারা মহার্ঘ্যভাতার পরিমাণের ব্যাপারে একমত হবেন। সুতরাং আমি এব্যাপারে আর আলোচনায় যেতে চাই না। মাননীয় সদস্যদের আমি যা বলতে চাই তা হল ভারত সরকার মহার্ঘ্যভাতা দেওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী এবং পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছেন। শ্রমিকদের মহার্ঘ্যভাতা যে সরকার মাঝে মধ্যে বাড়িয়ে দিচ্ছেন এতে কোনও প্রকার সন্দেহ নেই। এব্যাপারে সভাকে কিছু তথ্য দেওয়া যেতে পারে। আমরা স্মরণ করতে পারি যে প্রথম মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া হয়েছিল ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে। এরপর ১৯৪৩ সালে জানুয়ারি মাসে ঐ ভাতা আবার বাড়ানো হয়। মহার্ঘ্যভাতা আবার বাড়ানো হয় ১৯৪৩ সালের জুন মাসে। (জনৈক মাননীয় সদশ্য—১৯৪২ সালে মহার্ঘ্যভাতার পরিমাণ কত ছিল?) বিস্তারিত ভাবে এ সম্পর্কে বলার জন্য আমার সময় নেই এবং আশাকরি মাননীয় সদস্য আমার বক্তব্য পেশ করতে দেবেন। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে মহার্ঘ্যভাতা আবার বৃদ্ধি করা হয়। আমরা যে শুধুমাত্র মহার্ঘ্যভাতা বৃদ্ধি করেছি তাই নয়। যে সব শ্রমিক মহার্ঘ্যভাতা আওতার অধিকারী সময় সময় আমরা তাদের সংখ্যাও বাড়িয়েও দিয়েছি। প্রথম ধাপে যখন মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হত তখন শ্রমিকদের সংখ্যা ১০০ থেকে ১২০-র মধ্যে সীমিত করা হয়। তৃতীয় ধাপে ঐ সংখ্যা বাড়িয়ে ১৫০ করা হয় এবং পরে তা বাড়িয়ে আরও বাড়িয়ে ২৫০ করা হয়। আমি সভাকে একথা

বলতে চাই যে ভারত সরকার অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখছেন মহার্ঘ্যভাতা আরও বাড়ানো যায় কিনা এবং আমি আশাকরি এবং বিশ্বাস রাখি যে, খুব শীঘ্রই এব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবে। তার সমতার প্রশ্নে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সত্যিই সমতা নেই। ভারত সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মী বিভিন্ন হারে মহার্ঘ্যভাতা পেয়ে থাকেন। কিন্তু মহোদয়, আমি একটি প্রশ্ন তুলতে চাই এবং তা হল। এই সমতা না থাকার জন্য দায়ী কারা? একথা আমার বলতে এতটুকুও সঙ্কোচ নেই যে মহার্ঘ্যভাতা প্রদানের ব্যাপারে এই সমতা না থাকার জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকেন তাহলে শ্রী যোশীই হলেন সেই ব্যক্তি।

শ্রী এন. এম. যোশি : কেন আমি দায়ী হব? আমি সরকার নই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যখন আমি যোশি বলে সম্বোধন করি আমি পুরো শ্রম দফতরকেই বুঝি। সমতার অভাবের জন্য দায়ী তারাই। মহার্ঘভাতা অনুমোদনের ক্ষেত্রে যা হয়েছে তাহল এই। শ্রম-দফতরে বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। যেমন রেলকর্মীদের সংগঠন ডাক ও তার ইউনিয়ন সুতীবস্ত্র ইউনিয়ন এইরকম আরও অনেক। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে আরও অনেক কর্মী আছে যাদের প্রকৃতপক্ষে কোনও সংগঠন নেই। আমি আশাকরি শ্রী যোশি এব্যাপারে একমত হবেন যে অধিকাংশ শ্রমিক সংগঠন যে নীতি অনুসরণ করে থাকে তাহল এক প্রকার সংগঠিত লুঠের নীতি। প্রথম ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে যতটা সম্ভব বেশী আদায় করার চেষ্টা করে থাকে এবং এরফলে অন্যরা বঞ্চিত হয়। যেমন ধরা যাক রেল সংগঠনের প্রতিনিধিরা রেল পর্ষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রভাব বিস্তার করে পর্ষদের কাছ থেকে সব থেকে বেশি মহার্ঘ্যভাতা আদায় করে নিল। তারপর ধরুন ডাক ও তার ইউনিয়ন ঐ ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা ঐ দফতরের দায়িত্ব প্রাপ্ত আমার বন্ধু শ্রী যোশির উপর প্রভাব খাটাল, তারা ধর্মঘট করার হুমকি দিল, তারা বলল তারা দেশের পরিষেবা ব্যবস্থার পক্ষে সবথেকে অপরিহার্য এবং এই বলে তারা আমার বন্ধুর কাছ থেকে সব থেকে বেশি সুবিধা আদায় করে নিল। দেশের বাকি অন্যান্য শ্রমিকদের স্বার্থ দেখার কেউ নেই এবং আমি সারা ভারত শ্রমিক ইউনিয়ন কংগ্রেস অথবা সারা ভারত শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে একত্রিত হবার কোনও প্রকার প্রচেষ্টা দেখিনি যাতে করে সরকারের বিভিন্ন পরিষেবা মূলক কাজের কর্মীদের জন্য মহার্ঘ্যভাতার ক্ষেত্রে একইনীতি প্রযোজ্য হতে পারে।

শ্রী এন. এম. যোশি : এক-ই নীতি প্রণয়ন করা কি সরকারের কাজ নয়?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ নিশ্চয়ই। যদি সরকারের সামনে সে পথ খোলা থাকে তবেই, কিন্তু দেখা যায় প্রতিবারই দেখা যায় কোনও একটি বিভাগের শ্রমিকরা এগিয়ে এসে তাদের অস্ত্রপ্রয়োগ করে বলে, আমরা কাজ করবো না এবং আমাদের দাবি না মানলে আমরা ধর্মঘটে যাবো। সরকার এব্যাপারে সত্যিই খুব অসহায়। (জনৈক মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেন, কেন আপনারা একসঙ্গে বলেন না?) এরপর শ্রী যোশি অনৈচ্ছিক বেকারের কথা বলবেন। আমি মনে করি তিনি খানিকটা ঔদ্ধত্যের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তির কথা উল্লেখ করেছেন ঐ বিজ্ঞপ্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলিকে এবং নিয়োগকর্তাকে বলেছেন যেখানে কয়লা এবং অন্যান্য কাঁচামালের অভাবে জন্য অনৈচ্ছিক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে নিয়োগকারীরা যেন কর্মীদের কিছু ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা আমাদের চিঠিতে প্রাদেশিক সরকারকে জানিয়েছি যে ভারত সরকার শ্রমিকদের বেকার থাকার সময় একটি নির্দিষ্ট হারে কিছু অর্থ দিতে রাজী আছেন। আমরা তাদের জানিয়েছি কাজ না থাকার প্রথম ১৫ দিনের জন্য শ্রমিকদের তাদের বেতনের ৭৫ ভাগ এবং দ্বিতীয় ১৫ দিনের জন্য বেতনের ৫০ শতাংশ দিতে হবে। এই সময়টা হবে একমাসকাল এবং তাদের অপেক্ষমান অর্থ তালিকায় থাকতে হবে সাত মাস। শ্রী যোশি বলেছেন যে এইসব সুযোগ সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি কার্যকর করার ব্যাপারে ভারত সরকার আর অতিরিক্ত কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। মহোদয়, আমি এখন বলতে চাই যে শ্রী যোশি যে চিঠি প্রাদেশিক সরকার এবং মালিকপক্ষকে উদ্দেশ্য করে প্রচারিত হয়েছিল তা পড়লে তিনি দেখতে পেতেন যে এই অনৈচ্ছিক বেকারত্বের খরচ মেটানোর জন্য আমরা কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেখেছিলাম। ঐ চিঠিতে আমরা বলেছি যে এই অনৈচ্ছিক বেকারত্বের জন্য যে অর্থ শ্রমিকদের দেওয়া হচ্ছে। তা আয়কর সংগ্রহের জন্য রাজস্ব খাতে এবং অন্যান্য (E.P.T.) খাতে খরচ দেখানো হবে। এই পরিস্থিতিতে আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি যে এটি ছিল একটি বিশেষ ব্যাপার এবং এর থেকে বেশি প্রয়োজনের কথা আমরা চিন্তা করিনি। এছাড়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা আইনে ৮১-এ ধারায় বলা হয়েছে যে সমস্ত শ্রমিকদের ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অবস্থা জানিয়ে বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে আবেদন জানাতে পারে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বিষয়টি সেই দিকেই মোড় নিচ্ছে। মাননীয় সদস্যগণ অবশ্যই অবগত আছেন যে বর্তমান এই বিষয়টি নিয়ে আহমেদাবাদে মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা হচ্ছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি শ্রী যোশি বলতে চেয়েছেন তাহল শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে তাঁর অভিযোগের ভিত্তি সঠিক কি তা সঠিক আমি বুঝতে পারি না। বর্তমান এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা আছে আর তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা পরিষ্কার নয়। আমি তার কাছ থেকে শুধুমাত্র এইটুকুই বুঝতে পেরেছি যে তিনি বলতে চেয়েছেন ক্ষতিপূরণ পর্যাপ্ত নয়। এখন এই সভার পুনরায় জানানো উচিত যে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনে মজুরির সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। এই ক্ষতিপূরণ শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে পরিমাপ হয় না টাকার অঙ্ক নির্ধারণ করার জন্য অন্য অনেক কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত।'

এর থেকে বিষয়টি পরিষ্কার যে সেখানে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি রয়েছে যেখানে সে শুধুমাত্র যে টাকার পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবে তাই নয় উপরন্তু যে ক্ষতিপূরণ পাবে তার মহার্ঘ্য ভিত্তিতেও। শ্রী যোশি আরও উল্লেখ করেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনে আইনে পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে এব্যাপারে কিছুই করা হয়নি। তিনি আরও জানিয়েছেন যে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী ইংলন্ডে যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি এবং পরিস্থিতি হল এইপ্রকার। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে শ্রী যোশি বিষয়টি ঠিকমত বুঝতে পারেন। সভার মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইনে ব্রিটেনে শ্রমিকদের সামরিক ভিত্তিতে অর্থ দেওয়া যায়। কিন্তু ভারতে এই ক্ষতিপূরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, থোক টাকার ভিত্তিতে। এর ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। থোক টাকার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে একজন শ্রমিক তার প্রাপ্য পাওয়ার পরই তার প্রতি কর্ত্তব্য শেষ, তার প্রতি আর কোনও দায়বদ্ধতা থাকে না, না সরকারের না মালিকের কিন্তু যেখানে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়াটা একটি ক্রমপর্যায়ের বিষয় এবং সেখানে ক্ষতিপূরণ একটা সময় পর্যন্ত দিতে হবে সেখানে দায়বদ্ধতা স্বাভাবিক ভাবে মালিকের উপর বর্তায় এবং মালিক হিসাবে সে কর্মরত শ্রমিককে মহার্ঘ্যভাতা দিতে বাধ্য। অনুরূপভাবে ব্রিটিশ আইনে একজন মালিক তার শ্রমিককে বাড়তি ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। কারণ যেহেতু এই ক্ষতিপূরণে সাময়িক দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। এই সভার যদি এই মত হয় যে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ এককালীন থোক টাকার পরিবর্তে তার জীবনকাল পর্যন্ত সাময়িক ভিত্তিতে অথবা তার পুত্রকন্যারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া স্থির হয় তাহলে নিঃসন্দেহে ইংল্যান্ডের পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু হয়ে যাবে।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : অধ্যক্ষের আসন থেকে নয় এই সভা চায় যে আপনারা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

এই সভা আরও চায় যে পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপন করা হক। এমন আপনাদের বিবেচনা।

স্যার কাবাসজি জাহাঙ্গির : এটি সভার কথা নয় স্যার, আমরা তাঁর কথা শুনতে চাই।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : শান্তি, শান্তি।

স্যার কাবাসজি জাহাঙ্গির : স্যার এটি সভার ইচ্ছা নয়। সভার নাম করে আপনিই বলছেন।

আমি সভার মনোভাব যতটা বুঝি, তাতে মনে হয় সবাই তাঁর বক্তব্য শুনতে চান।

ড: পি. এন. ব্যানার্জী : সভায় অনেক মাননীয় সদস্য চান যে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করুন।

স্যার কাবাসজি জাহাঙ্গির : কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুনতে চাই।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : আপনি সভার মতামত দিতে পারেন না।

আবদুল কাইয়ুম : ঠিক কথা।

মাননীয় স্যার সুলতান আহ্‌মেদ : সভার এই অংশের সদস্যরা অন্তত তাঁর কথা শুনতে আগ্রহী।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : তাহলে সমস্যা কোথায়? আমি বার বার বলছি এটি অধ্যক্ষের আসন থেকে নির্দেশ নয়। এটি মাননীয় সদস্যের প্রতি অনুরোধ মাত্র। এটি এখন তাঁর ব্যাপার তিনি এই অনুরোধ রাখবেন কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয় শ্রী এন. এম. যোশি এরপর যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তা হল প্রযুক্তিবিদদের অধ্যাদেশ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। তিনি বলেছেন যে এই অধ্যাদেশে মালিক ও কর্মীদের মধ্যে অসম্যে রয়েছে। যে বিষয়টি সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে তা হল এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী এক কর্মী তার চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়। কিন্তু ঐ একই অধ্যাদেশে বলা হয়েছে একজন মালিক তার কর্মীকে বরখাস্ত করতে পারেন। আমি মহোদয়ের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে অধ্যাদেশটি পড়লে প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে। প্রকৃত অবস্থা হল, একজন কর্মী যদি তার পদে ইস্তফা দিতে চান তাহলে তা তিনি করতে পারেন মালিকের অনুমতি ছাড়াই। তবে অধ্যাদেশে একথা বলা হয়েছে তিনি যদি পদত্যাগ করতে চান তাহলে তাকে ট্রাইব্যুনালের অনুমতি নিতে হবে। এব্যাপারে শ্রী যোশি সম্ভবত ভুল তথ্য পেয়েছেন। এরপর মালিকের তার কর্মীকে বরখাস্ত করার প্রশ্নে বিষয়টি হল এইরূপ। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী তার কোনও কর্মীকে বরখাস্ত করার অধিকার নেই। এব্যাপারে তাকে আদালতের অনুমতি নিতে হবে। তবে এব্যাপারে একটি ব্যতিক্রম আছে। সেই ব্যতিক্রমী বিষয়টি হচ্ছে কোনও কর্মীর অবাধ্যতা বা খারাপ আচরণের জন্য মালিক যদি তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনে। এক্ষেত্রে মালিককে ঐ কর্মীকে বরখাস্ত করতে হলে আর আদালতের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এখন মহোদয় আমি মনে করি এটি বরখাস্তের কোনও উদাহরণ হতে পারে না। কারণ একজন অবাধ্য ও দুর্বিনীত কর্মীকে বরখাস্ত করার সংস্থান থাকা কোনও অন্যায় নয় এবং এটি অভিযোগের কারণ হওয়া ঠিক নয়।

শ্রী এন. এম. যোশি : বিচারক কে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি শ্রী যোশিকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সাধারণ মামলার ক্ষেত্রে যেখানে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয় না সেই সব ক্ষেত্রে কে বিচারক হন? আমাদের দেশে শিল্প যেভাবে গড়ে উঠেছে সেই পরিকাঠমোয় ন্যায় হক আর অন্যায় হক মালিক যদি মনে করে কোনও বিশেষ কর্মীর পরিসেবার আর প্রয়োজন নেই সে ইচ্ছা করলে তাকে বরখাস্ত করতে পারে। অতএব আমি মনে করি বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমি এই সভাকে যা বলতে চাই বিশেষ করে শ্রী যোশিকে তা হল আমরা গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ে অধ্যাদেশের যে সংশোধন করেছি তাতে এই ধরনের সমস্যা নেই। প্রথম বিষয়টি যা আমি শ্রী যোশির অবগতির জন্য জানাচ্ছি তাহল আমরা একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছি। ঐ কমিটি আদালতের সঙ্গে সংযোগ রাখবে। এই উপদেষ্টা কমিটিতে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব থাকছেন। আমার এব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে এই উপদেষ্টা কমিটি যদি মনে করে যে শ্রমিকদের স্বার্থ বিঘ্নিত করছে তাহলে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তাহল আমরা সালিসি কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতি নির্দেশ জারি করেছি যে তিনি কি কারণে কোনও শ্রমিককে বরখাস্ত না করার জন্য যুক্তি দেখিছেন তা যেন নথিভুক্ত করা হয়। এই

বিষয়টি আমরা ফৌজদারি দণ্ডবিধি থেকে নিয়েছি। এতে সুবিধা হচ্ছে যে সালিসির চেয়ারম্যান শ্রমিককে বরখাস্ত না করার জন্য যে যুক্তি দেখাচ্ছেন তা আইনসিদ্ধ এবং সঙ্গত কিনা তা কেন্দ্রের পক্ষে জানা সম্ভব হবে।

মহোদয় শ্রী যোশি এরপর বলেছেন যে দেশে কয়লা খনিগুলির অবস্থা ভাল নয়। আমি এমন দাবি করি না। পরিস্থিতি আদর্শ। কিন্তু আমি জানাচ্ছি যে কয়লা খনিগুলির পরিস্থিতি উন্নয়নে শ্রম দফতর বেশ কিছু ও সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমাদের কয়লা খনিতে এখন দুই ধরনের শ্রমিক কাজ করে। স্থানীয় শ্রমিক এবং বহিরাগত, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলা থেকে আসা শ্রমিক। আমি সভাকে তাদের মজুরি সম্পর্কে কিছু তথ্য দিচ্ছি। গোরখপুরের শ্রমিকদের দৈনিক ১২ আনা মজুরি দেওয়া হয়। এই মজুরি হল তাদের মূল বেতন। এরপর তারা পায় দৈনিক চার আনা করে উৎপাদন বোনাস হিসেবে এবং চারআনা পায় খনির গহ্বরে কাজ করার জন্য। এছাড়া তাদের রোজ বিনামূল্যে খাবারও দেওয়া হয়। এই খাবারের খরচ মাথা পিছু দৈনিক ১৪ আনা করে।

শ্রীমতী রেণুকা রায় (মাননীয় সদস্যা) : মহোদয় এটি বিধিভঙ্গের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে, মাননীয়, সদস্যের ইতিমধ্যেই ২৫ মিনিট ধরে বলা হয়েছে।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : দায়িত্ব প্রাপ্ত মাননীয় সদস্যকে ২০ মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যেতে পারে।

শ্রী এন. এম. যোশি : নিয়ম হচ্ছে, কুড়ি মিনিট।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : না, কুড়ি মিনিট, যদি প্রয়োজন হয় তবে বেশি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয় আমি আগেই জনিয়েছি যে গোরখপুরের শ্রমিকরা দৈনিক খাওয়া খরচ বাবদ শুধু যে ১৪ আনা করে পায় তাই নয় তারা এর অতিরিক্ত বিনামূল্যে বাসস্থান এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার খরচ পায়। কয়লাখনি অন্য শ্রমিকদের মজুরি এইরূপ—যুদ্ধের আরও যে মজুরি ছিল তার থেকে এখন মজুরি টাকার অঙ্কে ৫০ শতাংশ বেড়েছে, আরও উপরে যে সব শ্রমিক কাজ করত তাদের মজুরি ছিল দৈনিক আট আনা আর খনির ভিতরের শ্রমিকদের ১৪ আনা। এছাড়া তাদের দেওয়া সস্তাদরে জিনিস ক্রয়ের সুবিধা, স্থানীয় শ্রমিকরা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাথা পিছু চার সের করে খাদ্যশস্য এবং বয়স্ক ভরনীয়দের

ক্ষেত্রেও চার সের করে খাদ্যশস্য এবং দুই থেকে ১২ বছর পর্যন্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে দুই সের করে খাদ্যশস্য পায়। এছাড়া একজন শ্রমিক তার মূল রেশনের এক চতুর্থাংশ দানাশস্য ও ডাল পেয়ে থাকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে। এর মূল্য টাকায় ছয় সের করে। এছাড়া প্রতি শ্রমিক তার কাজের দিন দৈনিক এক সের করে চাল বিনামূল্যে পায়। উপরন্তু সে তার প্রতি কাজের দিনে দু আনা করে নগদ পায়। এটি প্রযোজ্য যার কোনও ভরনীয় নেই, আর যে শ্রমিকের একজন ভরনীয় আছে সে পায় তিন আনা করে আর যার একাধিক ভরনীয় আছে সে পায় দৈনিক পাঁচ আনা করে।

মহোদয়, বিধিভঙ্গের বিষয়ে আমি যতদূর জানি একজন সরকারের সদস্যকে কুড়ি মিনিটের বেশি সময় দেওয়া যেতে পারে যা আপনি উল্লেখ করেছেন। তবে সেই সদস্য হবেন বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত। এটি সরকারের অন্য কোনও সদস্যের জন্য নয়। যে তিনি যতখুশি সময় ধরে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সরকারি সদস্য হলেন অর্থ দফতরের। তিনি সভায় বলবেন, যে প্রস্তাব সভায় রয়েছে। এ বিষয়টি কিন্তু শ্রম দফতরের সদস্যের এক্তিয়ারে পড়ে না।

শ্রী স্বামী ভেঙ্কটচেল্লাম চেট্টিয়ার : (মাদ্রাজ : ভারতীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত) আমি মনে করি প্রস্তাবটি এখন উঠুক।

অন্য কয়েকজন মাননীয় সদস্য : প্রস্তাবটি এখন উত্থাপিত হক।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, আমাকে এইভাবে বাধা দেওয়া ঠিক নয়।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : বসুন বসুন। এই বক্তৃতা হওয়ার পরেই একমাত্র পরবর্তী প্রস্তাব উঠতে পারে। পরবর্তী প্রস্তাব উত্থাপনের বিষয়ে নিয়ে বিরোধীদের আমি আর কিভাবে সাহায্য করতে পারি? আমার সামনে অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই।

শ্রী আবদুল কাইয়ুম : মহোদয়, বিধিভঙ্গের বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় একজন সরকারি সদস্য কুড়ি মিনিট বা তার বেশি বলতে পারেন। এটি ঠিক, কিন্তু কোনও সরকারি সদস্য তার নিজের খুশিমত তার বক্তৃতা দীর্ঘ করবেন এটি কি বলতে দেওয়া যাবে? না মাননীয় অধ্যক্ষ স্থির করবেন যে তার যথেষ্ট সময় ধরে বলা হয়েছে? আমি মনে করি বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অধ্যক্ষের এক্তিয়ারে এবং সরকারি সদস্য হলেও তাকে খুশিমত দীর্ঘ বক্তব্য করতে দেওয়া যায় না। আমি মনে করি যে তিনি দীর্ঘ সময় ধরে বলেছেন।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : এটি আমার পক্ষে বলা খুবই শক্ত যে তিনি ইচ্ছাকরে বেশি সময় ধরে বলেছেন বা এখনও বলে চলেছেন।

কয়েকজন মাননীয় সদস্য : প্রশ্নটি এখন তোলা হক।

স্বামী ভেঙ্কটচেল্লাম চেট্টিয়ার : আমি একটি বিধিভঙ্গের কথা বলছি। অধ্যক্ষের নিশ্চয়ই ধারণা হয়েছে যে আমি এখন বন্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি না। কিন্তু আমি মনে করি যেহেতু মাননীয় সদস্য তার আসন গ্রহণ করেছেন তাই আমি এখন বন্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ দত্ত : প্রচলিত প্রথা এই যে কোনও সদস্য বলতে থাকলে সেই অবস্থায় বন্ধ প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। কিন্তু এখন বিষয়টি হচ্ছে এই যে মাননীয় সদস্য আসন গ্রহণ করেছেন তার ভাষণ শেষ করে নয়, তাকে বক্তৃতা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে এই জন্য।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, শ্রী যোশি বলছেন শ্রম দফতরে কর্মীসংখ্যা কম। আমি অবাক হচ্ছি যে যোশি কিভাবে একথা বললেন। আমি সভাকে জানাতে চাই যে শ্রম দফতর সম্প্রতি তার বিভাগে কিছু কর্মী নিয়োগ করেছে। কয়লাখনি সম্পর্কে বলতে গেলে আমাদের কয়লাখনি কল্যাণ কমিটির জন্য মুখ্য কার্যনির্বাহী অধিকারিক রয়েছেন। তার অধীনে আছেন আরও একজন মুখ্য জনকল্যাণ আধিকারিক। আর অধীনে আছেন দুইজন পরিদর্শক, এদের একজন আবার মহিলা পরিদর্শক। এছাড়া আমাদের আছেন অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহের জন্য একজন অধিকর্ত্তা তার অধীনে আছেন বিভিন্ন উপঅধিকর্ত্তা এবং চারজন সহকারি অধিকর্ত্তা।

(এই সময় বিরোধী আসন থেকে তুমুল হৈ-চৈ এবং টেবিল চাপড়ানোর শব্দ শোনা গেল।)

শ্রী আবদুল কাইয়ুম : আপনার দাবি সম্পূর্ণ ছুঁড়ে ফেলা হবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : খনির প্রধান পরিদর্শকের অধীন ২০ জন অফিসার আছেন। এছাড়া এখন কেন্দ্রে আমরা একজন মুখ্য শ্রম কমিশনার নিয়োগ করেছি। তার অধীনে আছেন বেশ কয়েকজন উপ শ্রম কমিশনার। তারা শ্রমিকদের কল্যাণ মূলক কাজকর্মের দায়িত্বে। মহোদয়, এরপর শ্রী যোশি বলেছেন যে শ্রম দফতরের কাজকর্ম সর্বদা সময়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকে যেন বিলম্বটাই নিয়ম। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, আমরা যে পরিস্থিতিতে আমরা শ্রম-দফতরের কাজ

চালাচ্ছি তাতে এই বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। সমস্যার ব্যাপারে আমাদের প্রাদেশিক সরকার সমূহ, শ্রমিক সংগঠন এবং শ্রমিক কর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এরজন্য সময় নষ্ট হয়। সুতরাং শ্রী যোশি বিলম্বের যে অভিযোগ করেছেন তা কিন্তু ঘটে না।

শ্রী এম. এন. যোশি : মাননীয় সহ-সভাপতি, আমি একটি বিষয়ে অধিকারভঙ্গের প্রস্তাব করছি। এটাই কি আপনার রায় যে একজন সরকারি সদস্য যত সময় খুশি বলবেন? আমি এব্যাপারে অধ্যক্ষের আসন থেকে একটি সুনির্দিষ্ট রায় দাবি করছি।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : মাননীয় সদস্য তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন।

শ্রী এন. এম. যোশি : মহোদয়, আমি সভার সময় বাঁচানোর জন্য বলছি, কোনও প্রকার ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন ছাড়াই আমি এখন সভা ত্যাগ করতে চাই।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি একটি কথা বলতে চাই যে, আমার মাননীয় বন্ধু যদি আমাকে পূর্বেই শোনাতেন তিনি ছাঁটাই প্রস্তাব আনছেন না, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি আমার বক্তৃতা হয়তো এতটা দীর্ঘ করতাম না।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত : শ্রী যোশি যে তার ছাঁটাই প্রস্তাব তুলে নিচ্ছেন, সে ব্যাপারে তিনি আগাম জানাতে বাধ্য নন।

প্রস্তাবটি তাহলে অনুপস্থিতির জন্য তুলে নেওয়া হল।

□ □ □

৪৩

*খনিগর্ভে মহিলাদের নিয়োগ সম্পর্কে অবিলম্বে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রয়োজন

শ্রীমতী রেণুকা রায় : মহোদয়, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

'শ্রম দফতেরর অধীনস্থ এই খাতে দাবি একশ টাকা হ্রাস করা যেতে পারে।'

মহোদয়, ১৯৪৩ সালে আগস্ট থেকে ডিসেম্বর এই সময়ের মধ্যে খনিগর্ভে মহিলাদের কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রথম তুলে নেওয়া হয়। তখন থেকেই সারা দেশে এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে অনবরত প্রতিবাদ সোচ্চার হতে থাকে। ভারত সরকার খুব ভাল করেই অবগত আছেন যে তারা যে শুধু এক আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার অমান্য করেছেন তাই নয়, বরং তারা বিশ্ব জনমতের প্রতি চরম অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন।

এক বছর পূর্বে সারা ভারত মহিলা সম্মেলনের অনুরোধে আমি একটি এবিষয়ে মূলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলাম যে ঐ নিষেধাজ্ঞা অবিলম্বের পুনরায় জারি করা হক। আমার মাননীয় বন্ধু শ্রীমতী সুব্বারায়ন একটি ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বাজেট অধিবেশন এই শ্রম সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি তোলা হয়। ঐ সময় মাননীয় শ্রম সদস্য জানান যে বিষয়টি অত্যন্ত সাময়িক ব্যাপার এবং এটি শুধু ফসলের মরশুম পর্যন্ত চালু থাকবে। শ্রমিক সংকট এড়ানোর জন্য এই ব্যবস্থা কোনওমতেই যুদ্ধচলাকালীন সময় পর্যন্ত বলবৎ থাকবে না। ঐ সময়ের পরে নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করা হবে। মহোদয়, এই সময়ের মধ্যে আমরা এব্যাপারে কিছুই করিনি। ইতিমধ্যে বৎসর অতিক্রান্ত এবং আমি মনে করি ইতিমধ্যেই এব্যাপারে মানুষ অনেক সোচ্চার। মাননীয় শ্রম সদস্য শুধু এইটুকু বলেছেন যে তিনি ঐ নিষেধাজ্ঞা পুনরায় জারি করতে ইচ্ছুক নন। এই সভায় মাননীয় সদস্যগণ বিষয়টি

সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। আমি নিশ্চিত যে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে তা যদি কোনও স্বেচ্ছাচারি ধনী মালিকপক্ষের হত তাহলে না হয় বিষয়ট বোঝা যেত। (এই সময় সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম পুনরায় আসন গ্রহণ করেন) কিন্তু কিভাবে তা অনুমোদিত হল এবং সাধারণ মানুষের কল্যাণ এবং নিরাপত্তার দায় যাদের উপর ন্যস্ত তারা কিভাবে এটিকে সমর্থন করলেন তাই আমাদের চিন্তার বিষয়, মহোদয়, আমি এই সভায় সব সদস্যের এই সভাকক্ষে দুদিকেই যারা বসে আছেন এবং সব রাজনৈতিক দলের এমন কি সরকার পক্ষের সমর্থন চাই। কারণ এটি একটি ন্যায়সঙ্গত দাবি এবং এটি মানুষের শুভ চিন্তভাবনার একটি ফলশ্রুতি যে মহিলাদের এভাবে খনির অভ্যন্তরে অমানবিক কাজে নিয়োগ করা উচিত নয়। মহোদয়, আমি প্রস্তাবটি উত্থাপন করলাম।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হল।

"শ্রম দফতরের অধীনস্থ এই খাতে দাবি একশ টাকা হ্রাস করা যেতে পারে।"

কয়েকজন মাননীয় সদস্য : প্রশ্নটি এখন তোলা হক।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এই ছাঁটাই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য যে পর্যপ্ত সময় প্রয়োজন তা আমার হাতে নেই। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে আগের বার বিষয়টি নিয়ে একটি মূলতুবি প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হয়েছিল। আমি আমার বিবৃতিতে একথাও বলেছিলাম যে এব্যাপারে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত আমি অত্যন্ত অখুশি। আমি এখনও এব্যাপারে অখুশি। কিন্তু পরিস্থিতি এমন যে এখন আর নতুন করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সভা যদি এব্যাপারে কিছু বলার জন্য আমাকে অনুমতি দেয়..........

কয়েকজন মাননীয় সদস্য : না, না,।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কি জন্য আমরা এইকাজ করতে বাধ্য হয়েছিলাম তার প্রয়োজনীয় অংশই আমি এখন বলছি। কয়লা উত্তোলনের পরিস্থিতি ঐ সময় কোন অবস্থায় আমি সভাকে সে কথা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। ১৯৪১ সালে মোট ২,৯৩,৮১,০০০ কোটি টন কয়লা উত্তোলন করা হয়। ১৯৪২ তা নেমে যায় ২,৯২,৭০,০০০ টনে। এবং ১৯৪৩ সালে আমরা এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কারণ ঐ বছর মোট কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ নেমে গিয়ে দাঁড়ায় ২,৩৭,৫৩,০০০ টন। এই সভার সদস্যরা নিশ্চয়-ই বুঝতে পারছেন যে মাত্র এ বছরের মধ্যেই কয়লার উৎপাদন কমে যায় ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার টন।

একথা বলার কোনও প্রয়োজন নেই যে কয়লা আমাদের শিল্প এবং যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্ভব ছিল না এবং এই প্রকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঁচা মালের উৎপাদান অস্বাভাবিক পড়ে যাওয়ায় সরকারের পক্ষে কোনও অংশতেই নিশ্চেষ্ট থাকা সম্ভব ছিল না।

এই সময়ের মধ্যে নতুন কটি কয়লা খনিতে কাজ শুরু করা হয় সেকথা এখন আমি সভাকে জানাচ্ছি। ১৯৪১ সালে মোট চারশো চল্লিশটি কয়লা খনিতে কাজ হত। ১৯৪২ সালে তা বেড়ে ৬৭০এ এবং ১৯৪৩ সালে ঐ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭০৬এ। সাধারণ পরিস্থিতিতে কয়লাখনির সংখ্যার এমন বৃদ্ধিতে আমাদের কয়লা উৎপাদন অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৩ সালে প্রকৃত অবস্থা কি দেখা গেল? একদিকে আমাদের কয়লা খনির সংখ্যা এই সময়ে বাড়লো ৩৬৬টি কিন্তু কয়লার উৎপাদন হ্রাস পেল ৬৬ লক্ষ ২৯ হাজার টন।

এখন আসুন শ্রমিক পরিস্থিতি কি দেখা যাক। ১৯৪১ সালে কয়লাখনিতে নিযুক্ত মোট শ্রমিক সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ১১ হাজার ৬০১ জন, ৪১ সালে তা হয় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৭৪২ জন এবং ৪৩ সালে সংখ্যা আরও কমে দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৫ হাজার ৮২২তে। দেখা যাচ্ছে খনির সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও আশ্চর্যজনকভাবে শ্রমিকের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। একদিকে খনির সংখ্যা বাড়ছে আর অন্যদিকে শ্রমিক সংখ্যা বাড়ার পরিবর্তে কমছে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক হ্রাসের সংখ্যা ছিল ৪ হাজার ৮৭৯ জন। কিন্তু ঘটনার এখানেই শেষ নয়। প্রকৃতপক্ষে অনেকেই ব্যাপারটি বুঝতে পারেন নি যে আসলে ব্যাপারটি কি। খনিতে কয়লাকাটা শ্রমিকের সংখ্যা যদি সভাকে জানানো হয়, তাহলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ঐ সংখ্যা হল ৪১ সালে ৫৫ হাজার ৬৯১, ৪২ সালে তা নেমে যায় ৫১ হাজার ৪৩৮৫ এবং ৪৩ সালে তা আরও নেমে দাঁড়ায় ৪৫ হাজার ৩০৬এ। মোট ১০ হাজার ৩৮৫ জন কম। কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে খনিতে কয়লা কাটা শ্রমিকদের ভূমিকা যে কত বেশি তা এই সভাকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হবে না নিশ্চয়ই। কয়লা কাটা শ্রমিকের সংখ্যা যদি বেশি না হয় তাহলে খনির কাজে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করার কোনও অর্থ হয় না। কয়লা ছাঁটাই প্রথম কাজ। এটিই বড় সমস্যা। আর সেই কয়লা কাটা শ্রমিকের সংখ্যাই হ্রাস পেল ১০ হাজার ৩৮৫ জন।

কেন কয়লা কাটা শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পেল তা নিশ্চয়ই সভার সদস্যদের জানা। যেসব এলাকায় কয়লা খনি রয়েছে সেইসব এলাকায় বহু শিল্প গড়ে উঠেছে। এছাড়া প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ আছে। এসব ক্ষেত্রে

শ্রমিকদের মজুরি কয়লা খনির চেয়ে বেশ বেশি। বিকল্প এইসব ক্ষেত্রে অন্য সুবিধাও আছে যেমন এসব কাজ ভূমির উপর এবং এইসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করা অনেক কম ঝুকির ও বেশি আকর্ষণের। তৃতীয় যে কারণে কয়লা কাটা শ্রমিকরা কয়লা খনির অভ্যন্তরে কাজের পরিবর্তে অন্যত্র কাজ নিল তাহল কয়লা কাটা শ্রমিকরা খনির অভ্যন্তরে তাদের স্ত্রীদের নিতে পারতো এবং এতে তাদের আয় বেশী হত। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা জারি হবার পর শ্রমিকরা আর তাদের স্ত্রীদের খনির ভিতরে কাজ করার জন্য নিতে পারতো না। সম্ভবত এই কারণেই সবথেকে বেশি শ্রমিক খনির কাজ ছেড়ে তার সাধ্যমত বিকল্প কাজ খুঁজে নেয়।

এখন আমার মনে হয় কয়লা কাটা শ্রমিকদের তাদের পুরানো কাজে ফিরিয়ে আনার একমাত্র রাস্তা ছিল তাদের স্ত্রীদের আবার খনির মধ্যে কাজের অনুমতি দেওয়া কারণ এতে তাদের মজুরি বাড়ে, আমার মতে এছাড়া অন্যকোনও উপায় ছিল না। আমাদের বলা হয়েছে মজুরি বাড়িয়ে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করতে এবং এতে আরও বেশি শ্রমিক কাজ করবে। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এক্ষেত্রে যুক্তি অবশ্যই দেখানো যেতে পারে এবং তা একটা সীমা পর্যন্ত। কিন্তু যদি এর পরও কিছু করা হয় তাহলে তার উল্টো ফল হতে পারে। আমার বন্ধু শ্রী যোশী গতকাল বলেছেন ইংলন্ডে কয়লা খনি শ্রমিকদের প্রচুর বেতন দেওয়া হয় এবং শুধু তাই নয় কয়লা শিল্পেই সে দেশে শ্রমিকদের বেতন সবথেকে বেশি। এর নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ নেই। কিন্ত যোশি ভুলে গেছেন যে ইংল্যান্ড কয়লা খনি শ্রমিকদের এত ভাল মজুরি দেওয়া সত্ত্বেও সেখানেও কয়লা খনির জন্য যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায় না। মহোদয়, অতএব দেখা যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধিই একমাত্র শ্রমিক সমস্যার সমাধান নয়। আমাদের মতে এটিই হল একমাত্র সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এর দ্বারাই আমরা একটি সাংঘাতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পেরেছি।

ভারত সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আরও একটি যুক্তি খাড়া করা হয়েছে। অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আমাকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটি আমাকে খুব ভাবায়। ইংল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশে কয়লার অভাব আছে কিন্তু ঐসব দেশে মহিলা শ্রমিকদের খনির অভ্যন্তরে কাজের অনুমতি দেওয়া হয় না। তারা সমস্যাটির সমাধান অন্যভাবে করে। কতৃপক্ষ ঐ সব শ্রমিকদের খনির অভ্যন্তরে কাজ করতে বাধ্য করে থাকে। বেলজিয়ামে সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে জানা গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর জন্য যে সব কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাদের সেখানে না পাঠিয়ে বেলজিয়াম সরকার কয়লা খনিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন। এই সভার সদস্যগণ খুব ভালভাবেই জানেন যে আমাদের হাতে সে ক্ষমতা নেই এবং আমরা এইভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারি না।

এখন মহোদয়, আমি এই প্রশ্নের উত্তরে আরও বলতে চাই তা হল গ্রেট ব্রিটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অন্যান্য দেশে মহিলা শ্রমিকদের খনির অভ্যন্তরে কাজ করানোর রীতি নেই। ঐসব দেশে মহিলারা এক সময় খনিগহ্বরে কাজ করত কিন্তু তা ৬০ থেকে ৭০ বছর আগের কথা। আমি এক্ষেত্রে এই সভার কাছে একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের দেশেও কি ১৯৩৭ সালের পূর্বে মহিলা শ্রমিকরা খনিগহ্বরে কাজ করেছে? এর অন্তত আট বছর পূর্বে কি তারা খনিতে কাজ শুরু করে নি? কিন্তু খনিগহ্বরে নয়, উপরিভাগে ইংলন্ডের মানুষ যেমন বলে থাকেন তাদের মহিলা শ্রমিকরা খনিগর্ভে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে কাজ করে না, তেমন কথা কি কেউ এদেশে বলতে পারবে যে এটি শতাব্দীর প্রথা ভাঙ্গা হচ্ছে? মাননীয় সদস্যা যিনি এই ছাঁটাই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমার মনে হয় তিনি ভুলে গেছেন ১৯৩৪ সালে সারাভারত মহিলা সম্মেলনে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়েছিল। আমি সভাকে তার ব্যাখ্যা করে বলতে চাই। ভারত সরকার বিশেষ করে ১৯২৯ সাল থেকে খনিগহ্বরে মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধ করার জন্য বেশ কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এই সভার নিশ্চয়ই স্মরণে অছে যে সরকারের লক্ষ্য ছিল আনুপাতিক হারে আস্তে আস্তে এই সংখ্যা কমানো যাতে ১৯৩৭ সালের মধ্যে খনি অভ্যন্তরে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার বহু পূর্বেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এখন প্রশ্ন সারা ভারত মহিলা সম্মেলন এব্যাপারে কি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল? আমি জানি ১৯৩৪ সালে যে সারাভারত মহিলা সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয় সেই ২৬শে ডিসেম্বর বিষয়টি বিবেচনার জন্য আলোচনা হয়ে ছিল। ঐ সম্মেলনের যে প্রতিবেদন আমার কাছে আছে তাতে কি দেখা যায়? (এই সময় শ্রীমতী রেনুকা রায় তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেন) দয়া করে আমাকে বলতে দিন। বিষয়টি বিবেচনার জন্য ঐ মহিলা সম্মেলনে একটি কমিটি গঠিত হয়। আমি শুধু মাত্র তার দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য পাঠ করছি এবং এতে ভারত সরকারের ঐ পদক্ষেপ সম্পর্কে মহিলা সম্মেলন কি মনোভাব নিয়ে ছিল তা জানা যাবে। মহোদয়, আমি ঐ প্রতিবেদনের ৫৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পড়ছি। (আমি এখানে বলে রাখি যে মহিলা এই ছাঁটাই প্রস্তাব এনেছেন তিনি সারাভারত মহিলা সম্মেলনের গঠিত কমিটিতে একজন সদস্য ছিলেন।) এখন আমি পড়ছি—কমিটি একথা বলে সিদ্ধান্তে আসেন যে, "এই সব মহিলা শ্রমিকদের যদি বর্তমান অবস্থায় খনিগহ্বরে কাজ করা থেকে বসিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খনি শ্রমিকদের বাড়ির এমনই দুর্দশা হবে যে তা খনি গহ্বরে তাদের কাজ করা থেকে বিরত করলে যে পরিস্থিতি হবে এর

ফল তার থেকেও খারাপ হবে।" এই সময় শ্রীমতী রেনুকা রায় আবার বাধা দিতে থাকেন, সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) মাননীয় সদস্য তো অন্যায় কিছু বলেন নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয় একথা সত্য যে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত মহিলা সম্মেলনে যখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় তখন এই সিদ্ধান্ত হয় যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অনুমোদিত বিষয়কে সমর্থন করা হবে। ভারত সরকারের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা বিষয়টি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নেন। এখন মহোদয় আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে ১৯৩৫ সালে সারা ভারত মহিলা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ১৯৩৪ সালে তাদের মতামতের থেকে পুরো আলাদা এবং এর কারণ হল আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এবং আমি নিশ্চিত যে ১৯৩৫ সালে বিষয়টি যদি অনুমোদিত না হত সেক্ষেত্রে সারাভারত মহিলা সম্মেলন কয়লা খনি গহ্বরে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চালিয়ে যেতেন। আমি একথা বলতে চাই নে যে সারাভারত মহিলা সম্মেলনের এই মনোভাব পরিবর্তনের মধ্যে কোনও অভিসন্ধি আছে তবে আমি একথা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নই যে মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনায় এমন কোনও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন হয়নি যে তারা এইকাজ সহ্য করবে না যা জরুরি অবস্থা হলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যাবে।

মহোদয়, আমাকে অবশ্য বলা হয়েছে যে কয়লাখনিতে এখন মাত্র ১৫ হাজার মহিলা শ্রমিক কাজ করেন এবং তারা বেশি কয়লা উৎপাদন করতে পারছে না। তাহলে কেন ভারত সরকার এই ১৫ হাজার মহিলা শ্রমিককে খনিগহ্বরে কাজ করার জন্য জোর করছেন?

এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ। প্রথমত............

স্বামী ভেঙ্কটচেল্লাম চেট্টিয়ার : আমি কি মাননীয় শ্রম সদস্যকে একথা জিজ্ঞেস করতে পারি যে জনমত যাই হক না কেন তিনি কি এমন আশ্বাস দিতে পারেন তিনি মহিলা শ্রমিকদের তাদের কাজে বহাল রাখতে পারবেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধুর যদি আমার সম্পর্কে এমন কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে তাহলে আমি অপারগ, তিনি আমার সম্পর্কে যা খুশি মতামত ব্যক্ত করতে পারেন এবং আমারও তার সম্পর্কে যা খুশি ভাববার অধিকার আছে। আমার মনে হয় এই সভায় দাঁড়িয়ে এই ধরনের বিতর্ক চালানো অনুচিত।

এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন আমরা মহিলা শ্রমিকদের খনিগহ্বরে রাখছি? এর তিনটি কারণ আছে, প্রথমত আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিতে মহিলা শ্রমিকদের আলাদা করে ভাবা হচ্ছে না। তাদের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা আছে। যদি তারা.........

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : মাননীয় সদস্যের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি কুড়ি মিনিটের বেশি বলি নি। মহিলা শ্রমিকরা যদি খনি ছেড়ে যায় তাহলে প্রথম ধাক্কা হবে এই যে তাদের সঙ্গে তাদের বাড়ির পুরুষ শ্রমিকরাও খনি ছেড়ে চলে যাবে এবং পরিস্থিতি খুবই খারাপ দিকে যাবে। দ্বিতীয়ত একজন মহিলা শ্রমিক যদি কাজ না করে সেই সঙ্গে আরও অনেকে কাজ বন্ধ করবে। তৃতীয়ত, কয়লা কাটা শ্রমিকের সংখ্যা আরও কমবে কারণ কিছু শ্রমিককে কয়লা বাহক হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। বর্তমান মহিলা শ্রমিকরা ঐ কাজ করে। মোট কথা মহিলা শ্রমিকরা কয়লা উৎপাদনে অক্ষম বলে যে যুক্তি দেখানো হচ্ছে তা ঠিক নয় এবং আমি এ ব্যাপারে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় সদস্য : মাননীয় সদস্যের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আগেই বলেছি প্রয়োজনের থেকে এক মিনিট বেশি সময়ও আমরা মহিলা শ্রমিকদের খনি গহ্বরে রাখতে চাই না। সভায় সদস্যরা অবগত আছেন যে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আমরা কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা গোরক্ষপুর থেকে শ্রমিক আনিয়েছি। আমরা অনেক যন্ত্রপাতিও এনেছি এবং আমরা আরও অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

(ঘড়িতে এখন পাঁচটা বাজে)

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : এখন প্রশ্ন হচ্ছে, "শ্রম দফতর খাতে দাবি একশ টাকা হ্রাস করা হক।"

প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হল।

□ □ □

৪৪

শ্রম-দফতর : অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরির দাবি

মাননীয় স্যার জেরেমি রেইজম্যান : মহোদয়, আমি শুরু করছি :

"শ্রম দফতরের ব্যয় বরাদ্দ বাবদ ১৯৪৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়ের জন্য দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বড়লাট পরিষদকে মঞ্জুর করা যেতে পারে। বেতন বাবদ খরচের জন্য ঐ অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে।"

সভাপতি (সৈয়দ গুলাম ভিক নৈরাঙ্গ) : প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রম সদস্য) আমার বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গ সম্ভবত জানেন। যে গত বছর ভারত সরকার কয়লার উপর একটি সেস ধার্য করে এবং ঐ সেসকে বলা হয় 'কয়লা খনি কল্যাণ সেস'। প্রতি টন কয়লা পিছু সেস ধার্য হয় চার আনা করে। এই কয়লা খনি কল্যাণ তহবিল দেখা শুনা করবার জন্য খনি কল্যাণ অফিসার নিয়োগ করা হয়। এই তহবিল একটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হয়, এই কমিটিতে ছিলেন মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমসংখ্যক প্রতিনিধি এবং বিহার ও বাংলার প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিগণ। শ্রম সচিব ঐ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে বৈঠকে সভাপতিত্ব করতেন। এই কমিটি মোটামুটি একটি স্ব-শাসিত সংস্থা। এর একটি নিজস্ব বাজেট আছে এবং কয়লা খনি সংক্রান্ত কমিশনার ঐ বাজেট তৈরি করেন। এই বাজেট কমিটির কাছে পেশ করা হয় এবং কয়লা খনি কল্যাণ কমিশনার এই ব্যয় নির্বাহের কার্যনির্বাহ কর্তৃপক্ষ। খনি শ্রমিক কল্যাণ সংক্রান্ত সব প্রশ্ন যেমন, ম্যালেরিয়া, জল সরবরাহ, ওষুধ এবং কয়লা খনি কল্যাণ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় এই কমিটির আওতাধীন।

পন্ডিত লক্ষীকান্ত মৈত্র : এই কমিটিকে আপনারা কি কোনও প্রকার নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

কারণ শ্রম দফতরের সচিব ঐ কমিটির চেয়ারম্যান, ঐ বাজেট বিবেচনার জন্য আমাদের কাছে পাঠানো হয়, কোনও সংশয় থাকলে কমিটির কাছে তা সংশোধনের জন্য ফেরত পাঠানো হয় এবং পরে তা পাশ করা হয়।

শ্রম কমিশনার সম্পর্কে বলতে গেলে আমার বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গর জানা আছে যে প্রাদেশিক সরকার গুলিরও শ্রম কমিশনার রয়েছেন। তাদের অধীনে অছেন শ্রমিক কল্যাণ দেখাশুনার জন্য সমন্বয়কারী এবং অন্যান্য অফিসার আছেন। ভারত সরকারের এটি মনে হয়েছে যেহেতু এই সরকারের অধীন কয়েকটি সংস্থা রয়েছে এবং যার জন্য সরকার দায়বদ্ধ প্রাদেশিক সরকারগুলির মতো শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে দেখাশুনার জন্য অনুরূপ সংস্থা থাকুক এবং একথা মাথায় রেখে সম্প্রতি আমরা এই সংস্থা গঠন করেছি। এই সংস্থার সবার শীর্ষে আছেন ভারত সরকারের মুখ্য শ্রম কমিশনার। ভারতের অন্য এলাকাগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি এলাকায় রয়েছেন একজন করে উপ শ্রম কমিশনার। আমার মনে হয় অধ্যাপক রঙ্গ একথা মনে করতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থা সমূহের কাজকর্মকে রেলওয়ের সমন্বয়কারি অফিসার এবং রেল শ্রমিক সুপারভাইজার কাজকে মিশিয়ে দিতে আমরা এই নতুন সংস্থার সুযোগ গ্রহণ করেছি। এইসব সংস্থাকে এখন একত্রিত করে কেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়েছে। যে সব শ্রম কল্যাণ অফিসার বিভিন্ন এলাকায় আলাদাভাবে কাজ করতেন তারা এখন সরাসরি ভারত সরকারের কাছে রিপোর্ট করছেন এবং তারা এখন থেকে বিভিন্ন দফতরের শ্রম কমিশনারের অধীন কাজ করবেন। অনুরূপভাবে রেলওয়ে পরিদর্শকগণ যারা রেলওয়ে সমন্বয়কারি অফিসারের অধীন আলাদাভাবে কাজ করতেন এবং যারা মজুরি সংক্রান্ত আইন এবং কাজের সময় তদারকি করতেন এখন তারাও এই নতুন প্রকল্পের অধীন এসেছেন এবং আমরা সবগুলি সমন্বয় করে একটি প্রকল্প তৈরি করেছি।

শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি সম্পর্কে বলতে হয় গত বছর অথবা তারও আগে ১৯৪৩ সালে ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন একটি প্রস্তাব পাশ করেছিল যে ভারত সরকারের বিভারিজ (Beveridge) প্রতিবেদন অনুযায়ী শ্রমিক সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। তখন একথা মনে করা হয়েছিল যে এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে একটি তথ্য অনুসন্ধান কমিটি গঠন করতে হবে। ঐ কমিটি বাসগৃহ, মজুরি, স্বাস্থ্য এবং শ্রম কল্যাণের অন্যান্য বিবিধ বিষয় সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবে। এই কমিটি তাই তথ্য অনুসন্ধানের পরে ঐ তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভারত সরকার আর একটি কমিটি গঠন করবেন। ঐ কমিটি শ্রম নিরাপত্তা সংক্রান্ত পরিকল্পনা তৈরি করবে। তথ্যানুসন্ধান কমিটি গত ছয়/সাত মাস

ধরে কাজ করছে এবং ঐ কমিটির প্রতিবেদন আগামী জুন/জুলাই মাস নাগাদ পেশ হবে বলে জানা গেছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর অনুসন্ধানের দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং সব তথ্য ত্রিপাক্ষিক সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐ কমিটির কাছে পেশ করা হবে। অনুসন্ধান কমিটির এই দ্বিতীয় কমিটি মালিক, শ্রমিক ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হবে।

অন্যান্য প্রশ্ন যেমন অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ সম্পর্কে পরিস্থিতি এইরূপ। দেখা যাচ্ছে আমাদের যারা শ্রমিকের যোগান দেন সেই কন্ট্রাকটারদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বেশি করে শ্রমিক পাওয়ার আশায় তারা বাজারে চলতি হারের থেকে অনেক বেশি মজুরি দিচ্ছেন। অন্য কন্ট্রাকটাররাও শ্রমিক পাবার আশায় আরও বেশি করে মজুরির লোভ দেখাচ্ছেন। এর ফলে দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও কাজের জন্য শ্রমিকের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যাচ্ছে আর কোনও কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকের অভাব দেখা দিচ্ছে। যেমন সামরিক বাহিনীর কাজ শ্রমিক পাওয়ার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির নাম হল অদক্ষ শ্রমিক সরবরাহ কমিটি। এই কমিটির কাছে কনট্রাকটরকে অনুমতি চেয়ে আবেদন জানাতে হয় যদি সে শ্রমিক অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। একমাত্র কমিটির দেওয়া সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সে অন্যত্র গিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারে। বিভিন্ন স্থানে এই শ্রমিক সংগ্রহ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রে সবার উপরে আছে একজন কনট্রাকটর। সে বিষয়টি পরিচালনা করে। এই বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য এখন আমি আমার বন্ধুকে দিতে পারব না। কিন্তু তিনি যদি এ বিষয়ে যোশি আগ্রহী হন তাহলে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত নোটিশ দিতে পারেন এবং আমি বিষয়টি গ্রহণ করে বিস্তারিত তথ্য জানানোর চেষ্টা করব।

শ্রীমতী কে. রাধা. বাঈ সুব্বারায়ন (মাদুরাই এবং রামনাড় এবং তিন্নেভেলী অ-মুসলমান গ্রামীণ) : মহোদয়, আমি প্রথমেই মাননীয় বন্ধুকে তার দীর্ঘভাষণ এবং অধ্যাপক রঙ্গ এবং তার সহকর্মীদের বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু আমার মনে হয় তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বাদ দিয়ে গেছেন এবং সেটি হল কয়লা কমিশনার খনিগর্ভে মহিলা শ্রমিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারির বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করবেন কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি নিশ্চিত যে এটি তার আওতাভুক্ত নয়।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : আমি জানতে চাই কয়লা কমিশনার অথবা কমিটি খনিতে বর্তমান শ্রমিক পরিস্থিতি বিবেচনায় মহিলা শ্রমিকদের খনিগর্ভে তারা কাজ করার অনুমতি দেবেন কিনা এবং খনিগর্ভে মহিলা মজুরদের কাজ করা তাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এটি তাদের কর্তৃত্বের আওতায় পড়ে না।

শ্রী আবদুল কাইয়ুম : তাহলে তাদের প্রয়োজনীয়তা কি?

শ্রী এন. এম. যোশি : (মনোনীত সদস্য) আমি মনে করি এই কমিটি যখন নিয়োগ করা হয় তখন তাদের কাজ ছিল তথ্য অনুসন্ধান করা এবং কমিটি অবশ্যই সেই কাজ করবে যে মহিলাদের খনিগর্ভে কাজ করা ঠিক হচ্ছে কিনা এবং প্রতিটি প্রশ্নে....

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বুঝতে পারছি শ্রীমতী রাধা বাঈ সুব্বারায়ন কয়লা কমিশনার এবং তার কাজ কর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

শ্রীমতী কে. রাধা বাঈ সুব্বারায়ন : এছাড়া আমার বন্ধু যে কমিটির কথা বলেছেন তা নিয়েও।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ তাঁরা তা করতে পারেন।

শ্রী এম. এন. যোশি : আমারও মত তাই এবং আমি আশা করি কমিটি প্রতিটি প্রশ্নই বিবেচনা করবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি মনে করি তিনি শুধুমাত্র কয়লা কমিশনারের কথা বলছেন।

শ্রী এম. এন. যোশি : নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া সহ সমস্ত ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে আমি মনে করি অর্থ বিষয়ে ভোটাভুটি হওয়া উচিত।

সভাপতি (সৈয়দ গুলাম ভিক নৈরাঙ্গ) : প্রশ্ন হচ্ছে

"এটি একটি অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবি এবং পরিমাণ দু লক্ষ চল্লিশ হাজার অতিক্রম করছে না, ব্যয় নির্বাহের জন্য এই অর্থ শাসক পরিষদকে মঞ্জুর করা হয় এবং পঞ্চম দফতর এই খাতে ১৯৪৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের জন্য এই ব্যয় বরাদ্দের জন্য অনুমোদিত করা হয়।" প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

□ □ □

৪৫

খনিতে মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : সহ-সভাপতি মহোদয়, আমি ভাষণ শুরু করছি :

"খনিতে মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত ১৯৪১ সালের আইনকে সংশোধন করতে চাওয়া হয়েছে। এটি বিবেচেনার জন্য বিষয় নির্বাচনী কমিটির কাছে পাঠানো হচ্ছে। এই কমিটিতে আদেশ শ্রী অনন্তশয়নম, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ, শ্রী কে. বি. জিনারাজ, মওলানা জাফর আলিখান, স্যার সৈয়দ রেজা আলি, শ্রী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এন. এম. যোশি, রাও বাহাদুর এন শিবরাজ, মি: এইচ. জি. খোকস , শ্রী এস. সি. যোশি এবং প্রস্তাবক নিজে। ১৯৪৪ সালের দোসরা এপ্রিল সোমবার এই প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া এই কমিটির সভা গঠন করার জন্য যে সব সদস্যের প্রয়োজন হবে তারাও এই কমিটিতে আছেন এবং এদের সংখ্যা পাঁচজনের বেশি হবে না।"

শ্রী বদ্রিদত্ত পাণ্ডে (রোহিলখন্ড এবং থ্যুমায়ুন বিভাগ অমুসলিম গ্রামীণ) : এই কমিটিতে কোনও মহিলা সদস্য নেই কেন?

শ্রী টি. এস. অবিনাশলিঙ্গম চেট্টিয়ার—(সোলেম-কোয়েম্বাটুর এবং উত্তর আর্কট থেকে নির্বাচিত অমুসলিম সদস্য-গ্রামীণ) : আমি শ্রীমতী সুব্বারায়নকে পরামর্শ দিচ্ছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধু একেবারে শেষ পর্যায়ে একটি সংশোধনী আনতে পারেন এবং আমি বিষয়টি দেখছি। সভার সদস্যগণ অবগত আছেন যে আমাদের ইতিপূর্বেই মহিলা খনি শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত আইন আছে। এই আইন পাশ হয় ১৯৪১ সালে। এই বিলে ঐ আইন সংশোধনের কথা বলা আছে এবং কি কারণে এই সংশোধনী প্রয়োজন তা অত্যন্ত সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

১৯৪১ সালে যখন এই আইন পাশ হয় তখন যে সব মহিলা খনি শ্রমিক খনির উপরিভাগে কাজ করত তাদের মাতৃত্বের সুযোগ-সংক্রান্ত বিষয় এর আওতায় ছিল। তখন খনিগহবরে কাজ করা মহিলা মজুরদের মাতৃত্বের বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হয় নি, কিন্তু এখন হচ্ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি একাধিকবার এই সভায় এর কারণ ব্যাখ্যা করেছি এবং বলেছি খনি গহবরে মহিলা মজুর কাজ করানোর জন্য আমাদের অনুমতি দেওয়া হক। আমি আগেও জানিয়েছি এই ব্যবস্থা সাময়িক এবং আমি আশারাখি যে সরকার শীঘ্রই এর উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন। এখন এই ব্যবস্থা সাময়িক অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে এই কারণেই নয় এই সভার ভিতরে এবং বাইরে সমালোচনা হওয়ার জন্য বর্তমান আইন সংশোধন করে খনির অভ্যন্তরে কর্মরত প্রসূতি মায়েদের জন্য সুযোগ-সুবিধার সংস্থান রাখা জরুরি হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র খনি গহবরের কর্মরত প্রসূতি মায়েদের সুবিধা প্রদানের জন্যই এই আইন সংশোধন প্রয়োজন।

এই বিলে প্রধানত দুটি সংস্থান রয়েছে, আইনে ইতিমধ্যেই সংস্থান রয়েছে যে সন্তানের জন্ম হবার পর ঐ মহিলা শ্রমিক চার সপ্তাহ ছুটি পাবে। আমরা এখন আর একটি সংস্থান যোগ করতে যাচ্ছি এবং তাহল ঐ শ্রমিক সন্তানের জন্মের পূর্বে দশ সপ্তাহ কাজ করবে না। সুতরাং এই বিলের নতুন দিক হল সন্তান জন্মের দশ সপ্তাহ পূর্ব থেকে সে কাজ করবে না। অনুরূপ ভাবে ঐ শ্রমিককে ঐ সময়ে কিছু আর্থিক সুবিধাও দেওয়া হবে, এই সুবিধার মধ্যে থাকছে সন্তান জন্মের দশ সপ্তাহ পূর্ব থেকে এবং সন্তান জন্মের ছয় সপ্তাহ পরে পর্যন্ত সে প্রতিদিন দৈনিক বারো আনা করে পাবে। এইভাবে ছয় মাসের মধ্যে সে ৯০ দিন ধরে এই সুযোগ পাবে। এই বিলে মূলত এই সংস্থানই রয়েছে।

মহোদয়, আমি লক্ষ্য করেছি যে সংশোধনীর জন্য কয়েকটি প্রস্তাব সভায় পেশ করা হয়েছে এবং আমি নিজেও কয়েকটি সংশোধনীর কথা চিন্তা করেছি এবং আমি সরকারের পক্ষে সেগুলি পেশ করতে চাই। কিন্তু সময় হাতে অত্যন্ত কম থাকায় এবং বিষয়টি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ হওয়ায় আমি মনে করি এগুলি যদি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে পাঠানো হয় তাহলে প্রত্যেকের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে, এক্ষেত্রে যে সব সংশোধনীর কথা আমি চিন্তা করেছি এবং যে সব সংশোধনী সভায় পেশ করা হয়েছে তা পারস্পরিক স্বার্থ বজায় রেখে আলোচনার টেবিলে মীমাংসা হতে পারে। এই প্রস্তাব অর্থাৎ বিলটি বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে পাঠানোর প্রস্তাব (এটি অবশ্য আমার মূল ইচ্ছা নয়।) হলে আমি এই বিলের কোনও অংশই কাটছাট করতে চাই না একথা বলে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আলোচনায় যে সব মাননীয় সদস্য অংশ নিয়েছেন তাঁদের বক্তব্যের জবাবে আমার বেশি কিছু বলার নেই বলে মনে করি। তবে একটি কথা আমাকে অবশ্য বলতে হবে এবং তা হল আমি বক্তাদের ভূমিকার প্রশংসা করব মূলত দুটি প্রশ্নে এবং তাহল মহিলা শ্রমিকদের খনি গর্ভে কাজ করা এবং এই বিল নিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠছে তা আলাদা করা। আমি আনন্দের সঙ্গে বলছি যে সব বক্তা এই বিল সম্পর্কে বলেছেন তারাই আশঙ্কা করেছেন। মহিলা শ্রমিকদের খনির অভ্যন্তরে কাজ করা সম্পর্কে তারা তাদের মতামত দিয়েছেন। এসম্পর্কে সরকারের বক্তব্য ইতিমধ্যে প্রভাবিত হয়েছে এবং সরকারি বক্তব্যের সঙ্গে যারা একমত নন তাদের সঙ্গে আমার কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে যারা বক্তব্য পেশ করেছেন তারা এই বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন এবং আশাকরি সভার সদস্যদের নিকট থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছি ভবিষ্যতেও তা পাবো।

সহ-সভাপতি শ্রী অখিলচন্দ্র দত্ত : প্রশ্ন হচ্ছে—

"খনি মাতৃত্ব সুবিধা আইন ১৯৪১ সংক্রান্ত বিলটি বিষয় প্রবর কমিটিতে (Select Committee) পাঠানো হচ্ছে। এই কমিটির সদস্যরা হলেন শ্রী এম অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার, অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ, শ্রী কে. বি. জিনরাজা হেগড়ে, মওলানা জাফর আলি খান, স্যার সৈয়দ রাজা আলি, শ্রী অমরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী এন. এম. যোশি, রাও বাহাদুর এন শিবরাজ, শ্রী এইচ. জি. খোকস শ্রী এস. সি. যোশি, এবং প্রস্তাবক নিজে এই কমিটির সভা গঠন করার জন্য পাঁচজন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে। ১৯৪৫ সালের দোসরা এপ্রিল সোমবার কমিটিকে তার প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হচ্ছে।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

□ □ □

৪৬

কারখানা আইন : দ্বিতীয় সংশোধনী বিল

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, আমি আমার ভাষণ শুরু করছি :

"১৯৩৪ সালের কারখানা আইন সংশোধনীর জন্য যে বিলটি পেশ করা হয়েছে তা বিবেচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। বিষয় নির্বাচনী কমিটি এই সংশোধনীর সুপারিশ করেন।"

মহোদয়, বিষয় নির্বাচনী কমিটির প্রতিবেদন বেশ কিছুদিন ধরে সভায় পড়ে রয়েছে। আমার এতে কোনও সন্দেহ নেই যে যে সব মাননীয় সদস্য এতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাঁরা সিলেক্ট অথবা বিষয় নির্বাচনী কমিটির সুপারিশ নিশ্চয়-ই পড়েছেন। সুতরাং যে বিলটি আমি পেশ করেছি, তাতে মাননীয় বিষয় নির্বাচনী কমিটির সদস্যগণ যে কয়েকটি মৌলিক পরিবর্তন আমার কথা বলেছেন সেগুলি ছাড়া আমি কোনও বিষয় এখন আর উত্থাপন করব না। মহোদয়, বিষয় নির্বাচনী কমিটি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। বিষয় নির্বাচনী কমিটি প্রথম যে পরিবর্তনের কথা বলেছেন তা হল শ্রমিকদের প্রাপ্য যে কোনও ছুটিতে তাদের মজুরি পাওয়ার অধিকার। এটি এই আইনের আওতার বাইরে। যেমন যেসব ছুটি শ্রমিকরা অন্য আইনের আওতায় ভোগ করে থাকে অথবা অন্য কোনও চুক্তি বা তাদের কাজের শর্তাধীন কোনও ছুটি যদি তাদের প্রাপ্য হয়। মূল বিলে এই সংস্থান ছিল না। কিন্তু এটি এখন এই বিলের ৪৯ এর ক ধারার দু নম্বর উপধারায় যোগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটি সিলেক্ট কমিটি করার কথা বলেছেন তা হল শ্রমিকদের ছেলেমেয়েরাও যাতে ছুটির দিনগুলিতে তাদের প্রাপ্য পায়। মূল বিলটি যখন পেশ করা হয়ে ছিল তখন এই সুযোগ ঐ বিলে ছিল না। এছাড়া সিলেক্ট কমিটি শুধুমাত্র যে মজুরদের ছেলেমেয়েদের জন্য এই সুযোগ দেওয়ার কথা বলেছে তাই নয় ছুটির দিনও বাড়ানোর কথা বলা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য এখন প্রাপ্য ছুটি মাত্র সাত দিন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য ছুটি

হবে ১৪ দিন। মাননীয় সদস্যগণ এটি অবশ্যই দেখতে পারেন বিলের ৪৯ এর খ ধারায়। এরপরে মহোদয়, সভার সদস্যদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে যখন বিলটি প্রথম পেশ করা হয় তখন যে সমস্ত শ্রমিককে তাদের প্রাপ্য ছুটি অর্জন করার পূর্বে বরখাস্ত করা হত অথবা কাজে ইস্তাফা দিত কোনও ছুটি অর্জনের পূর্বেই তাদের কোনও সুযোগ সুবিধার কথা এই বিলে ছিল না। এর জন্য এই পরিস্থিতিতে যে কোনও ছুটিও পেত না। আমি তখন বলেছিলাম বিষয়টি পরে সুবিধামত বিবেচনা করা যাবে। এখন সিলেক্ট কমিটি মনে করেছেন বিষয়টি যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই তারা এই বিলে এর সংস্থান রেখেছেন এবং এজন্যই এই সংস্থান বিলে যুক্ত হয়েছে। এই বিলে একটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং তাহলে পরিদর্শককে একটি বিশেষ ক্ষমতা দান। ঐ ক্ষমতাবলে পরিদর্শক শ্রমিক যদি ছুটি না পায় অথবা ছুটির জন্য মজুরি না পায় তাহলে তার পক্ষ সমর্থন করতে পারবে। বিষয় নির্বাচনী কমিটি একথা বুঝতে পেরে ছিলেন যে শ্রমিকদের প্রাপ্য মালিকপক্ষের কাছ থেকে আদায় করা অথবা তাদের শাস্তিদানের বিষয়টি শ্রকিমদের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না, সুতরাং শ্রমিকরা যাতে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য পায় তা দেখা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। পরিদর্শকদের উপর ক্ষমতা দিয়ে তাই এই কাজ করা হচ্ছে। পরিদর্শক, শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করবেন।

আইন তৈরি করা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিষয় নির্বাচনী কমিটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন। মাননীয় সদস্যদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে মূল বিলে আইন তৈরির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল প্রদেশগুলির হাতে। বিষয় নির্বাচনী কমিটি একথা মনে করলেন যে আইন তৈরিতে ক্ষমতা যদি প্রদেশগুলির হাতে ন্যস্ত থাকে তাহলে বিভিন্ন প্রদেশ বিভিন্ন ধরনের আইন প্রনয়ণ করতে পারে এবং এর ফলে একই আইনের আওতায় বিভিন্ন ধরনের সংস্থান থেকে যাবে। কোনও একটি শিল্পের ক্ষেত্রে একটি প্রদেশে এক আইন হতে পারে আবার ঐ এক-ই শিল্পের ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশে অন্য আইন হতে পারে এবং এর ফলে সারা ভারতে প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ক্ষেত্রে নানা প্রকার অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এইসব কথা বিবেচনা করে বিষয়ে নির্বাচনী কমিটি স্থির করলেন যে একমাত্র ভারত সরকারেরই আইন তৈরির ক্ষেত্রে পুরো অধিকার থাকবে। এরফলে আইনের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা সম্ভব হবে। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে আলাপ আলোচনার পরে এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিলে সংযোজিত হয়েছে। মহোদয়, আমি এখানে তার কয়েকটি আপনাদের কাছে পেশ করলাম। এই বিলের বাকি সংস্থানগুলি কম বা বেশি পুরনো বিলের-ই এবং তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

মহোদয়, সুতরাং আমি বিলটি পেশ করছি। উপ-সভাপতি (শ্রী অখিল চন্দ্র দত্ত) : প্রস্তাবটি উত্থাপিত হল।

"১৯৩৪ সালের কারখানা আইন বিষয় নির্বাচনী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্যগণ যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার প্রতিটি বিষয় নিয়ে আমার কিছু বলার আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ মাননীয় সদস্যদের উত্থাপিত বিষয়গুলির সব-ই এই সংশোধনীতে রয়েছে সেক্ষেত্রে আমি যদি তা নিয়ে আবার অলোচনা করি তাহলে শুধুমাত্র বিষয়ের পুনরাবৃত্তিই হবে। এই পুনরাবৃত্তির কোনও প্রয়োজন দেখি না। যখন সঠিক সংশোধনী পেশ করা হবে তখন আমি আমার বক্তব্য পেশ করব।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, আমি চিন্তিত, আমার পক্ষে শ্রী যোশি বা অধ্যাপক রঙ্গ যে সংশোধনীর কথা বলেছেন তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমি জানি যে একজন শ্রমিক যে একটি নির্দিষ্ট সময় কাজ করেছে তা সে একজন মালিকের অধীন কাজ করুক আর একাধিক মালিকের অধীন কাজ করুক তার প্রাপ্য ছুটি পাবার অধিকার আছে। কিন্তু এব্যাপারে ছুটি বিষয়ে মনে রাখতে হবে। প্রথম হচ্ছে প্রশাসনিক দিক থেকে এটি সম্ভব কিনা। আমার মাননীয় বন্ধুরা যে সব সংশোধনীর কথা বলেছেন তা যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে আমি নিশ্চিত যে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের যে মজুরি দিয়ে থাকেন তা যদি বিমার আওয়ায় এনে ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে না নেওয়া যায় তাহলে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। আমরা যদি স্বাস্থ্য বিমা কার্যকর করতে চাই তাহলে আমাদের তা করতে হয় শ্রমিকদের কাজের ভিত্তিতে এবং এর জন্য প্রয়োজন ক্যাম্প এবং অন্যান্য প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা এইসব ব্যবস্থা থাকলেই তবে প্রস্তাবিত সংশোধনী মেনে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু এই মুহূর্তে এই সংশোধনী মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখিত।

এছাড়া আমি আরও বলতে চাই যে বিলটি কবে থেকে বলবৎ হবে সে বিষয়ে একটি তারিখ নির্ধারণ করার যে কথা বলা হচ্ছে তা কি সভার সদস্যদের মত না বিষয় নির্বাচনী কমিটির মত। মাননীয় সদস্যদের অনেকেই মনে করতে পারেন যে মূল বিলে এটি কার্যকর করার বিষয়টি প্রাদেশিক সরকারের উপর ন্যস্ত ছিল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিই তার দিন স্থির করবেন। কিন্তু এখন আমরা সেই পদ্ধতি

থেকে সরে এসেছি। এখন আমরা স্থির করেছি যে কোন দিন থেকে এটি কার্যকর হবে তা বিল নিজেই ঠিক করবে এবং বিলে যে তারিখ নির্ধারিত আছে তা হচ্ছে ১৯৪৬ সালের পয়লা জানুয়ারি। এর অর্থ এই যে এই বিলকে কার্যকর করার জন্য যে সব প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে তা সবই ঐ পয়লা জানুয়ারি ১৯৪৬ সালের মধ্যে বা তার পূর্বে সবই ব্যবস্থা করতে হবে। এখন একথা আমি স্বীকার করছি এক্ষেত্রে আমার সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা। ঐ তারিখের মধ্যে প্রশাসনিক সব কিছু ঠিক ঠাক করা যে ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে সম্ভব নয় তা আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিচ্ছি। সংশোধিত বিলে এই সব সংস্থান রয়েছে। আমি একথা বলছি যে আমার সহানুভূতি আছে কিন্তু প্রশাসনিক অসুবিধা এতই বেশি যে এই পর্যায়ে আমাকে অবশ্যই এই সংশোধনীর বিরোধিতা করতে হচ্ছে।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : আমি কি একটি পরামর্শ দিতে পারি? সরকারের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে বা না হতেও পারে। প্রথমত ধরা যাক আমরা এই শব্দগুলি বিভিন্ন পরিচালন ব্যবস্থা "সংশোধিত প্রস্তাব থেকে বাদ দিই এবং শুধুমাত্র বলি কারখানাগুলি একই পরিচালন ব্যবস্থার অধীনস্থ।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এতেও সমস্যা আছে, আমি সেগুলির কথাও বলেছি।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : মাননীয় সভাপতি, আমি নিশ্চত, যাঁরা এই সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং যাঁরা এর সমর্থন করেছেন তাদের যথেষ্ট যুক্তি ছিল কিনা। আমরা শ্রমিকদের সর্বদা আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত ব্যবস্থাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। মাননীয় সদস্যদের একথা অবশ্যই স্মরণ আছে যে, ১৯৩৬ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে যখন বিষয়টি উত্থাপিত হয় তখন ৬ দিন ছুটির বিষয়টি মেনে নেওয়া হয়। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করলে আমি বিষয়টি গ্রহণ করতে পারি না অন্য দিকে ঐ বিলে সেই আন্তর্জাতিক আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন এমন অভিযোগও করতে পারবেন না। আমার দিক থেকে আমি আরও একটি অসুবিধার কথা কি উল্লেখ করব। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে এই শ্রম সংক্রান্ত আইনটি যৌথ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। এই পদক্ষেপগুলি প্রশাসনিক দিক থেকে কার্যকর করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর পড়ে। সংবিধানই প্রাদেশিক সরকারগুকিে এই দায়িত্ব দিয়েছে,

এব্যাপারে একটি বিধিবদ্ধ নীতি রয়েছে। আইন প্রনয়ণের এই যৌথ ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করা হক না কেন সে বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারগুলির কম বা বেশি সম্মতি থাকে। আমি একথা সভায় বলতে চাই যে, বিলে যে তারিখ ঠিক হয়েছে তা প্রাদেশিক সরকারগুলির সঙ্গে আলোচনা করেই স্থির করা হয়েছে। যাই হোক না কেন আমি এই সংশোধনী মেনে নিতে প্রস্তুত এবং কি কারণে আমি এই সংশোধনী মেনে নিতে রাজি আছি তা বলতে চাই। এ ব্যাপারে আমার কাছে ভৌগোলিক কারণই বড় বলে মনে হয়েছে। আমি বুঝেছি যে শিল্পকেন্দ্র ও জনবহুল কেন্দ্রের মধ্যে অনেক দূরত্বের ব্যবধান। বোম্বাইতে একটি কারখানা স্থাপিত হল আর শ্রমিক আসতে হবে উত্তরপ্রদেশ বা যুক্তপ্রদেশ থেকে। ঐ বহুদূর থেকে শ্রমিকদের এসে কাজ করতে হয়। মূল বিল থেকে এখন সামান্য অদল-বদল ঘটানো যেতে পারে। এই কারণেই আমি সংশোধনী মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। একই সময়ে আমাকে আর একটি শর্তের উপর নির্ভর করতে হবে। আমি জানি যে অধ্যাপক রঙ্গ এবং শ্রীমতী সুব্বারায়নের নামে আরও একটি সংশোধনী আছে। এর অর্থ হচ্ছে 'অন্তত' এই শব্দটি যোগ করা। বিষয় কমিটি এটি বাদ দিয়েছিলেন। এখন এই শব্দ 'অন্তত' যোগ করার ফলে ক্ষমতা নষ্ট হবে এবং আমি একথা অবশ্যই বলতে চাই যে এসব ব্যাপারে আমি সমতার পক্ষপাতী এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি আশাকরি যারা এই সংশোধনী তুলেছেন তারা এখন তা বাদ দিতে আর আপত্তি করবেন না। আমি আমার দিক থেকে এই সংশোধনী দশ দিনের জন্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ (গুন্টুর ও নেলোর অমুসলিম-গ্রামীণ) : আমরা এখনকার মত সংশোধনীটি বাদ দিতে প্রস্তুত।

সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : আপনারা প্রস্তাবটি নিয়ে তাহলে কোনও চাপ দিচ্ছেন না?

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : অন্য সংশেধানী নিয়ে নয়, মহোদয়।

সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : প্রশ্ন হচ্ছে : প্রস্তাবটি তাহলে গৃহীত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : উপধারা দুই-যে এজন্য একটি সংশোধনী যোগ হচ্ছে এবং তা হল দশ দিনের জায়গায় সাত দিন এই কথাটি যুক্ত হবে।

সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : আমি মনে করি, মাননীয় সদস্য একটি উপযুক্ত সংশোধনী যুক্ত করলে ভাল হবে। আমি মনে করি পরে তা করা যাবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : উপধারা দুইয়ের শেষ লাইনে দশ এই শব্দের পরিবর্তে সাত শব্দটি যুক্ত হবে।

সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : আমি মনে করি, আনুষ্ঠানিকভাবে এর একটি সংশোধনী আনা উচিত।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মহোদয়, আমি দুঃখিত; আমি এই সংশোধনী গ্রহণ করতে পারছি না। আমার মাননীয় বন্ধু মি. ইন্‌সকিপ বলেছেন, অসুস্থতার কোনও সংজ্ঞা হয় না। আমি মনে করি, অসুস্থতার সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে। আমি স্বাস্থ্যবিমা আইনে অসুস্থতার সংজ্ঞা সম্পর্কে খোঁজ খবর করেছি এবং সেখানে অসুস্থতার কোনও সংজ্ঞা পাই নি। এর কারণ এই যে অসুস্থতার ব্যাখ্যা করা যায় না। বিষয়টি একটি সমর্থনপত্র দেওয়ার প্রশ্নে। যদি চিকিৎসক বলেন কোনও ব্যক্তি অসুস্থ তাহলে সবাইকে সেই সংজ্ঞা মেনে নিতে হবে। যদি আমার মাননীয় বন্ধুর বক্তব্য এই হয় যে চিকিৎসকের দেওয়া সার্টিফিকেটের ঠিকভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতে হবে তাহলে আমি তার অভিযোগ বুঝতে পারতাম। কিন্তু ঐ বিষয়ে তার অভিযোগের কোনও হেতু নেই কারণ আমরা আইন তৈরি করার প্রস্তাব করছি যার ভিত্তিতে কিভাবে অসুস্থতার সংজ্ঞা নির্দেশ করা হবে তা লিখিত থাক্‌বে এবং তার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট দেওয়া হবে। তাদের যোগ্যতাও তাতে লিখিত থাকবে। এর ফলে যে সব চিকিৎসক কোনও প্রকার চিকিৎসার কাজ করেন না এবং যারা মিথ্যা সার্টিফিকেট দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন তারা আর এই কাজ করতে পারবেন না। কারণ আমি মনে করি যে আইন তৈরি করা হচ্ছে তাতে এই সুযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ করা হবে। এই সংশোধনী গ্রহণ করার যে অসুবিধা আছে তা হল, আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন সার্টিফিকেট দিয়েই অসুস্থতা প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু মালিককে সঠিকভাবে বিচার বিবেচনা করতে হবে। এমন কি যখন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়েছে তখন তাকে ঠিক করতে হবে শ্রমিককে ছুটি মঞ্জুর করা হবে কি হবে না। আমি বলতে চাই যে এ ব্যাপারে সরকারের কোনও ভূমিকা থাকা উচিত নয়। আইন অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন চিকিৎসকদের কাছ থেকে শ্রমিকরা অসুস্থতার সার্টিফিকেট দেওয়ার পর ছুটি মঞ্জুর করার বিষয়ে সরকারের আর কোনও ভূমিকা থাকে না। তখন বিষয়টি নির্ভর করে সম্পূর্ণভাবে মালিকের সিদ্ধান্তের উপর। এক্ষেত্রে আমি মনে করি মালিকের হাতে কর্তৃত্ব অনেক বেশি চলে যায়, এবং এই কারণে এই সংশোধনী গ্রহণ করতে আমি অরাজি নই।

আর একটি বিষয় যা আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন তাহল, তিনটি শ্রেণী যেমন অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এবং স্বীকৃত ছুটি এই তিন বিষয়ের জন্য আমরা ৯০ দিন সীমিত করেছি। এর ফলে মালিকের পক্ষে কোনও গাফিলতি হলে তা অনির্দিষ্ট কালের জন্য মেনে নেওয়া যায় না। কারণ এই তিন ক্ষেত্রে আমরা ছুটি ৯০ দিন ধার্য করেছি। এখন যদি এই ৯০ দিনের অতিক্রম হয়ে যায় তখন শ্রমিক স্বাভাবিকভাবেই আইন অনুযায়ী সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এই পরিস্থিতিতে আমি এই সংশোধনীর বিরোধিতা করি।

সভাপতি মহোদয় মাননীয় স্যার আবদুর রহিম : প্রশ্ন হচ্ছে " বিলের তিন নম্বর অংশের প্রস্তাবিত ৪৯ এর বি ধারা অনুযায়ী ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা এবং স্বীকৃত ছুটি এই শব্দগুলি অসুস্থতা, দুর্ঘটনা অথবা সহানুভূতি এই কারণে ছুটি মঞ্জুর করা হল এর দ্বারা পরিবর্তিত হবে।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল না।

□ □ □

৪৭

*খনিতে মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বের সুযোগ-সুবিধা সংশোধনী বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম-সদস্য) : মহোদয় আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি:

"খনিতে মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্ব সুবিধা আইন, ১৯৪১এর পুনরায় সংশোধনীর বিষয়টি বিবেচিত হতে পারে। সিলেক্ট কমিটি এই মর্মে প্রতিবেদন পেশ করেছেন।"

মহোদয়, সিলেক্ট কমিটি এই বিলের যথেষ্ট পরিবর্তন করেছে। এই কারণে সিলেক্ট কমিটি বিলে যে সব সংশোধনী আনার কথা বলেছে সে সম্পর্কে আমি সভার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

(এই সময় সভাপতি মাননীয় স্যার আবদুর রহিম আসন গ্রহণ করলেন।)

সিলেক্ট কমিটি এই বিলে প্রথম পরিবর্তনের যে কথাটি বলেছে, তাহল অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এবং যে সব মহিলা শ্রমিক খনিগর্ভে কাজ করে তারা কতদিন ছুটি পাবে। মূল বিলে এই সময় ছিল দশ সপ্তাহ সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং চার সপ্তাহ সন্তানের জন্মের পরে। সিলেক্ট কমিটি সন্তান প্রসবের পূর্বের সময়ের কোনও পরিবর্তনের কথা বলে নি। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর তারা যে সময়ের কথা বলেছে তা যথেষ্ট ব্যাপক। প্রথমত এই সময়কে চার সপ্তাহ থেকে বাড়িয়ে ৬ সপ্তাহ করার কথা বলা হয়েছে। এই ৩৬ সপ্তাহ সময় দুই ভাগে বিভক্ত পূর্ণ বিশ্রাম এবং অন্যভাবে আংশিক বিশ্রামের কথা বলা হয়েছে। সম্পূর্ণ বিশ্রামের সময় সিলেক্ট কমিটি ২৬ সপ্তাহ করার কথা বলেছে আর আংশিক বিশ্রামের সময় হিসাবে তারা ১০ সপ্তাহ সময় ধার্য্য করেছে, আংশিক বিশ্রামের সময় আবার দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করবে এবং তাহল ক্রেশের সুবিধা থাকা অথবা না থাকার উপর। আংশিক বিশ্রামের সময় যদি ক্রেশের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে মহিলা

শ্রমিকরা খনিগর্ভে চার ঘণ্টার বেশি কাজ করবে না। আর ক্রেশের সুবিধা থাকলেও ঐ সময়ের মধ্যে তাকে খনিগর্ভে চার ঘণ্টার বেশি কাজ করতে হবে না। খনিগর্ভে কাজ করা সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি এইসব পরিবর্তনের সুপারিশ করেছে।

যে সমস্ত মহিলা শ্রমিক খনিগর্ভে কাজ করে তাদের মাতৃত্বের সুবিধার ব্যাপারে বিষয় কমিটি নিম্নলিখিত পরিবর্তনের কথা বলেছে। মূল বিলে দুটি শর্ত ছিল যা খনিগর্ভে কর্মরত মহিলা শ্রমিকদের মাতৃত্বের সুবিধা পেতে হলে পূরণ করতে হবে। এই শর্ত দুটি হল (১) মাতৃত্বের সুযোগ পাওয়ার আগে তাকে অন্তত ছয়মাস খনির কাজ করতে হবে এবং (২) ঐ ছয় মাসের মধ্যে অন্তত ৯০ দিন তাকে খনি গর্ভে কাজ করতে হবে। বিষয়ে কমিটি মাতৃত্বের ছুটির সময় সীমা সন্তান প্রসবের পর চার সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ করার কথা বলেছে। অনুরূপভাবে মাতৃত্বের ছুটির অর্থের পরিমান বাড়ানো হয়েছে। আগে এই পরিমাণ ছিল প্রতিদিন আট আনা। বিষয় কমিটি এই পরিমাণ বাড়িয়ে সপ্তাহে ছয় টাকা করার কথা বলেছে। সেক্ষেত্রে দৈনিক পরিমাণ দাড়াবে প্রায় ১৪ আনা। এছাড়া মাতৃত্বের সুবিধা ভোগ করার পুরো সময় স্বীকৃত ছুটি হিসাবে গণ্য করা হবে। এর ফলে ঐ সময় কোনও মহিলা শ্রমিককে মালিকপক্ষ এই বিলের শর্ত অনুযায়ী বরখাস্ত করতে পারবেন না।

বিষয় কমিটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংস্থান এই বিলে রেখেছে। এটি হল মাতৃত্বের সুবিধা ভোগের জন্য কোনও মহিলা শ্রমিক যদি চায় তাহলে সে তার প্রসূতি হওয়ার ব্যাপারে মহিলা ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাতে পারবে। মূল বিলে এটি ছিল না। আমি সভার সদস্যদের একটি ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, ৩৬ সপ্তাহ সময় মহিলা শ্রমিক মাতৃত্বের সুযোগ ভোগ করবে তখন ৩২ সপ্তাহ সময় ঐ শ্রমিক খনিগর্ভ ছাড়া বাইরে অন্য কাজ করে তার আয় বাড়াতে পারে। মূল বিলে এই সংস্থান ছিল না, সন্তান প্রসব হওয়ার পর মাত্র চার সপ্তাহ সে কাজ করতে পারবে না। সুতরাং সংশোধিত বিলে একজন মহিলা শ্রমিক যে খনির উপরিভাগে কাজ করে, সে মাত্র আট থেকে বার আনা দৈনিক মাতৃত্বের সুযোগ পাবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে আগের সুবিধার চেয়ে সে এখন ৫০ শতাংশ বেশি সুযোগ পাচ্ছে মূল আইনে এইসব ছিল না।

বিষয় কমিটি এই ধরনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি, বিষয় কমিটি এই বিলকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করেছেন। এক-ই ভাবে সরকারও এই সংশোধনীর বিষয়ে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেন নি। বরং

বিষয় কমিটি যে সব পরিবর্তনের কথা বলেছেন পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার ঐ বিষয় কমিটি দ্বারা সংশোধনী গ্রহণ করতে রাজি।

মহোদয়, আমি সুতরাং এটি পেশ করছি।

সভাপতি (মাননীয় স্যার আবদুর রহিম) : প্রস্তাবটি পেশ হল।

"বিষয় কমিটির সুপারিশ মেনে সংশোধনী খনিতে মহিলা শ্রমিকের মাতৃত্ব আইন, ১৯৪১ বিবেচনার জন্য গৃহীত হল।"

□ □ □

৪৮

শিল্প শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যবিমা স্থায়ী শ্রম কমিটির আদায়কারের প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা

ভারতের শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিমা সম্পর্কে অধ্যাপক আদায়করের প্রতিবেদন নিয়ে স্থায়ী শ্রম কমিটির সভায় আলোচনা হয়। গত ১৭ই মার্চ নতুন দিল্লিতে ঐ আলোচনা সমাপ্ত হয়। ভারত সরকারের শ্রম সদস্য মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর ঐ বৈঠকে সভাপতি করেন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন I.L.O.পক্ষ থেকে মি. স্টাক (Stack) এবং শ্রীরাও ঐ বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরা ঐ বেঠকে দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠকে তাঁরা যে মন্তব্য করেন স্বাস্থ্যবীমা সম্পর্কে তা বিলি করা হয়।

বৈঠকে প্রতিনিধি এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষের যে সব লোক উপস্থিত ছিল্লেন, তারা আদায়করের প্রতিবেদনের প্রশংসা করেন এবং বিভিন প্রশ্নে তারা তাদের মতামত দেন। এগুলি হল চিকিৎসাভাতা ও নগদ পাওনা, সুবিধা পাওয়ায় শর্ত অথবা অপেক্ষাকাল চিকিৎসার ধরন, চিকিৎসা সংগঠন এবং সরকারের ভূমিকা প্রভৃতি। বেশ কিছু প্রতিনিধি কত দ্রুত এইসব রূপায়িত হবে তার ওপর গুরুত্ব দেন এবং একটি ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে সব সংগঠিত শিল্প এবং বড় কারখানাগুলিকে তাদের পরিধিকে বাড়াতে হবে।

মাতৃত্বের সুযোগ : বিষয়টি নিয়ে ঐক্যমত হয় যে, কেন্দ্র একটি প্রকল্প তৈরি করবে এবং যদি এই প্রকল্প তৈরি হয় তাহলে ঐ প্রকল্পে মাতৃত্বের সুযোগ সুবিধা এবং শ্রমিকদের ক্ষতি পূরণ দান সংক্রান্ত সংস্থান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রকল্প তৈরি হওয়ার পরে কেন্দ্র তা নিয়ে প্রদেশগুলির এবং মালিকও শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে পরামর্শ করবে। তাদের মতামত বিচার বিবেচনার পর বিষয়টি নিয়ে আইনসভায়

বিল উত্থাপিত হবে। সভায় আলোচ্যসূচির মধ্যে আর একটি বিষয় ছিল ত্রিপাক্ষিক শ্রম সম্মেলন এবং স্থায়ী শ্রম কমিটির সংবিধান এবং কাজকর্ম পরিবর্তন করার প্রস্তাব। এর উদ্দেশ্য ছিল এদের কাজকর্ম দুটি ভাগে করা। একটি হবে সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত, যেমন নিয়োগের শর্তাবলী, শ্রম আইন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং শ্রমিক কল্যাণের নানা বিষয় প্রভৃতি এবং দ্বিতীয়ত শ্রম আইন সংক্রান্ত।

কমিটির কাছে যে স্মারকপত্র পেশ করা হয়েছে তাতে সুপারিশ করা হয়েছে দ্বিতীয় তালিকায় কাজকর্ম দেখাশুনা করার জন্য একটি শ্রম-কল্যাণ কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই কমিটির মাধ্যমে তাদের কল্যাণ সুনিশ্চিত করা বিভিন্ন শিল্পে যে সব সমস্যা দেখা দেবে এই কমিটি সেগুলি সামলাবে এই কমিটিতে বিভিন্ন শিল্প সংগঠনের প্রতিনিধিরা থাকবেন। শ্রম সম্মেলন এবং এর স্থায়ী কমিটি শ্রমিক নিয়োগ, শ্রম আইন এবং সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন দিক দেখাশুনা করবে। এর ভিত্তি হবে বৃহত্তর ও সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এই সব প্রস্তাব খতিয়ে দেখার জন্য একটি উপসমিতি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

□ □ □

৪৯

যুদ্ধের কাজে জাতীয় পরিষেবা শ্রম সদস্য ড. বি. আর. আম্বেদকরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

একটা সময় যখন যুদ্ধের জন্য অচলাবস্থা চলছিল এবং ভারত আক্রান্ত হবার আশঙ্কায় তখন যুদ্ধ পরিষেবার এবং যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন সংক্রান্ত শিল্পে কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোক পাওয়া বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিয়ে ছিল। ঐ সময় গুরুত্ব বিবেচনায় জাতীয় শ্রম পরিষেবা ন্যায়পীঠ গঠিত হয়। খুব দ্রুতগতির কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক যোগাড় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতার অভাবে এই কাজে অসুবিধা দেখা দেয়। খুব সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হয় কিন্তু প্রবল জোয়ারে এ কাজ সফল হয়।

ভারত সরকারের শ্রম সদস্য মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর বিষয়টি এইভাবে উপস্থাপিত করেছেন : জাতীয় শ্রম সেবা আদালতের কাছে তিনি তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। ১৯শে এপ্রিল সিমলায় এই আদালত বসে, প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্প। জাতীয় পরিষেবা (প্রযুক্তি সংক্রান্ত) অধ্যাদেশ এবং চাকুরি বিনিয়োগ কেন্দ্র নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রম সদস্য তাঁর বক্তৃতায় আরও বলেন, প্রায় ১৫ হাজার প্রযুক্তিবিদকে জাতীয় পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আদালত সরকারকে নির্দেশ দেয়। এই প্রযুক্তি বিদদের নিয়োগের ব্যাপারেও আদালত যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। প্রযুক্তিবিদদের পদের বাসস্থান থেকে দূরে নিয়োগ পত্র নিতে বলা হয় এবং ভাল কাজের আশায় অন্যত্র চাকরি নেওয়ার প্রবনতাকে রুখে দেওয়া হয়। সংযুক্ত রাজ্যে এই কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ চাকরির শর্ত। এছাড়া শ্রম মন্ত্রক এর জাতীয় পরিষেবা দফতরের আছে ব্যাপক কল্যাণ মূলক সংগঠন ঐ সব সংবিধান নিজের বাসস্থান থেকে দূরে থাকা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখাশুনা করে। ভারতে এই ধরনের আদালতের অবস্থা অবশ্য অন্য এবং মোটের ওপর তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা বিশেষ

বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে প্রয়োগ করেছে। যুদ্ধের ব্যাপারে তারা ভালভাবেই কাজ করেছে। কিন্তু অকারণে শ্রমিকদের স্বার্থ হানি হতে দেয়নি।

অনেক মালিক আছেন, যাঁরা অভিযোগ করেছেন, আদালতের রায় শ্রমিকদের প্রতি অকারণে পক্ষপাতমূলক, অন্যদিক আবার এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে আদালত শ্রমিকদের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন। মালিক ও শ্রমিকপক্ষের এইসব অভিযোগকে আমি কখনও খাটো করে দেখিনি। কারণ আমি সব সময় বিশ্বাস করি যে উভয় পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর সরকারের সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে, অতএব দেখা যাবে একদিকে যেমন শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা মনোভাব নিয়েছি অন্যদিকে শ্রমিক নিয়োগ শর্তাবলীর প্রতিও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছি। তা সত্ত্বেও কলকাতা থেকে শ্রমিক অসন্তোষের খবর আসছে। শ্রমিকদের জাতীয় পরিষেবার জন্যই নিয়োগ করা হয়েছে তাদের অন্যত্র ভাল কাজের সন্ধানে চলে যাওয়ার জন্য নয়।

ন্যায় বিচারের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ : পরবর্তী সভায় যে সব সুপারিশ নিয়ে আলোচনা হবে তার কোনও বিশদ বিবরণ আমি দিতে চাই না। কিন্তু আমি একথা বলতে চাই যে যুদ্ধ শ্রমিকদের উপর একটি বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে? এখন আমরা যদি যুদ্ধের কারণে তাদের উপর আরও চাপ দিই তা যে খেয়ালখুশিমত করা যাবে না তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন। মালিকপক্ষের কাছ থেকে যত চাপই থাকনা কেন যুদ্ধের কারণে শ্রমিকদের প্রতি কোনও অন্যায় বা তাদের মর্যাদা নষ্ট করার মতো কোনও কাজ করা হবে না।

যুক্তরাজ্যে শ্রমমন্ত্রী এবং জাতীয় পরিষেবার হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ ক্ষমতা সমভাবে মালিক এবং শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এই ক্ষমতাই মালিক এবং শ্রমিক পক্ষকে কাছাকাছি আনতে সাহায্য করেছে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে বেশি করে বোঝাপড়া সম্ভব হয়েছে। এই সহযোগিতার ভিত্তিতে আমি ভারতের অবস্থা দেখতে চাই এবং আমি নিশ্চিত যদি দৃঢ়ভাবে এবং সুবিচারের ভিত্তিতে এটি প্রয়োগ করা যায় তাহলে এক্ষেত্রে সাফল্য সম্ভব।

জাতীয় শ্রম পরিষেবা ন্যায়পীঠের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে। ভারতে প্রশিক্ষণ প্রকল্পের জন্য যুক্ত রাজ্যের মতো ঐ ন্যায়পীঠের উপর ন্যস্ত এবং যে আন্তরিকতার সঙ্গে তারা এই কাজটি করেছেন সেজন্য আমি তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এটি না হলে আমাদের প্রশিক্ষণ প্রকল্প সফল হত না।

বেভিন (Bevin) প্রশিক্ষণ প্রকল্প সম্পর্কে আমি জানি যে, শ্রমমন্ত্রক এবং জাতীয় পরিষেবা প্রশিক্ষণার্থীদের নির্বাচনে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। এইসব প্রশিক্ষণার্থীদের যুক্তরাজ্যে পাঠানো হয়ে ছিল। এই প্রশিক্ষণে অবশ্য কিছু অবাঞ্ছিত লোক ছিল কিন্তু সংখ্যায় তারা এত কম ছিল যে এই প্রশিক্ষণের জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় হয়েছে তা বৃথা যায় নি। পক্ষান্তরে একথা বলা যায় যে এই প্রশিক্ষণার্থীদের অধিকাংশই আমাদের শ্রমিকদের কাজের মান বাড়ানোর ব্যাপারে বড় অবদান যুগিয়েছিল। যুদ্ধ চলছে এমন একটি দেশের অভিজ্ঞতা তারা অর্জন করে নিয়ে এসেছিল, এই সাফল্য যাতে যুদ্ধের সময় ছাড়া অর্জন করা যায় তা এখন দেখা দরকার। শান্তির সময় কি এইরকম কাজ করা যায় না? আমরা আশা করি শীঘ্রই তা সম্ভব হবে।

পুনর্বাসন ব্যবস্থা : যুদ্ধোত্তর সময়ের এই বিষয়টি নিয়ে আমাকে অনেক বেশি ভাবতে হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ের থেকে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রথম এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল কর্মচ্যুত কর্মীদের পুনর্বাসন। এখানে আমি যে শুধুমাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কথাই বলছি তা নয় যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কথাও বলছি। কোনও সরকারই এই শ্রমিকদের কোনও সময়ই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। যুদ্ধ থেকে শান্তি প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত এই সময়ের ব্যাখ্যা। পুনর্বাসন একটি নাগরিক দায়িত্ব এবং সরকার স্থির করেছেন এই দায়িত্ব শ্রম দফতরের। আমাদের পুনর্বাসন প্রকল্প নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা হবে। এরজন্য আমরা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যাচ্ছি তাতে জাতীয় শ্রম পরিষেবা আদালতের চেয়ারম্যান একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

এই পুনর্বাসন সমস্যাকে খুব সাধধানতার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। প্রদেশগুলি এবং কেন্দ্রের সহযোগিতায় এই কাজ হবে। প্রদেশগুলিতে আঞ্চলিক সংগঠনের প্রধান থাকবেন চেয়ারম্যান। তার কাজ হবে কেন্দ্রের সংগঠনগুলির সঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের বিভাগগুলির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রেখে চলা। তার কাজ হবে সর্বোচ্চ উদ্যোগ, ক্ষমতা ও দক্ষতার এবং আমি আশাকরি এক্ষেত্রে তার অবদান যুদ্ধের সময়ের চেয়ে কম হবে না।

দক্ষ বিনিয়োগ পরিষেবা : আমাদের পুনর্বাসন সংগঠনগুলির কাজকর্ম নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনায় যেতে চাই না। কিন্তু আমি একথা জোর দিয়ে বলতে চাই প্রাক্তন কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা ছাড়াও এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দেশের মধ্যে একটি দক্ষ বিনিয়োগ পরিষেবার ভিত স্থাপন করতে

চাই। এই পরিষেবার মুখ্য বৈশিষ্ট হচ্ছে বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলির মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করা। আমরা ইতিমধ্যেই এই ধরনের কয়েকটি কেন্দ্র স্থাপন করেছি। এদের মধ্যে কিছু কিছু সংগঠন ভাল কাজ করছে। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও সত্য আমাদের এর ভিত আরও সুদৃঢ় করা দরকার। এই সব সংগঠন চালানোর জন্য আমাদের প্রয়োজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং শ্রমিক মালিকপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ করার জন্য উপযুক্ত বাড়ি। এই উভয় ব্যাপারে আমাদের সংগঠনগুলি বড় বাধা সত্ত্বেও কাজ শুরু করেছে। কর্মী প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমরা শীঘ্রই ম্যানেজার এবং সহকারি ম্যানেজারদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প শুরু করতে যাচ্ছি। আমরা আশা করি এই প্রশিক্ষণ নতুন নতুন বিনিয়োগ কেন্দ্র স্থাপনে সাহায্য করবে এবং তা সঠিকভাবে কাজ করবে। পুনর্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রশিক্ষণ এবং কর্মচ্যুত মানুষদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ থাকতে হবে এবং তারা যে নতুন কাজে নিয়োগ পাবে সে সম্পর্কে তাদের আগ্রহ কতটা সে সম্পর্কেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ব্যাপারে প্রাচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই সব সংগঠনের বিশদ বিবরণ আপনাদের জানানো হবে বিবেচনার জন্য এবং আমরা এব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছ থেকে পরামর্শ আহ্বান করব।

কাজের ব্যাপকতা : এখন আপনাদের সামনে সব থেকে বড় কাজ হল বিভিন্ন প্রদেশে ফিরে গিয়ে প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তাদের আমাদের এই কাজে উৎসাহিত করা। আমরা চাই না এব্যাপারে কোনও প্রকার ভুল বোঝাবুঝি থাক, এমন যদি কোনও সমস্যা থাকে যা আপনারা সমাধান করতে পারছেন না আমরা চাই সেগুলি আপনারা আমাদের নজরে আনুন এবং কেমন করে সেগুলির সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে আপনাদের পরামর্শ দিন, আমাদের এই কাজ ব্যাপক এবং সমস্যাও বিরাট। সুতরাং আমাদের কাজ করতে হবে একযোগে এবং এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে যেন আমরা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ভালভাবে কাজ করতে পারি।

আমি আপনাদের অনেক সময় নিয়েছি এবং আপনাদের কাজ শুরু করার আগে আমি আপনাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সৌভাগ্য কামনা করছি।

আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার নিয়োগ : কেন্দ্রীয় সরকার বোম্বাই, কলকাতা ও লাহোরের জন্য তিনজন আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার নিয়োগ করেছেন। এঁরা হলেন শ্রী ভি. জি. যাদব, ড: শেঠ এবং শ্রী আবু তালিব। নতুন এই ব্যবস্থায় তারা প্রশাসনিক কাজ করবেন। শিল্পে শিল্প সম্পর্কে এবং কেন্দ্রীয় স্তরে সংস্থা সমূহের

মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এদের নিয়োগ করা হয়েছে। সদর দফতরে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য শ্রম কমিশনার শ্রী এস. সি. যোশির তত্ত্বাবধানে এরা কাজ করবেন। নতুন এই ব্যবস্থায় দিল্লিতে এছাড়াও রয়েছেন একজন উপ-শ্রম-কমিশনার, নয় জন সমন্বয়কারি অফিসার এবং ২৪ জন শ্রম পরিদর্শক। তারা ভারতের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করবেন। এছাড়া থাকবেন একজন ক্যানটিন ইন্‌সপেকটর। কেন্দ্রীয় স্তরে যে সব শিল্প তা হল (১) ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে অথবা কর্তৃত্বে থাকা সব শিল্প প্রতিষ্ঠান, (২) কেন্দ্রীয় রেল, (৩) খনি ও তৈলক্ষেত্র এবং (৪) প্রধান প্রধান বন্দর।

□ □ □

৫০

*দামোদর উপত্যকার বহুমুখী উন্নয়ন

কলকাতা সম্মেলনে শ্রম সদস্যের ভাষণ

"এই প্রকল্প (দামোদর নদের জলকে কজে লাগিয়ে) ভারত সরকারের কাছে স্বাগত। দামোদর নদের জল নিয়ন্ত্রণ করে এটি একটি চমৎকার প্রকল্প। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, একটি এলাকায় সারা বছর ধরে সেচ প্রকল্প চালু রাখা যায় ফলে দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং দীর্ঘস্থায়ী বিদ্যুতের চাহিদা মেটানোর পক্ষে এটি একটি চমৎকার প্রকল্প। আমি নিশ্চিত এই প্রকল্প বাংলা এবং বিহার সরকারের কাছে আরও বেশি গ্রহণীয় হবে। কারণ এই প্রকল্প ঐ দুই রাজ্যবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে।"

ভারত সরকারের শ্রম সদস্য মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর বাংলা ও বিহারের প্রতিনিধিদের এক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে একথা বলেন। ২৩শে অগাস্ট কলকাতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দামোদর উপত্যকা বহুমুখী প্রকল্পের জন্য প্রাথমিক স্মারকলিপি নিয়ে ঐ বৈঠকে আলোচনা হয়। সম্মেলন চলে দুদিন ধরে এবং শ্রম সদস্য সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন। এখানে ড: বি. আর. আম্বেদকরের ভাষণের পূর্ণ বয়ান তুলে দেওয়া হল ঃ—

"দামোদর নদের জল কাজে লাগিয়ে একটি প্রকল্প তৈরির বিষয় নিয়ে আমরা এই দ্বিতীয়বার বৈঠকে মিলিত হচ্ছি। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে এ বিষয়ে প্রথম বৈঠকটি হয় ১৯৪৫ সালের ৩রা জানুয়ারি। এরপর আমরা দামোদর নদ বন্যা সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে বিচার বিবেচনা করি। বাংলা সরকার ১৯৪৪ সালে এই কমিটি গঠন করেন।"

"আমাদের সামনে তখন প্রশ্ন ছিল আমরা শুধুমাত্র বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য দামোদর নদের উপর বাধ দেব না একে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচের জন্য জল সরবরাহ এবং

নৌ চলাচলের জন্য একটি বহুমুখী প্রকল্প হিসাবে গড়ে তুলবো। এই সম্মেলনে যে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয় তা ঐ দ্বিতীয়টির অনুকূলে যায়। সেই অনুযায়ী স্থির হয় এরজন্য পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের। এরজন্য প্রয়োজন হয় বহুমুখী প্রকল্পটির জন্য তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এব্যাপারে প্রাথমিক কাজ শুরু করার জন্য আমি সবরকম কারিগরি সাহায্যের আশ্বাস দিই।"

"বিশেষজ্ঞরা এরপর বাংলার ইঞ্জিনিয়ারদের সহযোগিতায় দামোদর নদ উপত্যকা প্রকল্প গঠনের উদ্দেশ্যে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট তৈরি করেন। ঐ রিপোর্টের প্রতিলিপি বাংলা ও বিহার সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।"

"এই প্রতিবেদন সম্পর্কে বক্তব্যের খাতিরে আমার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত যে আমি আপনাদেরই কথার প্রতিধ্বনি করছি এবং আমরা এই প্রতিবেদন তৈরির জন্য মি. ভরদুনের কাছে কৃতজ্ঞ। এছাড়া বাংলার ইঞ্জিনিয়াররা এ ব্যাপারে তাকে যে সহযোগিতা করেন তার জন্যও আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ কারিগরি পর্যদের চেয়ারম্যান মি. ম্যাথুজের কাছ থেকেও আমরা এ ব্যাপারে পরামর্শ পেয়েছি। পরিশেষে আমরা আশা করব যে জলপথ ও নৌ-চলাচল পর্ষদের সভাপতি শ্রী ঘোষালের কাছ থেকেও সব রকম সহযোগিতা পাব।"

"দামোদর নদ উপত্যকার সব রকমের সম্ভাবনার জন্য এখন আমাদের হাতে আছে অত্যন্ত স্পষ্ট, ব্যাপক এবং প্রয়োজনীয় সমীক্ষা রিপোর্ট এবং সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য। এসবের ভিত্তিতে আমরা জোরালোভাবেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পাচ্ছি।"

"আজ আমরা সমবেত হয়েছি তার কারণ হচ্ছে, এই প্রাথমিক রিপোর্ট নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা এবং আলোচনা থেকে যে সব বিষয় বেরিয়ে আসবে তা বিচার বিবেচনা করে দেখা। এই সব বিষয়ে আলোচ্যসূচিতে রাখা হয়েছে এবং তা তৈরি করা হয়েছে এই সভার জন্যই, প্রাথমিক প্রতিবেদন থেকে এই আলোচ্যসূচী তৈরি করা হয়েছে এবং এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বাংলা ও বিহার সরকারের কাছে ইতিমধ্যেই বিষয়টি বিজ্ঞাপিত হয়েছে। কাজেই এ নিয়ে আর নতুন করে আলোচনার প্রয়োজন নেই। আমি এখন এ ব্যাপারে মাত্র দুটি বিষয়ের উল্লেখ করব। এক-নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে এবং দুই—কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে কাজ হবে।"

"বন্যা নিয়ন্ত্রণ একটি নীতির ব্যাপার। আমি আশাকরি এ ব্যাপারে একটি সাধারণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হবে। দামোদর উপত্যকায় বন্যা এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচি রূপায়িত হলে তা ঐ এলাকার নিরাপত্তা সূচিত হবে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রাথমিক রিপোর্টে প্রকল্পের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার কথাই বলা হয়েছে।"

"নীতিসংক্রান্ত দ্বিতীয় বিষয়টি হল বাংলা, বিহার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ দায়িত্ব এবং এরজন্য এই তিন সরকারকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। আমি আশা করব, প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে এই তিন সরকার দামোদর নদ উপত্যকা প্রকল্পের উন্নয়নের কাজ খুব জোরের সঙ্গে শুরু করবেন।"

"ভারত সরকারের কাছে এই প্রকল্প স্বাগত। এই প্রকল্পে এই নদী নিয়ন্ত্রণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে, এর দ্বারা সম্ভব হবে বন্যা রোধ করা এবং এক বিস্তৃত এলাকায় সেচের জল সরবরাহ করা। এরজন্য খরাজনিত দুর্ভিক্ষের হাত থেকে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে। আমি নিশ্চিত, বাংলা ও বিহার সরকারের কাছে এই প্রকল্প বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবে কারণ এটি ঐ এলাকায় জনসাধারণের স্বার্থেই করা হচ্ছে।"

"প্রকৃত অর্থে বলতে গেলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে চার লক্ষ ৭০ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহের জন্য জলাকার নির্মাণ। সাত লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে সেচের জল সরবরাহ করেও নৌ-চলাচলের সুবিধা, তিন লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ৫০ লক্ষ লোকের সরাসরি এবং আরও বহু লক্ষ লোকের অপ্রত্যক্ষভাবে উপকার হবে।"

"এখন এই প্রকল্পের পদ্ধতির ব্যাপারে আসা যাক। এক্ষেত্রে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি ক্রমপর্যায়ে সেগুলি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

(১) বাঁধ কোথায় কোথায় হবে প্রথমেই তা নির্ধারণ করতে হবে,

(২) স্থান নির্ধারণের কাজ শুরুর আগে ব্যাপক সমীক্ষা করতে হবে,

(৩) কোন সংস্থা এই সমীক্ষা করবে তা নির্ধারণ করতে হবে,

(৪) কোন সংস্থা বাঁধ নির্মাণ করবে তা ঠিক করতে হবে।

(৫) এই কাজের জন্য সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে। সেখানে থাকবেন কারিগরি এবং

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। সমীক্ষার কাজ চালাবার সঙ্গে সঙ্গে এর প্রয়োজন এবং তার পরেই শুরু হবে বাঁধ তৈরির কাজ ;

(৬) জল সম্পদ ও বিদ্যুৎ শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত সমীক্ষা এবং এই জল ও বিদ্যুৎ শক্তি উন্নয়নের কাজে ব্যবহার।"

"নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত এইসব বিষয়ের উপর আমরা চাই অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এই প্রকল্পের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অবশ্যই নিরাপত্তা এবং একটি নদী বিধৌত বহুমুখী প্রকল্প গড়ে তোলা। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে এটি একটি যুদ্ধোত্তর বিনিয়োগ প্রকল্প। এখন যুদ্ধ শেষ তাই এখন শান্তি প্রতিষ্ঠার সময় আমাদের নানা সমস্যা, এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে বেকার সমস্যা দূর। যুদ্ধের সময় যে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল তা বন্ধ এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত খরচও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের সামনে এক বিরাট সমস্যা এবং এই সমস্যা আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির সমস্য।"

কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা

"এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দামোদর উপত্যকা প্রকল্পের গুরুত্ব বিরাট এবং এ ব্যাপারে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা এক বিরাট অপরাধ বলে গণ্য হবে। সিদ্ধান্ত ছাড়া আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আজই এব্যাপারে একটি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারব।"

"আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ভারত সরকারের এব্যাপারে আন্তরিক আগ্রহ রয়েছে এবং এই প্রকল্প রূপায়ণে ভারত সরকার তার ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবে।"

(১) পূর্ব ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারত সরকার এই প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য অনুমোদিত রূপরেখা অনুযায়ী তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভাবে পালন করবে এবং সাধ্য অনুযায়ী সব কিছুই করবে। যদিও কিভাবে ভারত সরকার এই কাজে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে তা এখনও ব্যাখ্যা করা হয় নি। তা সত্ত্বেও সরকারের প্রাথমিক লক্ষ্য হল পূর্বের কর্তৃত্ব যাতে অটুট থাকে তা দেখা।

(২) প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ চালানোর জন্য কর্মী ও সংস্থার সরাসরি দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় সরকার এই

কাজ এমনভাবে করতে চায় যাতে এই বাঁধ নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত হয় এবং দুটি প্রদেশ যাতে এই কাজে যুদ্ধোত্তর পর্বে কোনও প্রকার বড় রকমের সমস্যার মুখোমুখি না হয়। ভারত সরকার অবশ্য বাংলায় যে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীর অভাব রয়েছে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল এবং এই অসুবিধা দূর করে প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজে সহায়তা করার জন্য সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্য নেবার চেষ্টা করবে। এতে এই প্রদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীদের ঘাটতি যেমন মেটাতে সাহায্য করবে এবং যন্ত্রপাতি সরবরাহেও গতি সঞ্চারিত হবে।

(৩) প্রাথমিক অনুসন্ধারে কাজ দ্রুত করার জন্য কেন্দ্র প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাতেও রাজী। মূল প্রকল্পের জন্য এই কাজ জরুরি কেন্দ্রের এব্যাপারে শর্ত হচ্ছে প্রকল্প রূপায়িত হলে ঐ ব্যয় ভার প্রকল্পকেই বহন করতে হবে এবং যদি ব্যর্থ হয় তাহলে ঐ ব্যয় ভার কেন্দ্র ও রাজ্যকে আধাআধি হিসেবে বহন করতে হবে।

"ভারত সরকার চায় প্রদেশগুলি শুধুমাত্র একটি কাজ-ই করুক। সেই কাজটি হল ভারত সরকার চায় এই প্রকল্পের সুফল যেন তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মানুষ পায় অর্থাৎ এই উপত্যকা অঞ্চলের বাসিন্দারা এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দারা যেন এর সুফল ভোগ করতে পারে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে যে উন্নয়ন হবে তার অংশীদার সকলেই। প্রদেশগুলিকে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমার মতে এই কাজ অত্যাবশ্যক এবং এই কারণে আমরা শুরুতেই একটি সংস্থা গঠন করতে চাই যাতে এই সংস্থা ঐ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এখনই একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে।

সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়

সম্মেলনে এই সুসংবদ্ধ এবং বহুমুখী দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি এবং অনুসন্ধান কিভাবে আরও ত্বরান্বিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা হয়। এই মর্মে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে এই প্রকল্পের দ্বারা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ যাতে সবথেকে ভালভাবে হয় তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রাকৃতিক এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সর্বাধিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ শুরু করার পূর্বে দামোদর নদে কোথায় কোথায় বাঁধ দেওয়া হবে তা সম্ভাব্য স্থান নির্ধারণের জন্য আরও সমীক্ষা করতে হবে। এই সব সম্ভাব্য স্থান হল মাইথন, আয়ার, এবং সোমালপুর। সম্মেলনে এই সব প্রশ্নের কারিগরি দিক নিয়ে আলোচনা হয়।

আলোচনায় স্থির হয় যে অগ্রাধিকার অনুসারে বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রথমে মাইথন, পরে আয়ার এবং তারপর সোমালপুরে নাম বিবেচিত হবে এবং এই প্রত্যেকটি বাঁধ তৈরি সম্ভাব্যস্থান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় প্রযুক্তি বিদ্যুৎ পর্ষদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি করবে। সোমালপুরের ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট তৈরির সময় দেখতে হবে কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প কতটা প্রভাব ফেলবে।

প্রয়োজনীয় কর্মী

এই প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির জন্য সমীক্ষার কাজ চালানোর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম সুযোগেই প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগের চেষ্টা করবে। অবশ্য বর্তমানে যেসব কর্মী রয়েছে তাদের দিয়েই ইতিমধ্যে কাজ শুরু করতে হবে। সম্মেলনে একথা স্থির হয় যে বাঁধের স্থূল সমীক্ষার কাজ কর্মীরা কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদের তত্ত্বধানে করবেন। কারণ এরফলে প্রাথমিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকবে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্পের প্রথম দুটি বাঁধের নক্সা ও নির্মাণের কাজে পরামর্শ দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চারজন ইঞ্জিনিয়ারকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐ ইঞ্জিনিয়ারগণ একটি প্রযুক্তি মিশন গঠন করবেন এবং তারা সম্ভব হলে আগামী বছরের গোড়ার দিকে ভারতে এসে পৌঁছাবেন। আশা করা হচ্ছে এর মধ্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হবে।

এই প্রকল্প রূপায়ণ এবং প্রশাসনিক কাজের জন্য যদিও প্রয়োজন দামোদর উপত্যকা কর্তৃপক্ষ গঠন তাসত্ত্বেও সম্মেলনে স্থির হয় প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত একজন উঁচুপদের আধিকারিক নিয়োগের। প্রস্তাবিত প্রকল্পের কাজের সমীক্ষা যাতে দ্রুত হয় সেজন্য এ আধিকারিক প্রাথমিক সমন্বয়ের কাজ করবেন।

এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে আনুসঙ্গিক যে সব সমস্যা দেখা দেবে একযোগে তারও সমীক্ষা করতে হবে বলে সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয়। বাংলা ও বিহার সরকারের সেচ বিভাগ কেন্দ্রীয় সেচ, জলপথ এবং নৌ-চলাচল কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে এই বাঁধ নির্মাণের ফলে যে জল পাওয়া যাবে তা যাতে যথোপযুক্ত ভাবে সদ্ব্যবহার করা হয় তারজন্য কোন পদ্ধতি সবথেকে ভাল তা সমীক্ষা করে দেখবে। অন্য যে সব বিষয় সমীক্ষা করে দেখতে হবে তারমধ্যে আছে বিদ্যুতের চাহিদা, সেইসঙ্গে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন্দ্র স্থাপন, ক্ষয়রোধ সংরক্ষণ, প্রকল্পের ভৌগোলিক ও জল সরবরাহ সংক্রান্ত বিষয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলা ও বিহার সরকারের নিম্নলিখিত প্রতিনিধিবর্গ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঃ—

কেন্দ্রীয় সরকার—এইচ. সি. প্রায়র, সচিব শ্রম দফতর, শ্রী ভি. এল. মজুমদার, উপসচিব শ্রম দফতর, শ্রী এম. ইক্‌রামুল্লাহ, যুগ্মসচিব সরবরাহ দফতর, এইচ. এম. ম্যাথুজ, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদের সভাপতি, ডব্লু. এল. ভরদুন, কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ প্রযুক্তি পর্ষদের জলবিদ্যুৎ সংক্রান্ত সদস্য, সি. কোর্টস, সরবরাহ দফতরের উপসচিব এবং উপ কয়লা কমিশনার জে. আর. হ্যারিসন।

বাংলা সরকার—যোগযোগ ও পূর্ত বিভাগের গভর্নরের উপদেষ্টা ও. এম. মার্টিন, অর্থ, শ্রম বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের গভর্নরের উপদেষ্টা শ্রী আর. এল. ওয়াকার, যোগাযোগ ও পূর্ত বিভাগের সচিব শ্রী বি. বি. সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ বিভাগের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর এস. কে. গুপ্ত, দামোদর প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার শ্রী মান সিং, জনস্বাস্থ্য অধিকর্তা মেজর এম. জাফর এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বিভাগের যুগ্ম সচিব শ্রী আজিজ আহ্‌মেদ।

বিহার সরকার—উন্নয়ন কমিশনার শ্রী এস. এম. ধরনিয়ার, শ্রী ডব্লু. জি. কাইন।

□ □ □

৫১

ভারতের শিল্প-শ্রমিকদের বাসগৃহ

সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী শ্রম কমিটির বৈঠকে ভারতের শিল্প শ্রমিকদের বাসগৃহের সংস্থান দ্রুততর করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের শ্রম কমিশনার মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে স্থির হয় এর জন্য একটি উপসমিতি গঠন করা হবে। ঐ সমিতি শ্রমিকদের গৃহ নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ বিচার বিবেচনা করবে ঃ—

(ক) গৃহ নির্মাণের জন্য একটি তহবিল গঠন। কিভাবে তার টাকা তোলা হবে এবং যে সব ক্ষেত্রে মালিক তার শ্রমিকদের জন্য বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে সে বিষয়ে বিচার বিবেচনা করা,

(খ) বাড়ির জন্য শ্রমিকরা কিভাবে ভাড়া দেবে তা ঠিক করা,

(গ) শ্রমিকদের জন্য বাড়ির ন্যূনতম মান কি হবে তা ঠিক করা,

(ঘ) শ্রমিকদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণের জন্য সরকার মালিক ও শ্রমিকদের কাছ থেকে অথবা অন্য কোনওভাবে যে অর্থ পাওয়া যাবে তা সঠিক কাজে লাগানো। এবং

(ঙ) শ্রমিকদের বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্র, প্রদেশ অথবা স্থায়ীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে তা খতিয়ে দেখা।

এই উপসমিতিতে থাকবেন কেন্দ্রীয় সরকারের এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির দুইজন করে সদস্য। এছাড়া থাকবেন দেশীয় রাজ্যগুলির দুইজন প্রতিনিধি এবং মালিক ও শ্রমিকদের তিনজন করে প্রতিনিধি সেই সঙ্গে পুরসভা ও পুর কর্মীদের প্রতিনিধি।

সবেতন ছুটি

স্থায়ী শ্রম কমিটির সবেতন ছুটি নিয়ে আলোচনা হয়। ১৯৪৫ সালের সংশোধিত

কারখানা সংক্রান্ত এই আইন কেন্দ্রীয় সরকার সাময়িকভাবে তৈরি করে। শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত এই আইন সংশোধনের জন্য সাধারণভাবে মতৈক্য হয়। ঐ আইনে শ্রমিকদের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় এবং মালিক চারশো টাকা পর্যন্ত বেতনের শ্রমিকরা এই আইনের আওতায় আসে।

এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের প্রতি বিধিবর্গ, দেশীয় রাজ্য, বণিকসভা, শিল্প মালিক সংগঠন, ভারতের শিল্প মালিক সংঘ, সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, ভারতীয় শ্রমিক মহাসংঘ এবং অন্যান্য মালিক ও শ্রমিক প্রতি-নিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

□ □ □

৫২

শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব

২৬শে নভেম্বর নতুন দিল্লিতে সপ্তম শ্রম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলন পরবর্তীকালে ভারতীয় শ্রম সম্মেলন নামে কথিত হয়। ভারত সরকারের মাননীয় শ্রম সদস্য ড: বি. আর. আম্বেদকর ঐ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি শ্রমিকদের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আইন প্রনয়ণ করে ভারতীয় শ্রমিকদের মান আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার কথা বলেন। শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে বৃটেনের রয়াল কমিশনের সুপারিশের এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের (আই এল ও) অনুমোদনের ভিত্তিতে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে ড: আম্বেদকর বলেন, প্রকৃতপক্ষে এখন কেবলমাত্র ১০টি সুপারিশের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ বাকী। অন্যদিকে ৬৩টির মধ্যে ১৯টি অনুমোদন দিতে ভারতের বাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রম সদস্য জানালেন যে, এটি যে ভারত সরকারের অনিচ্ছার জন্য হচ্ছে না তা নয়, এর কারণ হল প্রয়োজনীয় আইনের অভাব, যে আইন অনুযায়ী কোনও প্রকার পরিবর্তন বা সংশোধনী ছাড়া অনুমোদন করা যায় না। শ্রম সদস্য বলেন এরজন্য আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনকে একটি খসড়া তৈরি করতে হবে।

উপস্থিত জনসাধারণকে সম্বোধন করে ড: আম্বেদকর বলেন। "আমি নিশ্চিত যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখে সকলেই খুব খুশি। এর জন্য আমাদের ছয় বৎসর ধরে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছে। এরজন্য অসংখ্য জীবনহানি এবং প্রভূত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া এই কাজে সফলতার জন্য মানুষের যে কত দুঃখ কষ্ট হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। তবে আমাদের কাছে এখন বড় স্বস্তির কথা এই যে আমাদের সামনে এখন যুদ্ধের সমস্যা নেই, এই যুদ্ধের সমস্যার জন্য আমাদের স্বল্প সময়ে অনেক কিছুর জন্য তৈরি থাকতে হতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের সব উৎকন্টার শেষ হয়েছে। কিন্তু আপনারা সবাই জানেন যে, যুদ্ধের সমস্যা যদিও এখন আমাদের সামনে নেই, আমাদের সামনে আছে শান্তির সমস্যা যেমন মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠন। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এটি যেমন একটি বড় সমস্যা ভারতেও তা কিছু কম নয়।

রাষ্ট্রের দায় দায়িত্ব

"এইসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেমন শ্রমিক কল্যাণ এবং শ্রমিক ও অর্থের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েই এই সম্মেলন সংশ্লিষ্ট। সম্মেলনের সামনে করণীয় কি তা জানার জন্য আমি মনে করি ; আমাদের প্রয়োজন একটা হিসাব নিকাশের। তাহলে আমরা জানতে পারব কতটা কাজ করা হয়েছে আর কতটা বাকী। কারণ আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব।"

"হিসাব নিকাশের উদ্দেশ্যে আমি আমাদের দায়বদ্ধতা দিয়ে শুরু করতে চাই। দুটি আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আমাদের দায়িত্ব হিসাব করতে পারি। প্রথমত আমরা এর ধারণা করতে পারি শ্রমিক সম্পর্কে রয়াল কমিশনের সুপারিশ থেকে। ১৯৩০ সালে এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের দায়বদ্ধতার দ্বিতীয় উৎস হল আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সম্মেলন। ভারত প্রথম থেকেই এই সম্মেলনের সদস্য।"

"শ্রমিক সম্পর্কে রয়াল কমিশন মোট ৩৫৭টি সুপারিশ পেশ করে। এটি একটি বিরাট তালিকা। এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় শ্রমিক আইনের ব্যাপারে ১৯২৯ সালে ভারত অন্য দেশগুলির তুলনায় কতটা পিছিয়ে ছিল। এই ৩৫৭টি সুপারিশের মধ্যে ১৩৩টি পুরোপুরি বা আংশিকভাবে আইনের সঙ্গে যুক্ত। ১৩৩টির মধ্যে ১২৬টি সরকার গ্রহণ করেছেন এবং ১০৬টিকে কার্যকর করা হয়েছে এবং মাত্র ২০টি পড়ে আছে। এই ২০টির মধ্যে দশটি কারখানা সংক্রান্ত। এগুলি নিয়ে কারখানা আইনের ৫নং ধারায় প্রদেশগুলির হাতে ইতিমধ্যেই স্বাধীন ক্ষমতা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে মাত্র ১০টি সুপারিশ বাকী পড়ে আছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদের দায় দায়িত্ব অত্যন্ত কম।"

"আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সম্মেলন—এখন দেখা যাক আমাদের দায়বদ্ধতার দ্বিতীয় উৎস নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যায়। দেখা যায় ১৯১৯ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা মোট ৬৩টি বিধি-নিয়ম পাশ করেছে। এবং ভারত এ পর্যন্ত ১৪টি অনুমোদন করেছে আর ১৯টি করতে এখনও বাকী।"

"আপনারা লক্ষ্য করুন, কি করে ভারসাম্য বজায় থাকে। আমাদের রয়্যাল কমিশনের হিসাব আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের হিসেবের থেকে ভাল। এর কারণ হল রয়্যাল কমিশনের সুপারিশ ভারতীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অন্যদিকে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সুপারিশ সব দেশের কথা ভেবেই।"

"অতএব দেখা যাচ্ছে, কমিশনের ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ কোনও দায়বদ্ধতা বাকি নেই। কিন্তু কনভেনশন নিয়ে আমাদের দায়বদ্ধতা ব্যাপক। এর মধ্যে যেগুলি অনুমোদিত হয় নি তার কয়েকটি রয়েছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি নিয়ে আমাদের সতর্ক পরীক্ষা-নিরিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আমাদের শ্রমিকদের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। এই মান নির্ধারণ করতে হবে জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে হবে আন্তর্জাতিক মানের।"

"এই সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার দ্বারা আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আইন তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি বাকি আছে। আমার বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে। আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে সরে যাব না আমার এই কথার সঙ্গে আমি নিশ্চিত আপনারা একমত হবেন। আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে সরে যেতে পারি না। বিশ্বের জনমত আমাদের তা দেবে না।"

"আমাদের দায়িত্বকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমি বিষয়টিকে একটি ইস্যু করতে পারতাম। কারণ আমাদের দেশে শ্রম আইনের উপযোগিতা ও গুরুত্ব নিয়ে অনেক কিছু শোনা যায়। কেউ কেউ বলে থাকেন আমাদের ব্রিটিশ আইন অনুসরণ কর উচিত। একথা বলা হয়ে থাকে বর্তমান ব্রিটিশ আইন তৈরির আগে তারা এক শতাব্দী অপেক্ষা করেছিল। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন ভারতীয় শিল্পের জন্য আইন তৈরির পিছনে অর্থ ব্যয় অর্থহীন, কারণ এটি এখন একেবারেই প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। তারা এব্যাপারে রাশিয়ার উদারহণ দিয়ে থাকেন। সেখানে শিল্প বিকাশের স্বার্থে শ্রমিকদের অত্যন্ত নিচু মানের জীবনযাপন গ্রহণ করতে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, শ্রমিক আইন কার্যকর করার জন্য এদেশে উপযুক্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি, এবং এক্ষেত্রে আইন তৈরি অর্থহীন। আইন করলে তার প্রয়োগ হবে না। এছাড়া আরও একটি কথা বলা হয় এবং তাহল ভারত হল দরিদ্রদেশ এবং এদেশে শ্রমিকদের উচ্চমানের জীবন যাত্রার কথা চিন্তা করা বিলাসিতার সামিল।"

শ্রম আইন

"এইসব যুক্তি বিশ্বাজনমতকে সন্তুষ্ট করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত নই। শ্রম আইন প্রনয়ণের বিষয়টি স্থগিত রাখার জন্য এইসব যুক্তি খাড়া করা যায় এবং শ্রমিকরাও একে মর্যাদা দেবে কিনা তাও একটি সংশয়।"

"শ্রমিকরা একথা বলতে পারে বৃটিশ শ্রম আইন তৈরি করতে যখন একশো বছর সময় লেগেছিল কিন্তু আমাদের একশো বছর লাগবে কেন? অন্য দেশের

ভুল ত্রুটি অনুকরণ করার জন্যই কেবল মাত্র ইতিহাস পড়া হয় না। আমরা ইতিহাস পড়ি মানুষের ভুল কিভাবে দূর করতে হয় তা জানতে। ইতিহাস সর্বদা উদাহরণ হতে পারে না, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটি সতর্কীকরণ।"

"শ্রমিকরা অবশ্য বলতে পারেন, কোনও দেশের শ্রমিকদের মান নির্ধারণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য রাশিয়ার উদাহরণ একেবারেই আনা উচিত নয়। কারণ এদেশে শিল্প একটি ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং তা পরিচালনা করা হয়, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য, অন্যদিকে রাশিয়ায় শিল্প হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাভুক্ত এবং ঐ শিল্পের মুনাফা জমা হবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে, কোনও শক্তি মালিকের ঘরে ঐ লাভ যায় না। লাভের অঙ্ক যেখানে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় সেখানে দেশের মানুষকে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য কম মজুরি নিতে বলা যায় এবং শিল্পগুলি যাতে স্থায়িত্ব পায় সেজন্য দেশের মানুষকে আরও ত্যাগ স্বীকার করতে বলা যায়। কোনও শ্রমিকই তাতে কিছু মনে করে না কারণ তারা জানে তাদের এই স্বার্থত্যাগ রাষ্ট্রের অনুকূলে যাবে এবং রাষ্ট্রের উন্নতিতে তার অংশ থাকবে। কিন্তু যে দেশে শ্রমিকদের স্বার্থত্যাগের অর্থ যাবে ব্যক্তিগত মালিকের ঘরে সেখানে শ্রমিকদের মজুরি কম করার কথা বলা যায় না। আমি নিশ্চিত এই যুক্তি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।"

শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল

"শ্রমিক আইনকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের উপযুক্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো নেই এই যুক্তি ধোপে টেকে না। শ্রমিকরা বিভিন্ন বিষয়ে এব্যাপারে হতে পারে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকারের বিরাট পুলিশ বাহিনী আছে। কর সংগ্রহ করার জন্যও সরকারের আছে রাজস্ব আধিকারিক। সুতরাং শ্রমিকরা বলতে পারে শ্রমিক আইন করার জন্য সরকার কেন উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী রাখেন না? সরকারের একমাত্র কাজ কি, কর সংগ্রহ করা এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়া? শ্রমিকদের চাকরির শর্ত ঠিক করার ব্যাপারে সরকারের কি কোনও ভূমিকা থাকবে না? সভ্য জীবন যাপনের জন্য এটি প্রয়োজন। এটি যদি সরকারের কাছে অবশ্য করণীয় হয় তাহলে তারজন্য কি উচিত নয় উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা? কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের ব্যবস্থা বড় বেশি দুর্বল।"

"শ্রম আইন করার জন্য যে অর্থ খরচ হবে তা একটি বড় বোঝা—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং শ্রমিকদের তা মনে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে এই যুক্তির

পিছনে বিশ্বাস যোগ্যতা কতখানি তা দেখা দরকার। এই যুক্তি কি গ্রহণযোগ্য? না এটি দায়িত্ব এড়ানোর অজুহাত? শ্রমিকরা অবশ্যই বলতে পারেন, এই খাতে খরচের যুক্তি দেখানো নেহাৎই দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন দেখা যায় যুদ্ধের পিছনে প্রচুর খরচ হচ্ছে। আমরা সবাই জানি যুদ্ধের জন্য কি বিরাট পরিমাণে অর্থ ব্যয় হচ্ছে এবং যুদ্ধের ব্যয় ভার বহন করার জন্য ধনী ব্যক্তিদের উপর কি বিরাট করের বোঝা চাপানো হচ্ছে।"

"শ্রমিকরা রাষ্ট্রনেতাদের কাছে আরও প্রশ্ন তুলতে পারেন গৃহচ্যুত মানুষকে ঘর দেওয়া হয়েছে, কতজন দুঃস্থকে তাদের পরনের কাপড় দেওয়া হয়েছে। কতজন নিরন্ন নারী পুরুষকে খাবার দেওয়া হয়েছে, কতজন নিরক্ষরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কতজন অসুস্থ মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে? যুদ্ধের জন্য যদি অর্থ ব্যয় হতে পারে তাহলে জনকল্যাণেও হওয়া উচিত ছিল। ধনী ব্যক্তিদের কাছে শ্রমিকরা আরও একটি প্রশ্ন তুলতে পারে যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর জন্য ধনী ব্যক্তিদের কর দিতে যখন আপত্তি হয় না। তখন শ্রমিকদের জীবনযাপনের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাদের আপত্তি হয় কেন? আমি জানি এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়।"

কি কি শ্রম আইন পাশ হতে বাকি আছে আমি তার একটি হিসাব দিয়েছি। কেন আমরা এড়িয়ে যেতে পারিনা তাও দেখিয়েছি। একথা যদি ঠিক হয় তাহলে যে বিরাট আলোচ্যসূচি আপনাদের কাছে পেশ করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনও কারণ দেখি না। আলোচ্যসূচিতে আটটি বিষয় আছে। এর মধ্যে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে দ্বিতীয়টি এতে কাজের সময় কম করার কথা বলা হয়েছে। তিন নম্বর আলোচ্যসূচিতে সর্ব মিশ্র মজুরি আইন এবং আট নম্বর সূচীতে শ্রমিক ইউনিয়নকে স্বীকৃতিদানের কথা বলা হয়েছে।

□ □ □

৬০

*শ্রমিকদের কল্যাণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রমিক সদস্য): মাননীয় সভাপতি, মাননীয় সদস্যের আনা এই কাটতি প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাঁর দেওয়া নোটিশ থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। বেকার ত্রাণ ব্যবস্থা, যথেষ্ট পরিমাণে মহার্ঘ ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে বিধান পরিষদের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করতে চান। এ সম্পর্কে প্রথমেই যে মন্তব্য আমি করতে চাই তা হ'ল যে, এই কাটতি প্রস্তাব যদি শ্রমিক সাধারণের জন্য হ'ত তাহ'লে তার ভিত্তিও পৃথক হ'ত বলে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সভায় দেখা যাবে যে, এই কাটতি প্রস্তাব শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারিদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। এবং সাহসে ভর করে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই কাটতি প্রস্তাবটির এটি একটি গুরুতর ত্রুটি। এই কাটতি প্রস্তাবের মাননীয় উত্থাপকের এটাই ইচ্ছে অথবা কামনা কি'না জানিনা যে, তিনটি বিষয়ের উল্লেখ তিনি করেছেন। সেগুলি সম্পর্কে ভারত সরকারের এমন নীতি নির্দ্ধারণ করা উচিত। যা'তে অন্য কোনও কারণে নয়, শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিশেষ সুবিধাভোগী একটি শ্রমিক শ্রেণীর এদেশে সৃষ্টি হয়।

এদেশে, শুধুমাত্র সরকার-ই শ্রমিকের নিয়োগকর্তা নয়। বেসরকারি নিয়োগকর্তারাও বহু সংখ্যায় শ্রমিক নিয়োগ করেন। এই সভার সকলেই নিশ্চয়ই মানবেন যে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য ভারত সরকারের এমনভাবে নীতি নির্দ্ধারণ করা উচিত নয় যা'তে একদিকে কোনও সুবিধাভোগী শ্রেণীর দিকে সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কেবলমাত্র শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা নয়। এটি একটি রাষ্ট্র। সাধারণ ভাবে শ্রমিকদের প্রতি এ'র একটা দায়িত্বও রয়েছে। (P340) অতএব যদি প্রস্তাবের মাননীয় উত্থাপকের আনা এই সমস্ত অভিযোগগুলি ভারত সরকারের নিষ্পত্তি ক'রতে হয়, তাহলে ভারত সরকারের

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১১ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২১৩৮-৪০।

ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব হ'ল এমন ভাবে নীতি প্রণয়ন করা যাতে তা সাধারণ ভাবে শ্রমিকদের উপকারে আসে— কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিকের উপকারে নয় নয়।

এখন, স্যার মাননীয় সুহৃদ উল্লেখ ক'রেছেন যে, ভারত সরকার তার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীর জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ভাতা ও বেতন রেখেছেন। আমি স্বীকার করি, আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে এ ব্যাপারে অবহিত, কিন্তু আমি যা জানতে চাই তা হ'ল — বেতনক্রমের এই স্তর মূল বেতন। মহার্ঘভাতা, আনুতোষিক এবং অন্যান্য যেসব অতিরিক্ত ভাতা যা ভারত সরকারের অধীনস্থ কর্মীরা আজ পাচ্ছেন তার বিন্যাসের দায়িত্ব কার? বলতে দ্বিধা নেই — এর মূল দায়িত্ব হ'ল শ্রমিক নেতৃবৃন্দের। এখানে র'য়েছে রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশন। রেলওয়েমেনস্ ফেডারেশনের নীতি কেউ যদি লক্ষ্য করে থাকেন, তাহ'লে আমার মনে হয় তিনি আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তা নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ফেডারেশনের নিয়ন্ত্রণে এমন এক গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যাবশ্যক এবং জীবনযাত্রা নির্ভরশীল আর তারা তাদের সেই অবস্থানকে ব্যবহার করে রেল দফতরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কিছু সংখ্যক সুবিধার দাবি জানাতে থাকে। আমি একথাও বলতে পারি যে, তারা বিধানসভার কিছু সংখ্যক সদস্যের তাদের বিষয়ে উৎসাহী করে তুলতে পারে এবং একটি দলীয় চক্রীর মনোভাবের উদ্ভব হয় যা অন্য সব স্বার্থের প্রতি অন্ধ এবং শুধুমাত্র রেল শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায়ের প্রতি মনোযোগী হয়। রেলের কর্মীরা খোলাখুলি ভাবে ঘোষণা না করলেও, মনে করে যে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারের যেকোনও শ্রেণীর কর্মীদের চেয়ে উঁচুতে থাকে। যদি ডাক বিভাগকে এমন কিছু দেওয়া হয় যার ফলে রেলকর্মীদের বেতনক্রমের সঙ্গে ডাক বিভাগের কর্মীদের বেতনক্রম এক হয়ে যায়, তাহ'লে রেলকর্মীরা তখনই সঙ্গে সঙ্গে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে — তারা বলে যে, প্রথা ব্যবহার অথবা পদমর্যাদা সুবিধার যে ব্যবধান গড়ে তুলেছে তার আবার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাতে তাদের সুবিধাভোগী পদমর্যাদা রক্ষিত হয়। এ ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং শ্রম দপ্তরের মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে কঠিন হয়ে পড়েছে। আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন অথবা বলা যায় পরামর্শ দিয়েছেন যে শ্রমদফতরের কোনও সালিসি পর্ষদ গঠন করা উচিত হলেও তা করছেন না কিন্তু, নির্দ্ধারিত সংখ্যক ক্ষেত্রে সালিশি পর্ষদ গঠন করা কি সুবিধা হবে কারণ প্রতিটি বিরোধ-ই বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা হবে। তাদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক থাকবেনা। ফল হবে বিশেষ

উদ্দেশ্যে গঠিত পর্ষদ, বিশেষ উদ্দেশ্যে দেওয়া প্রতিবেদন, বিশেষ উদ্দেশ্যে নেওয়া সিদ্ধান্ত যা বিশেষ উদ্দেশ্যই সাধন করবে। ফলে, সব সময়েই এক বিপথগামী বৈষম্যের সৃষ্টি হবে। অতএব যে পরিস্থিতি এখন রয়েছে তা সব সময়েই সম্পূর্ণভাবে এই দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে, বিশেষতঃ ভারত সরকারের অধীনস্থ শ্রমিকশ্রেণীকে ভুল ভাবে সংগঠিত করার ফল বলেই আমি মনে করি। ভারত সরকার সম্প্রতি একটি বেতন কমিশন গঠনের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা, যে, সুচিন্তিত সে সম্পর্কে আমি মনে করি এই সভা একমত হবে; কারণ এই কমিশন এই দেশে সমগ্র বেতন কাঠামোর প্রশ্নটি এবং ভারত সরকারের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মীদের বেতনের সঙ্গে বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রে যে বেতন চালু আছে তার সম্পর্কে খতিয়ে দেখবে। আশা করি এই কমিশনের কাছ থেকে কয়েকটি সুপারিশ আমরা পাব যার ভিত্তিতে এই দেশের বেতন ব্যবস্থায় সমতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে, যাতে সকলেই বেতনের মূল নীতিগুলি সম্পর্কে অবহিত হবে। আমি মনেকরি অপর সমস্যা হ'ল ভারত সরকারের রাজস্ব আদায়কারী সংস্থাগুলিতে কর্মরত অধিকাংশ কর্মী মনে করেন যে, তাঁর দপ্তরের অর্জিত রাজস্বে তাদেরই প্রথম অধিকার। রেলকর্মীরা মনে করেন। যেহেতু রেল লাভজনক সংস্থা অতএব রেলের অর্জিত লভ্যাংশ থেকে, অন্যদের চেয়ে বেশি তাদেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। যদি ডাক বিভাগের কর্মীরা দেখেন যে ডাক দপ্তর লাভ অর্জন করেছে, তারাও দাবি করেন যে তাঁদের দপ্তরের অর্জিত রাজস্বে তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে, তাঁদেরই প্রথম অধিকার। অতএব, মহাশয়, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি আমি এইমত পোষণ করতে পারিনা এবং আমি সব সময়েই এর বিরোধিতা করব। ভারত সরকারের অর্জিত রাজস্ব — তা করের মাধ্যমেই হোক অথবা বাণিজ্যিক সংস্থার দ্বারাই অর্জিত হোক — তা ভারত সরকারের রাজস্ব। তা ভারত সরকারের কোনও একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের রাজস্ব নয়। তা ভারত সরকারের কোনও একটি বিশেষ দপ্তরের রাজস্ব নয়। তা হ'ল ভারত সরকারের রাজস্ব, এবং সমস্ত সাধারণ মানুষেরই তাঁর ওপরে দাবি আছে। এবং যতদিন আমি শ্রম দফতরের দায়িত্বে থাকব। আমি যেকোনও শ্রেণীর কর্মীর এ ধরণের দাবি অর্থাৎ যেহেতু তাঁর দফতর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে অতএব এর ওপর তাঁদেরই সর্বপ্রথম অধিকার — আমি প্রতিরোধ করব। এ ধরণের দাবি নিশ্চিতভাবে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে এবং আমিও নিশ্চই তার অংশীদার হব না।

এখন মহাশয়, এই কাটতি প্রস্তাবের উত্থাপক আমার বন্ধুটি বেকারির প্রশ্নও তুলেছেন। আমি তাঁর তোলা নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করবনা, কিন্তু আমি সাধারণ ভাবে বেকারদের ত্রাণ সাহায্যের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব এবং আমি নিঃসন্দেহ যে ত্রাণের যুক্তিই সবচেয়ে ভ্রান্ত যুক্তি। বেকারির একমাত্র ত্রাণই হল কর্ম সংস্থান, এছাড়া, অন্য কোনও ত্রাণই নয়। বেকারির সংখ্যা কম হলেই কেবলমাত্র ত্রাণ সাহায্য সম্ভব যখন তা কেবলমাত্র পুচ্ছ, সমগ্র দেহ নয়। সকলেই জানেন, এই দেশের পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশ বেকার এবং তাঁদের জন্যে আমাদের কর্ম সংস্থান করতে হবে। এই পঞ্চাশ থেকে ষাট শতাংশের বেকারি ত্রাণের সাহায্যে ঘুচিয়ে দেবার কথা কেউ যদি বলেন এবং রাষ্ট্রও যদি সেই দায় বহন করতে রাজি হয় তাহলে দেশ যে, ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে এ ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ। অতএব আমার বন্ধুবরকে একমত হতেই হবে যে, অধিকতর শিল্পায়নের পথেই ত্রাণের সন্ধান করা উচিত। কেবলমাত্র দ্রুত এবং অধিকতর শিল্পায়ন-ই আমাদের বেকারত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে। এবং এই সভা এ সম্পর্কে অবহিত যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পরিকল্পনা রচনা করেছে এবং শিল্পায়ন সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। অতএব এই বিষয়ে আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করবনা কিন্তু সাধারণ ভাবে ভারত সরকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দেশের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা যোগাবার ক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমি এই সভাকে জানাতে চাই।

ভারত সরকার ইতিমধ্যেই যে শ্রম-সংক্রান্ত নীতি ঘোষণা করেছেন, তা এই সভার মাননীয় সদস্যারা জানেন। যে অংশে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তা পড়ে শোনাবার আমার সময় নেই। পর্ষদের পুণর্গঠন কমিটির ভাগ XXV-এর পঞ্চান্ন এবং ছাপ্পান্ন পাতায় এই তথ্য দেওয়া আছে। অতএব কেউ বলতে পারবেন না যে সরকারের এ ব্যাপারে কোনও লক্ষ্য নেই। আমাদের নিশ্চয়ই আছে, এবং আমরা সেই লক্ষ্য জানিয়ে দিয়েছি। আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে বলতে চাই যে ভারত সরকার সেই লক্ষ্য ঘোষণা করেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে এক কর্ম পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। কর্ম পরিকল্পনা সম্পর্কে সভাকে জানাই যে ভারত সরকার সারা দেশের শ্রমিকদের অবস্থার সমীক্ষার উদ্দেশ্যে, দু'বছর আগেই একটি তথ্য অনুসন্ধানকারি কমিটি গঠন করেছে। এ পর্যন্ত আমরা কমিটির কাছ থেকে, ৩৪টি বিভিন্ন শিল্পের ওপর ৩৪টি প্রতিবেদন পেয়েছি, এছাড়া সবকটি নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের ওপর একটি সাধারণ প্রতিবেদনও প্রস্তুত করা হয়েছে। এর মধ্যে, ১৮টি ইতিমধ্যেই মুদ্রিত হয়েছে এবং অন্যান্যগুলি মুদ্রণ

সংস্থার কাছেই রয়েছে। শিল্পক্ষেত্রের শ্রমিকদের সাধারণ অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে এই সমীক্ষা ছাড়াও ভারত সরকার শ্রমিকদের স্বাস্থ বীমা সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আধারকরকে স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করেছে। যে কথা বলেছিলাম — আমাদের শুধুমাত্র উদ্দেশ্যেই নেই — আমাদের পরিকল্পনাও রয়েছে, এবং আমাদের কাছে এমন তথ্য রয়েছে যার ওপরে ভিত্তি করে সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনও পরিকল্পনা রচনা করা যায়। ভারত সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ হ'ল সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কে কি'ভাবে পরিকল্পনা নেওয়া যায়। সভার অবগতির জন্যে জানাই 'যে, এ ব্যাপারে দু'টি মতবাদ র'য়েছে। একটি মত হল — অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো আমাদের পর্যায়ক্রমে, ধাপে ধাপে এ কাজ করা উচিত প্রতিটি নিরাপত্তাহীনতার বিষয় নির্দিষ্ট ভাবে গ্রহণ করে এবং সেই নিরাপত্তাহীনতার ক্ষেত্রে ত্রাণ সাহায্য দেবার উদ্দেশ্যে একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অপর মতবাদটি বেভারিজ পরিকল্পনায় অনুপ্রাণিত, যে মত অনুযায়ী একটি পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা নীতির সাহায্যে সব বীমার ক্ষেত্রগুলিকেই এক ঝটকায় আওতাভূক্ত করতে প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি কোনওভাবেই এই বিষয়টিকে দেখতে চাইনা এবং কোনটি ভাল হবে তাও বলতে চাইনা। ভারত সরকার প্রস্তাব করছে যে, কোন পদ্ধতি অনুসারে অগ্রসর হওয়া উচিত—ধাপে, ধাপে অথবা বেভারিজ রিপোর্টে বিধৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে ব্যাপারে সমস্ত প্রতিবেদনগুলির পর্যালোচনার পর ভারত সরকারকে পরামর্শ দেবার উদ্দেশ্যে, একটি কমিটি বা ঐ ধরণের কিছু গঠন করার জন্য। এই যে সমীক্ষা আমি পেশ করলাম, তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বলে আমি মনে করছি। বিস্তারিত ভাবে বলার আমার কোনও অবকাশ ছিলনা; এই সমীক্ষা এই সভার কাছে প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে যে কাটতি প্রস্তাবের মাননীয় উত্থাপক যে অভিযোগ এনেছেন — অর্থাৎ প্রশাসনিক পরিষদে আত্মতুষ্ট, উদাসীন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি তা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন এবং আমি আশাকরি সভা তার আনা কাটতি প্রস্তাব গ্রহণ করবেনা।

□ □ □

৬১

*মুসলমানরা শ্রম-দফতরেই বেশি উন্নতি করেছে

মাননীয় সভাপতি: এখন শ্রী জাফরের আনা কাটতি প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক আবার শুরু হচ্ছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য): মাননীয় সভাপতি, অনেক সদস্যেরই নিশ্চয়ই মনে আছে যে, শ্রম দফতরকে উদ্দেশ্য করে অনেক ঢিলই ছোঁড়া হয়েছে........

নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান (মীরাট ডিভিশন, মুসলমান গ্রামীণ) — ইঁট, ঢিল নয়.....

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : অথবা ইঁট ছোঁড়া হয়েছে এই কাটতি প্রস্তাব আনার আগের সপ্তাহেই। আমার দপ্তরের চাকরিতে মুসলমানদের অবস্থান জানাতেই এখন আমাকেও উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে। গতকাল যে দু'জন বক্তা এই কাটতি প্রস্তাবের ওপর ভাষণ দিয়েছিলেন। আমি তাদের কাছে প্রায় এক ধারা বিবরণী শুনেছিলাম। তাঁরা ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত মুসলমানদের এক পরিসংখ্যান দিয়েছিলেন। আমি একথা না বলে পারছিনা যে, যখন আমি সেই বিবরণ শুনছিলাম তখন আমি গর্ব অনুভব করছিলাম এই ভেবে যে বক্তাদের বিবরণে প্রকাশিত তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারের অন্যান্য দফতরের তুলনায় শ্রম দপ্তরের অধীনে কর্মরত মুসলমান কর্মীরা অনেক উন্নতি করেছে। এ কোনও মিথ্যা অহঙ্কার নয়। কিন্তু তাঁর প্রতি যে তথ্যের সমর্থন রয়েছে, তাই আমি আজ যতোটুকু সময় অধিকার করে থাকব তাতে জানাব। ভারত সরকারের শ্রম দফতরের কেবলমাত্র শ্রম বিভাগ নয় পূর্ত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীদের পরিসংখ্যান আমি যোগাড় করেছি খুব কষ্ট করে। যে পরিসংখ্যানে দেখা যায় সম্প্রদায়গুলির অবস্থান কি, মুসলমান এবং অন্যান্য

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৩, ১৪ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৪০৬।

সংখ্যালঘুদের অবস্থান কি? কিন্তু আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমার যা সময় রয়েছে তার মধ্যে, এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে তুলে ধরা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অতএব কেবলমাত্র মুসলমানদের পরিসংখ্যানই আমি দিচ্ছি — কেবলমাত্র সমষ্টি নয়, শতাংশের হিসেবও দেব — যা তে মুসলমান লীগ দলের সদস্যারা সঠিক অবস্থান জানতে পারেন।

শ্রম দফতরের সচিবালয়ের সাম্প্রদায়িক গঠন প্রকৃতি দিয়ে আমি শুরু করছি — আর তা করতে গিয়ে আমি কেবলমাত্র পরিসংখ্যানই দেবনা, পরিসংখ্যানগুলি তুলণামূলক ভাবে দেব। আমি মনে করি এই তুলণামূলক ভিত্তি অত্যন্ত প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আমি এই নিয়মের কার্যকারিতা যা বুঝতে পেরেছি তাতে বলা যেতে পারে যে এ হ'ল কিছুটা লক্ষ্যভেদ করার মতো নিশানায় আছে একটি কেন্দ্রবিন্দু বা বুলস্ আই, একটি অন্তর্বর্তী বৃত্ত এবং একটি বাইরের বৃত্ত। শতাংশের হিসাবে নিঃসন্দেহে বুলস্ আই। কিন্তু ভারত সরকারের কোনও সদস্যই, তাঁর ব্যক্তিগত পক্ষপাত যাই হোক না কেন, তিনি এমনভাবে তাঁর অধীনস্থ সেবাগুলিকে সাজাতে পারবেন যা'তে প্রত্যেক বারেই লক্ষ্যভেদ করে একেবারে "বুলস্ আই"-তে লক্ষ্যভেদ করতে পারবেন বলে আমি মনে করিনা। আমি বলতে চাই যে, কোনও সম্প্রদায়কেই কেন্দ্র থেকে ঠেলে সরিয়ে যাতে দেওয়া না হয় তার দিকে নজর রাখতে প্রত্যেক সদস্যেরই সচেষ্ট থাকা উচিত; অতএব বিশেষ দফতরের কাজের ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেবার আগে প্রশ্ন হল যে, সেই দফতরের কোনও বিশেষ শ্রেণীর কর্মীর অবস্থানের উন্নতি হয়েছে না অবনতি এবং আমি মনে করি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি তুলণামূলক বিবৃতিই বিষয়টি খতিয়ে দেখার সঠিক উপায়।

১৯৩৯ এবং ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসের সব পরিসংখ্যানই আমি যোগাড় করেছি। আমি বলেছি যে, আমি প্রথমেই শ্রম দপ্তরের সচিবালয়ের পরিসংখ্যান দেব। ১৯৩৯ সালে গেজেটেড পদ ছিল বারো এবং তাতে মুসলমানদের অনুপাত ছিল আট শতাংশ। ১৯৪৬ সালে গেজেট ভুক্ত পদের সংখ্যা হল ৮০ এবং মুসলমানদের অনুপাত হল ২০ শতাংশ। এবার আমি গেজেট বহির্ভূত পদের হিসেব দেব। ১৯৩৯ সালে মোট পদের সংখ্যা ছিল ৭৫ এবং মুসলমানদের অনুপাত ছিল ২৩ শতাংশ। ১৯৪৬ সালে মোট পদের সংখ্যা হল ৪৫৭ এবং মুসলমানদের অনুপাত ২৪ শতাংশ।

এখন আমি বহু কথিত পূর্ত বিভাগের প্রসঙ্গে আসব। ১৯৩৯ সালে পূর্ত বিভাগে মোট গেজেট ভূক্ত পদের সংখ্যা ছিল ৪৩, তার মধ্যে মুসলমানদের

অনুপাত ছিল ২১ শতাংশ। ১৯৪৬ সালে পদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১৮১, এবং অসুবিধে সত্ত্বেও আমার মাননীয় বন্ধু স্বরাষ্ট্র সদস্য মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থায় সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষার বিষয়ে, মুসলমানদের অনুপাত হল ২১.১ শতাংশ। এখন এই কাটতি প্রস্তাবের উত্থাপকের পক্ষে বিষয়টি যথেষ্ট স্বস্তিদায়ক নাও হতে পারে, এবং অতএব ১৯৪৬ সালে পূর্ত দফতরের অনুপাত বার করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেটেড পদ সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে আমি সভার কিছুটা সময় নিতে চাই। সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ারের পদ আছে ১৪টি, আর সেখানে রয়েছেন একজন মুসলমান অর্থাৎ সাত শতাংশ। এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদ আছে ৬৪ মুসলমানদের অনুপাত ১৮ শতাংশ। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের পদ ১২টি মুসলমানদের কোটা ৬$\frac{২}{৩}$ শতাংশ। অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের পদে মুসলমান কোটা ১৪ শতাংশ। অস্থায়ী ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা ৭২ এবং মুসলমান অনুপাত ৩২ শতাংশ। পূর্ত দফতরের বিষয়ে আলোচনার সময়ে আমার জনৈক বন্ধু — কে ভুলে গেছি লোধি রোডের চুক্তির বিষয়টি উল্লেখ করেন....

শ্রী আহমেদ ই.এইচ. জাফর (বোম্বাই সার্দান ডিভিশন—মুসলমান গ্রামীন): আমি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি মনে করি আপনিই। আপনি ঠিক কত পরিমাণ অর্থের উল্লেখ করেছিলেন?

শ্রী আহমেদ ই.এইচ. জাফর : পাঁচ কোটি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ওর অভিযোগ ছিল যে, লোধি রোডের বরাতের ক্ষেত্রে মুসলমান কন্ট্র্যাক্টররা খুব কম অনুপাতে বরাত পেয়েছে। আমি সঠিক সংখ্যাটা ভুলে গেছি।

শ্রী আহমেদ ই.এইচ. জাফর : আমি নির্দিষ্ট ভাবে লোধি রোড কলোনীর কথা বলেছি এবং আরও কত সাধারণ ভাবে রয়েছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর: মাননীয় সদস্য, দিনের শেষ দিকে তাঁর ভাষণ দেন আর আমার পক্ষে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান পাওয়া খুব অসুবিধাজনক ছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান হল এই।

ড: স্যার জিয়াউদ্দীন আহমেদ (যুক্তপ্রদেশ : দক্ষিণ বিভাগ) : এই পর্যায়ে আপনার হস্তক্ষেপের দরকার ছিলনা। আপনি আর কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারতেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধুর উপদেশের জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুসলমান লীগকে তাদের অন্যান্য কাটতি প্রস্তাবগুলির জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া কাম্য বলে আমি মনে করি। এই কারণেই আমি মাঝপথে হস্তক্ষেপ করি। অন্যথায়, সত্যি বলতে কি, এটা সাধারণ প্রস্তাব। হস্তক্ষেপ করার কোনও ইচ্ছে আমার ছিলনা এবং তাঁর প্রয়োজনও ছিলনা। কেবলমাত্র কয়েকজন সদস্যের শ্রম দফতর সম্পর্কে যে ভয় আছে তাদের আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যেই আমি উঠে দাঁড়াই।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : আপনার অশেষ দয়া।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : লোধি রোডের কাজের সম্পর্কে পরিস্থিতি ছিল এই : চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে যে তথ্য দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী মুসলমানরা সব মিলিয়ে ১০.৫ লক্ষ টাকার বরাত পেয়েছে, যে পরিমাণ আমার মাননীয় সুহৃদের দেওয়া অঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : কতোর মধ্যে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তিনি কোটির মধ্যে আমার মাননীয় বন্ধুর নিশ্চয়-ই মনে আছে, এবং তিনি তাঁর বিবেচনায় রাখবেন যে, এইসব কাজের ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন একজন মুসলমান?

শ্রী আহমেদ ই.এইচ. জাফর : মুসলমানদের না দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল, সে ব্যাপারে কি বলেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার বন্ধু বিভিন্ন ধরণের অভিযোগ করছেন। আশা করি, সে সবের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তাঁর রয়েছে। এ সবের প্রতি আমার কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। বন্ধুবর যদি আমাকে তথ্য দেন আমি নিশ্চয়-ই অনুসন্ধান করব।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : আমি আপনাকে সভাকক্ষেই তা দেব।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আসল ঘটনা হল এই যে, এই কাজগুলির দায়িত্বে রয়েছেন একজন মুসলমান এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। দ্বিতীয় কথা হল কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের একজন অফিসার যিনি কাজের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি মুসলমান হোন বা হিন্দু হোন, তিনি যে কোনও সম্প্রদায়ের-ই হোন নাম কেন, তিনি কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের নিয়মে বাঁধা। কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতরের নিয়ম হল, যার টেন্ডার সবচেয়ে কম তাকেই বরাত দেওয়া হবে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে

জানিয়েছেন এবং আমি রাতারাতি অনুসন্ধান করে দেখেছি, এমন কোনও মুসলমান ছিলনা, যার টেণ্ডার সবচেয়ে কম অথচ তিনি বরাত পাননি।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : একটি বৈধতার প্রশ্নে........

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি রাস্তা ছেড়ে দিচ্ছি না। আমার সময় খুব অল্প।

সভাপতি : মাননীয় সদস্যকে বলে যেতে দিন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের এই নিয়ম অর্থাৎ টেণ্ডারে সবচেয়ে কম দাম যিনি দেবেন তিনিই বরাত পাবেন। দুই পক্ষ থেকে দুটি ভিন্ন দিকক যাচাই করা হয়। প্রথম জন হলেন অডিটর জেনারেল — এবং দ্বিতীয় হল গণ-হিসাব কমিটি। দুজনেই, এই নিয়ম যে ভাঙবে, তার কাছে কারণ জানতে চাইবে।

সৈয়দ গুলাম ভিক নৈরঙ্গ : সে তো পোস্ট মর্টেম হবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : প্রশ্ন হল, নিয়ম মানা হচ্ছে কি না।

ড: জিয়াউদ্দীন আহমেদ : নিয়ম কি বদলানো যাবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় সদস্য এ সম্পর্কে অনেক বেশি জানেন। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক কাজ করেছেন। তাঁর পূর্ত বিভাগ এবং এ ধরণের কাজ সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা উচিত। আমি এখন এর ভেতরে যেতে চাইছি না।

এস্টেট অফিসের কথাই ধরি। এস্টেট অফিসে সব মিলিয়ে আটটি গেজেটেড পদ আছে। তার মধ্যে একটি শূন্য। সেখানের অবস্থা হল ছ'জন হিন্দু এবং একজন তফসিলি জাতভূক্ত সেখানে রয়েছেন। সেখানে একজন মুসলমান ছিলেন যাঁকে সম্প্রতি তাঁর নিজের রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। নন গেজেটেড পদের ব্যাপার হল, সেখানে সব মিলিয়ে ২৩৫টি পদ রয়েছে। তার মধ্যে মুসলমানের অনুপাত হল ১৮.২ শতাংশ।

এবারে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির কথায় আসা যাক এবং এখানে আমি একত্রিত ভাবেই পরিসংখ্যান দিতে পারি— প্রতিটি পৃথক পৃথক বিষয় হিসাবে নয়, যা অনেক সময় নেবে। এখানেও ১৯৩৯ সালে অবস্থা ছিল এইরকম। সেখানে সব মিলিয়ে ৬৪টি পদ ছিল। মুসলমানরা ছিল ১.৫ শতাংশ। ১৯৪৬ সালে রয়েছে

১৫৫টি পদ এবং মুসলমানদের অনুপাত ১.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ১১.৫ শতাংশ। এখন সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিতে নন গেজেটেড পদের কথা বলি। ১৯৩৬ সালে সর্বমোট পদের সংখ্যা ছিল ২,২৩৮। মুসলমানদের অনুপাত ছিল ৩৪ শতাংশ। ১৯৩৯ সালে সর্বমোট নন-গেজেটেড পদের সংখ্যা ৩,৯২৯-এ দাঁড়িয়েছে এবং মুসলমানদের কোটা হল ৩০ শতাংশ।

এবারে, স্যার, আমি জিওলজিক্যাল সার্ভের কথা বলব। সভার সকলেই জানেন, জিওলজিক্যাল সার্ভে এ পর্যন্ত ছিল শুধুমাত্র একটি ধাঁচা। কেবলমাত্র যুদ্ধের পরে, ভারত সরকারের যুদ্ধোত্তর উন্নয়নের অন্তর্গত নতুন প্রকল্প হিসাবে জিওলজিক্যাল সার্ভের বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট জিওলজিস্টের ১৩টি স্থায়ী পদে নিয়োগ করে আমরা সম্প্রতি এ কাজ শুরু করেছি। এবারে নিয়োগ সম্পর্কে সত্যিকার পরিস্থিতি আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে জানাবো। আমরা ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই পদগুলি পূরণ করতে বাধ্য, যাঁরা মেধা অনুযায়ী ৪০ জনের নাম সুপারিশ করেছে। আমাদের তার মধ্যে কেবলমাত্র ১৩ জনকে বেছে নিতে হবে। ১৩ জনের মধ্যে একজন মাত্র মুসলমানকেই আমরা কেবল বেছে নিতে পেরেছি।

নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খান : চল্লিশটি নামের মধ্যে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ। নামগুলি মেধা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের ছিল কেবলমাত্র ১৩টি পদ। ঐ তালিকার ১৩ জনের মধ্যে কেবলমাত্র একজন মুসসমান ছিলেন। আমি বলেছি পদগুলি কারিগরি পদ অতএব যোগ্যতা সম্পর্কে আমাদের খুব নিশ্চিত হতে হয়েছিল। যদি শ্রম দফতরের পুরোনো বহাল রাখত যে, তারা কেবলমাত্র ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেধা ভিত্তিক সুপারিশ অনুযায়ীই নিযুক্তি করবে তারা কেবলমাত্র একজন মুসলমান প্রার্থীকেই পেত। কিন্তু শ্রম দফতর মুসলমানদের দৃষ্টিকোণ থেকে তা যথেষ্ট সন্তোষজনক হবেনা বলে তারা ঐ তালিকার নিচের দিকে গিয়ে ঐ তেরো জনের অনেক নিচ থেকে আরও তিন জনকে বেছে নেয়, যাতে মুসলমানদের কোটা পুরণ করে তা ৪-এ দাঁড়ায়। অপর একটি কাজ আমরা যা করেছি তা অনেকেই অন্যায্য বলে মনে করতে পারেন, তা হল : আমরা দেখলাম যে, জিওলজিক্যাল সার্ভের মহানিদেশকের অফিসে কোনও মুসলমান অফিসার ছিলেন না। আমরা কি করলাম। আমরা দু'জন মুসলমান ছাত্রকে বেছে নিলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যার প্রতিনিধিত্ব করছেন মাননীয় বন্ধু স্যার জিয়াউদ্দীন আহমেদ.....

ডঃ স্যার জিয়াউদ্দীন আহমেদ : এর কৃতিত্ব আপনার প্রাপ্য নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তাঁদের ভূ-বিদ্যার প্রশিক্ষণ ছিল না। তাঁরা কেবলমাত্র ভূগোলে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা ঐ দু'জনকে বেছে নিয়েছিলাম। আমরা তাঁদের প্রশিক্ষণ দিলাম যাতে পরবর্তীকালে তাঁদের জিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসে নিয়োগ করা যায়।

এবারে, স্যার, আমি স্কুল অব্ মাইনস্-এর কথায় আসি। গত বিধানসভায় এ সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন উঠেছিল।

স্যার, আমি কি জানতে পারি, আমার আর কতো সময় বাকি আছে?

মাননীয় সভাপতি : মাননীয় সদস্য কুড়ি মিনিট সময় নিতে পারেন। প্রয়োজন হলে আমি তাঁকে আরও বেশি সময় দিতে পারি। তিনি ১টা ১৫ পর্যন্ত ভাষণ দিতে পারেন।

শ্রী শ্রী প্রকাশ (বারাণসী এবং গোরক্ষপূর বিভিগ : অ-মুসলমান গ্রামীন) আপনি ২৫ শতাংশ সময় নিতে পারেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি আমার বন্ধুটির মতো আধা লোকহিতৈষণা এবং আধা-বাচালতার সঙ্গে বিষয়টি দেখতে পারি না।

শ্রী শ্রী প্রকাশ : একেবারেই বাচালতা করি নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্কুল অব্ মাইনস্ এর কথায় আসা যাক, পরিস্থিতি হল এইরকম। ১৯৩৭ সাল থেকে আমরা স্কুল অব্ মাইনস্-এ ভর্তির সংখ্যা ২৪-এ সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম, আসলে, সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০। দেখা গেল এতো বেশি সংখ্যায় ছাত্রের যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান হচ্ছেনা, অতএব, তা ২৪-এ সীমিত করা হল। এখন, কলেজে ভর্তির জন্য মনোনয়ন হল প্রাথমিক ভাবে প্রদেশ-ভিত্তিক, সম্প্রদায়-ভিত্তিক নয়। ষোলটি আসন রাখা হয়েছে প্রদেশগুলির জন্য এবং দুটি ভারতীয় রাজ্যের জন্য আমি ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান যাচাই করে দেখেছি, আমি এমন কোনও বছর দেখিনি যে বছরে অন্ততঃ পক্ষে ২ জন মুসলমান ছাত্র স্কুল অব্ মাইনস্-এ ভর্তির জন্য আবেদন করেনি। অতএব আমি মনে করিনি, স্কুল অব্ মাইনস্-এ যেসব মুসলমান ছাত্র ভর্তি হচ্ছে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্য কোনও সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে। যাই হোক গত আইনসভায় মুসলমান লীগের সদস্যারা বিষয়টি নিয়ে চাপ দিতে থাকলে আমি ইণ্ডিয়ান স্কুল অব্ মাইনস্-এ মুসলমান ছাত্রদের জন্য দুটি আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দিই।

স্যার মহম্মদ ইয়ামিন খান: কটির মধ্যে?

মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর : চব্বিশটির মধ্যে। এখন স্যার, মুসলমানরা যাতে তাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের পুরো কোটা সদ্ব্যবহার করতে পারে, তার জন্য শ্রম দফতর কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে তা আমি এই সভাকে জানাতে চাই — আর আমি এ বছরের পরিসংখ্যান দিতে চাই। এ বছরে, পরিচালকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী আমরা সব মিলিয়ে ৪৮ জন ছাত্রকে ভর্তির অনুমতি দিয়েছি। এই ৪৮ জনের মধ্যে মাত্র একজন মুসলমান ছাত্র যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় সন্তোষজনক ফল করেছে।

মিঃ মুহম্মদ নাওম্যান (পাটনা এবং ছোটনাগপুর সহ ওড়িশা, মুসলমান) তা আমি আপনার কাছে পেশ করেছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কিন্তু, স্যার, সংরক্ষণের সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে, ৫৯-তম স্থানাধিকারি ছাত্র — যে কিনা মুসলমান তাকে বাস্তবিক পক্ষে ১১টি অন্য ছাত্রের দাবি উপেক্ষা করে নেওয়া যেতে পারে বলে আদেশ দেওয়া হয়।

স্যার, এখন আমি শ্রম দফতরের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রকল্পের সংক্ষেপে উল্লেখ করব। এদের কয়েকটি সাগরপারের — আর দেখাব যে শ্রম দফতর শুধু এক্ষেত্রেও শুধু সঠিকই নয় অত্যন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি প্রথমে জিওলজিক্যাল সার্ভের পুণর্গঠনের অঙ্গস্বরূপ গৃহীত। শ্রম দফতরের সহায়তায় অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে সহকারি জিওলজিস্টের প্রশিক্ষণ প্রকল্পের কথা বলব। ১৯৪৬ সালে এই প্রকল্প নেওয়া হয়। ন'জনকে এরজন্য মনোনীত করা হয়। তার মধ্যে ৫ জন হিন্দু, ৩ জন মুসলমান এবং একজন অন্য সম্প্রদায়ের। দেখা যাবে, এই মনোনয়নের ক্ষেত্রে ভাগ ছিল ৩৩ $\frac{১}{২}$ শতাংশ শ্রম দফতরের উদ্যোগে গৃহীত দ্বিতীয় প্রকল্প হ'ল বিদ্যুতের বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক দিক সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ। বিদ্যুৎ ভারতের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকাগুলির মধ্যে একটি গ্রহণ করতে চলেছে। স্বাভাবিক কারণেই, ভারতে কিছু লোক, যাঁরা এর বাণিজ্যিক এবং প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, এবং আমরা কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্বাভাবিক ভাবেই এ ধরণের প্রশিক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাঁচা ছেলেদের নেওয়া যায় না। এমন কয়েকজনকে নিতে হবে, যাদের এ ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা আছে। অতএব, প্রাদেশিক সরকারগুলি তাদের বিদ্যুৎ দফতর থেকে কোনও কর্মীর নাম বিদেশে প্রশিক্ষণের

উদ্দেশ্যে প্রস্তাব করতে চায় কিনা তা তাদের কাছে জানতে চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। অতএব, শ্রম দফতর বা ভারত সরকার এই মনোনয়ন করেননি। মনোনয়নের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল, প্রাদেশিক সরকারগুলির ওপর। সর্বমোট ১০ জনকে মনোনীত করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমান। তাঁকে হায়েদ্রাবাদ রাজ্য মনোনীত করেন। অন্যান্য প্রদেশগুলি কোনও মুসলমানের নাম প্রস্তাব করেনি। কেন তা আমি জানিনা। সম্ভবত: তাঁদের বিদ্যুৎ দফতরে কোনও মুসলমান নেই বলে।

খান আব্দুল গণি খান (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ : সাধারণ) : সীমান্ত প্রদেশে বিদ্যুৎ দফতরে ৯০ শতাংশ মুসলমান রয়েছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : দুঃখিত, কিন্তু আপনার প্রদেশ কোনও মুসলমানের নাম প্রস্তাব করেনি। আপনি বরং সীমান্ত প্রদেশের বিধানসভায় একটি প্রশ্ন আনুন।

এখন আমি শ্রম দফতরের উদ্যোগে গৃহীত বিদেশে প্রশিক্ষণমূলক তিনটি প্রকল্পের প্রসঙ্গে আসছি। একটি হ'ল বেভিন প্রশিক্ষণ প্রকল্প। সর্বমোট ৭৮৭ জনকে পাঠানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে মুসলমান ছিল ১৫৪ জন অথবা ১৯ শতাংশ। এছাড়া, ভারত সরকারের অধীনে শ্রমিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে শ্রম অফিসারদের একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প রয়েছে। এই অফিসারদের শ্রম দফতর মনোনীত করে না, তারা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের দ্বারা মনোনীত হন। এবং এক্ষেত্রে পরিস্থিতি হল এইরকম : সব মিলিয়ে ২৩ জনকে এখন অবধি পাঠানো হয়েছে। এই ২৩-এর মধ্যে ১৮ জনই মুসলমান, যা কিনা ৭৯ শতাংশ। এর পরে, স্যার, আমাদের আরও একটি প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্পটি বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মীদের উচ্চতর কারিগরি প্রশিক্ষণ দানের প্রকল্প। ভারত সরকার বেসরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বেসরকারি নিয়োগকর্তাদের জানিয়েছে যে, ভারতীয় কারিগরি দক্ষতার মান উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা যদি তাঁদের কোনও কর্মীকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠাতে ইচ্ছুক থাকেন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং শ্রম দফতর বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগের জন্য যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাবে। এই উদ্দেশ্যে, এ পর্যন্ত ছ'জনকে পাঠানো হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত: তাঁদের মধ্যে কোনও মুসলমান নেই, কিন্তু তা নিশ্চয়-ই শ্রম দফতরের ত্রুটি নয় কারণ প্রশিক্ষণের দায়িত্ব তাদের নয়।

এখন, স্যার, আর যে বিষয়ে আমি দৃষ্টি দিতে চাই তাহল প্রোজেক্ট অফিসার

এবং ইউটিলাইজেশন অফিসারদের নিয়োগ। যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এই শূন্য পদগুলি পূরণ করা হয়েছিল। যে ন'টি পদ পূরণ করা হয়েছিল তার মধ্যে দূর্ভাগ্যবশত কোনও মুসলমান ছিলেন না। এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সঙ্গে শ্রম দপ্তরের যে চিঠিপত্র আদান প্রদান হয়েছিল আমি তার প্রতি এই কাটতি প্রস্তাবের মাননীয় উত্থাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা নিয়োগ সম্পর্কে জানার পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও জানি যে, একজনও মুসলমান নিযুক্তদের মধ্যে নেই। যে নামগুলি, তারা সুপারিশ করেছে তার মধ্যে একজনও মুসলমান নেই কেন তা যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাছে জানার জন্য আমি আমার দফতরকে নির্দেশ দিই। যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের উত্তর ছিল এই। উত্তরটি এই বিষয়ের ওপর ভিন্ন ধরণের আলোকপাত করে বলে তা উল্লেখযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় সার্ভিস কমিশন জানায় যে, তাদের বিজ্ঞাপনের প্রত্যুত্তরে সব মিলিয়ে ২৪০টি আবেদন পত্র তাঁরা পান। তাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন ছিলেন মুসলমান আর সেই ৮ জন মুসলমানের মধ্যে তিনজনকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। তিনজনের মধ্যে একজনকেও তাঁরা পদের যোগ্য বলে বিবেচনা করতে পারেননি। অতএব স্যার, সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে এই হল শ্রম দফতরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আমি দাবি করছি স্যার, যে, এই পদে আমি থাকাকালীন, মুসলমানদের অবস্থার অবনতি দূরে থাকুক নিশ্চিত ভাবে অগ্রগতি হয়েছে। স্যার আমি যে দফতরের দায়িত্বে রয়েছি তার সম্পর্কে আমি এর থেকে বেশি কিছু দাবি করছি না। আমি শুধুমাত্র আর দুটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। মুসলমান লিগ দলের কতজন মাননীয় সদস্য সাম্প্রদায়িক অনুপাতের এই প্রস্তাবের বিষয় সম্পর্কে আমি কি ভূমিকা নিয়েছি সে ব্যাপারে অবগত আছেন। আমি মনে করি মুসলমান লিগ দলের কোনও সদস্য যদি লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের সময় উপস্থিত থাকতেন তিনি ভালভাবেই অনুধাবন করবেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য এই সুবিধাগুলি আদায় করার জন্য যারা লড়াই করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার অবদান অবশ্যই ভাল। আমি এর জন্য লড়াই করেছি, এরজন্য লড়াই করছি এবং এরজন্য লড়াই চালিয়ে যাব।

দ্বিতীয়ত, আমি যা তুলে ধরতে চাই, আমার মাননীয় সহকর্মী স্বরাষ্ট্র দফতরের সদস্য যদি অনুমতি দেন তো বলি যে, তিনি যে ব্যবস্থা নেবেন বলে সভাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যাতে যেসব দফতর এ ব্যাপারে কর্তব্যচ্যুত হবে তাদের বিরুদ্ধে ভারত সরকার কেবলমাত্র প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যেই ব্যবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট

থাকবেন না, উপরন্তু কতকগুলি স্থায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, যাতে নিযুক্তির সময়, সঠিক ভাবে তা প্রতিরোধ করা যায়। সে ব্যাপারেও কৃতিত্ব আমার-ই, কারণ আমিই এক চিঠিতে তাঁকে বলেছিলাম যে এই পরিস্থিতির সংশোধন প্রয়োজন। এর বেশি আমি আর কিছুই বলতে চাইনা।

শ্রী আহমেদ ই. এইচ. জাফর : বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন স্যার, আমি জানতে চাই, উনি নিযুক্তি সম্বন্ধে যে পরিসংখ্যান এখন দিলেন, তার মধ্যে পুনর্বাসনগুলিও অন্তর্ভুক্ত কিনা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ, তা শ্রম সচিবালয়ের সম্মিলিত অংশ।

শ্রী আহমেদ ই.এইচ. জাফর : পুণর্বাসন অন্তর্ভুক্ত করা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার কাছে অনেক পরিসংখ্যান রয়েছে। সেগুলি এতোই আকর্ষণীয় যে মাননীয় বন্ধুবর চাইলে আমি সেগুলি তাঁর পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর হাতে তুলে দিতে পারি।

□ □ □

৬২

ভারতীয় অর্থ বিল

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রম সদস্য) : মাননীয় সভাপতি, অর্থ বিল নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি প্রথমেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই সে বিষয়গুলি আমি যে শ্রম দফতরের দায়িত্বে আছি সেই দফতরের বিষয় নয়। বস্তুত পক্ষে, আমি আনন্দিত যে, এতক্ষণ অর্থ বিল নিয়ে যে আলোচনা চলেছে তাতে সেই দফতরের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু আমি বলতে উঠেছি তার কারণ আমার মাননীয় বন্ধু পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য গতকাল অর্থ বিল নিয়ে বলবার সময়ে তফসিলি জাতের জন্য নির্মিত একটি কলেজ প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য করেন। স্যার, সাধারণত: বিষয়টি আমি শিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধিদের ওপরেই ছেড়ে দিতাম, কারণ ঐ প্রকল্পটি তাঁরাই পরীক্ষা করে দেখেন এবং অর্থ দফতর সেটিকে অনুমোদন করে। আমি যা করেছি তা হল শুধুমাত্র ঐ ব্যবস্থা সম্পর্কে উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু স্যার, ঐ প্রকল্পের সমর্থনের বিষয়টি আমি শিক্ষা দফতরের প্রতিনিধিদের হাতে ছেড়ে দিতে চাইনি। তার কারণ হল যে, ঐ প্রকল্পের বিরোধিতায় আমার মাননীয় বন্ধু যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তাতে তিনি রাজনৈতিক রঙ দিতে চেয়েছেন। এই কারণেই, তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তার উত্তর দিতে আমি উঠে দাড়িয়েছি।

শুরুতেই আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে, তিনি ঐ প্রকল্পে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এবং তার কারণ, আমি মনে করি যে তাঁর ধারণা হয়েছে যে এটা শিক্ষাক্ষেত্রে জাতভেদের মনোভাব আনা ছাড়া আর কিছুই নয়। স্যার, একটা প্রবাদ আছে, এবং তা খুবই বহুল প্রচলিত প্রবাদ যে, যে মানুষ কাঁচের ঘরে বাস করে তার অন্যের ঘরে ঢিল ছোঁড়া উচিত নয়। আমি জানিনা, আমার মাননীয় বন্ধু পণ্ডিত মালব্য সেকথা উপলব্ধি করেছেন কিনা।

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ২৬ মার্চ ১৯৪৬। পৃ: ২৯২৬-৩১।

আমি আশ্চর্যান্বিতের থেকেও বেশি—আমি বিস্ময়ে অভিভূত — যে শ্রী মালব্য আজ আমার কাছে বা এই সভার কোনও সদস্যের কাছে জাতীয়তাবোধ প্রচার করছেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের ক্ষেত্রে এটা কারুর কাছেই নতুন কিছু নয়। আমি জানি, একথা সত্যি যে তিনি যে কোনও সাধারণ হিন্দুর কাছ থেকে যে জলগ্রহণ করবেন না তাই নয়। তিনি অন্য জাতের কোনও ব্রাহ্মণের কাছ থেকেও জলগ্রহণ করবেন না।

শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : (মাদ্রাজ ক্রমতালিকাভুক্ত জেলাসমূহ এবং চিত্তুর : অ-মুসলমান গ্রামীণ) : তিনি উভয়ের প্রতিই সমান ন্যায় বিচার করেন!

শ্রী শ্রী প্রকাশ : এমনকি ব্রাহ্মণরাও নির্বোধ হতে পারে!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বলা যেতে পারে, তাঁর আদর্শ হল ইঁদুরের আদর্শ, যে ইঁদুর মনে করে, ব্যক্তিগত শুদ্ধি রক্ষার উদ্দেশ্যে গর্তে বাস করাই শ্রেয় যাতে অন্য কোনও মানুষের সংশ্রব এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। এবং আমি ভেবেছিলাম যে, যে ব্যক্তি এ ধরণের চিন্তায় বিশ্বাসী তার জাতভেদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করার আগে অথবা এ দেশের জনসাধারণের কাছে জাতীয়তাবোধ প্রচার করার আগে দু'বার ভাবা উচিত। আমি ভাবতাম যে, তাঁর নিজের জানা উচিত যে, আর একটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তিনি বেশি উৎসাহী। সেই প্রতিষ্ঠানই হ'ল বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি যদি জাতিগত প্রতিষ্ঠান না হয় তাহলে আমি জানতে চাইব, জাতগত প্রতিষ্ঠান কি? স্যার, আমি জানি এবং আমি বলতে পারি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এমনকি একটি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও নয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি হল এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যা একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। আমি মাননীয় বন্ধুবরকে বলতে চাই, একথা কি সত্য নয় যে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের মধ্যে অব্রাহ্মণ প্রায় নেই।

জনৈক মাননীয় সদস্য : তা আছে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই যে, ১৯১৬ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টে স্থায়ী প্রস্তাব এই মর্মে গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা যে, একজন অব্রাহ্মণ তিনি হিন্দু ধর্ম (হিন্দু আইন) সম্পর্কে যতোই শিক্ষিত হন না কেন, তিনি হিন্দুধর্মের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করার অধিকারী নন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই যে, মাত্র কয়েক মাস আগে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্র বিভাগে প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় একটি

কায়স্থ মেয়েকে অনশন করতে হয়, সেকথা কি তাঁর মনে আছে। তা যদি জাতভেদ না হয়, জাতভেদ তাহলে কি?

গতকালের বিতর্কের কার্যবিবরণী পড়ার সময় আমি দেখতে পাই, আমার মাননীয় বন্ধু শ্রী আয়েঙ্গার-তফসিলি জাতের জন্য নির্দিষ্ট অপর একটি কলেজ সম্পর্কে একটি অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন যা সরকারি রিপোর্টার নথিভুক্ত করেছেন। আমি জানিনা, ঐ সালেম শহরে সম্প্রতি যা ঘটেছে, সে সম্পর্কে তিনি অবহিত আছেন কি না? সম্ভবতঃ তিনি তা বিস্মৃত হয়েছেন।

শ্রী এম্. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : আমি জানিনা।

মাননীয় ড. বি. আর.আম্বেদকর : অথবা তিনি রাজনীতি নিয়ে এতোই ব্যস্ত যে, তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষেরা কি করছে তা তিনি জানেন না। আমি তাঁকে মাদ্রাজের 'হিন্দু' কাগজ মনোযোগের সঙ্গে পড়তে অনুরোধ করছি — খুব বেশিদিন আগের কাগজ নয় — এ মাসেরই বারো তারিখের কাগজ। তিনি দেখবেন যে, সালেমের ব্রাহ্মণেরা একটি ব্রাহ্মণ সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ভাবগম্ভীর সভায় মিলিত হন, যার লক্ষ্য হল ব্রাহ্মণদের স্বার্থ রক্ষা করা, ব্রাহ্মণদের জন্য কলেজ স্থাপন করা, ব্রাহ্মণদের জন্য শিল্প স্থাপন করা। আর সেই সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন? মহান সচিবতম স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার।

শ্রী অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : আপনার পূর্বতন সহকর্মী।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানিনা, এদেশে সকলেই যখন জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন তখন কার্যক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতাকে অনুসরণ করেন.....

শ্রী অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : আমি উভয়ের জন্যেই দুঃখিত।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ..... কারণ তফসিলি ভূক্ত জাতের মতো একটি সম্প্রদায়। যারা জীবনে প্রথম তাদের অক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছে এবং যেখানে তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে, সেরকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে — সদস্যরা এখানে এসে তাদের যদি বলেন যে তারা সাম্প্রদায়িক কাজকর্ম করছে, তাহলে আমার বিচারে তা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি সভাকে জানাতে চাই যে, একে তফসিলি ভূক্ত জাতের কলেজ বলা সম্পূর্ণ ভুল আখ্যা দেওয়া। এ হ'ল এমন একটি কলেজ যা অন্য যেকোনও কলেজের মতো সব সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যই খোলা। কারুর জন্যে কোনও বাধা নেই।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য : (এলাহাবাদ এবং ঝাঁসি বিভাগ : অ-মুসলমান গ্রামীন) বাজেটে কি বলা হয়েছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আপনার সামনে পুরো এক মাস ধরে এই বাজেট রয়েছে। বিরোধিতা করার আগে, আপনার উচিত ছিল একটি স্বল্প-মেয়াদি নোটিশ এনে তা বিস্তারিত জেনে নেওয়া। এখন যা বলছিলাম, এই প্রতিষ্ঠান সব সম্প্রদায়ের জন্যই অবারিত দ্বার। কলেজটি যে সকলেরই জন্য খোলা তাই নয়, কর্মীরাও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের। সেখানে কর্মীদের মধ্যে হিন্দুরা রয়েছেন ব্রাহ্মণরা রয়েছেন, অব্রাহ্মণরা রয়েছেন, পার্শিরা রয়েছেন, খ্রিস্টানরা রয়েছেন, মুসলমানরা রয়েছেন। আর, এই সভাকে আমি জানাতে চাই, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে যখন স্বীকৃতির জন্য আবেদন পত্র পৌঁছয়, বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃতি দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেনি। এমনকি এও স্বীকার করা হয় যে, এত বছরে বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এত সুচিন্তিত প্রকল্প জমা পড়েছে। এবং আমি বলতে পারি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম শুরুতেই একটি পুরোদস্তুর কলেজের অনুমোদন দেওয়া হ'ল। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান, তার কর্মী আর ব্যবস্থা এত ভাল ছিল। অতএব কলেজটি শুধুমাত্র তফসিল শ্রেণীভুক্তদের কলেজ নয়। তফসিলি জাতিদের জন্য কলেজ শুধুমাত্র যা করে তা হ'ল তাদের প্রবেশাধিকার, ফ্রি-শিপ এবং হোস্টেলে জায়গার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার কি প্রয়োজন ছিল তা আমি এই সভাকে জানাতে চাই। মাননীয় সদস্যরা সম্ভবত অবগত নয় যে, বোম্বাই প্রদেশে ছাত্রের সংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপরীতে বসে রয়েছেন আমার মাননীয় বন্ধু শ্রী গাডগিল তিনি। জানেন যে গত বছর উনিশটি নতুন কলেজ খোলার জন্য বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন দেয়। ছাত্রদের প্রবেশাধিকার পাওয়া যে কতো কঠিন তা এই ঘটনা জানান। তফসলি জাতিভূক্ত ছেলেরাই এই ভিড়ের সবচেয়ে বড়ো ভুক্তভোগী। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তারা বিভিন্ন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন না। অতএব আমি ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানাই যে, এমন একটি প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত, যার প্রাথমিক কর্তব্য হবে এই ছেলেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া। এই প্রকল্পে এমন কিছুই নেই তাকে তাকে জাতগত বৈষম্যমূলক বা সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায়।

এখন স্যার, আর একটি বিষয় যা আমার মাননীয় বন্ধু উত্থাপন করেছেন, এবং কেন উত্থাপন করেছেন তা কিছুতেই আমার বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি রাজনীতি নিয়ে আসেন এবং বলেন যে, নির্বাচনের কথা বলতে হ'লে আমি

ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণ সাফ হয়ে গেছি। আমি জানিনা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন। আমার বিশ্বাস তিনি যা বলতে চেয়েছেন, তা হ'ল আমাকে ভারত সরকারের তালিকাভুক্ত করা উচিত হয়নি অথবা এ ধরণের কিছু যা আমি জানিনা।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য : জানেন না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, নির্বাচনে যা ঘটেছে তার থেকে বলা যায়, আমি এখন একটি শুকিয়ে যাওয়া গাছ। কিন্তু আমি আমার মাননীয় বন্ধুদের জানাতে চাই যে, আমার শেকড় শুকিয়ে যায়নি। আমার মাননীয় বন্ধুরা নির্বাচনের ফলাফলের কথা বলছিলেন। উনি বলেন তফসিল জাতের সংরক্ষিত আসনগুলি কংগ্রেস জেতে। হ্যাঁ তারাই জেতে। কিন্তু আমার মাননীয় বন্ধুকে আমি প্রশ্ন করতে চাই, কি উপায়ে কংগ্রেস এই জয় পেয়েছিল তা কি আমার মাননীয় বন্ধু পরীক্ষা করে দেখেছেন?

অধ্যাপক এস.জি. রঙ্গ : আমরা প্রস্তুত!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল সে ব্যাপারে আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে জানাতে চাই।

শ্রী এম অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : সেই চিরাচরিত দোষারোপ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না, এ চিরাচরিত দোষারোপ নয়। এ হ'ল একটি প্রামাণ্য বিষয়, যার সত্যতা প্রশ্নাতীত।

অধ্যাপক এন. ডি. রঙ্গ : সন্দেহের পথে যাবেন না!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধুর জানা দরকার যে, অনেক জায়গাতেই অস্পৃশ্য ভোটদাতাদের-ভোটকেন্দ্রেই যেতে দেওয়া হয়নি। আমি সাতারা জেলার একটি ঘটনার উল্লেখ করছি, যে ঘটনার সঙ্গে এই সভার অনেক সদস্যই পরিচিত। কারণ ঐ জেলায় এক সমান্তরাল সরকারের অস্তিত্ব ছিল। ৩৬১-টি গ্রামের তফসিল ভুক্ত জাতের ভোটারদের, হিন্দু ভোটারেরা, কাচেরি গ্রামে নিয়ে যায়। তাদের প্রশ্ন করা হয়, তারা কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিতে প্রস্তুত কিনা। যখন তারা অস্বীকার করে, তখন তাদের কড়া পাহারার মধ্যে কাচেরি গ্রামে বসিয়ে রাখা হয়। তাদের নড়তে দেওয়া হয়নি। আমি আরও অনেক ঘটনা জানাতে পারি।

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য : সত্যি? দয়া করে জানান!

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এমন কি কংগ্রেসের বিরোধী তফসিলি জাতিভূক্ত প্রার্থীদের নিগৃহীত করা হয়। কাছাকাছির মধ্যে আগ্রার ঘটনা ধরুন — যা সম্প্রতি ঘটেছে। নির্বাচনের দিন পঞ্চাশ জন অস্পৃশ্যের গৃহ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করা হয়েছে। ভোটাররা যখন ভোট দিতে গিয়েছিলেন তখন তাঁদের অনুপস্থিতিতে কুড়িটি গৃহে লুঠতরাজ করা হয়। কানপুরে সাতজনকে হত্যা করা হয়।

দেওয়ান চমনলাল (পশ্চিম পঞ্জাব : অ-মুসলমান) : কে লুঠতরাজ করে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হিন্দুরা। এইসব উপায় অবলম্বন করে এই নির্বাচনগুলি জেতা হয়। (বাধাদান) আমার মাননীয় বন্ধুকে আমি জানাতে চাই। কংগ্রেস এই আসনগুলি জিতেছে, অথবা তফসিলি জাতে ফেডারেশন — আমি যার প্রতিনিধি তারা জিতেছে। তার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নির্বাচনে সম্ভব নয়। তা করা হবে নির্বুদ্ধিতা। চূড়ান্ত নির্বাচনে কখনও কখনও অস্পৃশ্যরা কখনও কখনও ৯৫ শতাংশ হিন্দুর বিপরীতে মাত্র পাঁচ শতাংশের সংখ্যালঘু। চূড়ান্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কে কার প্রতিনিধি তা নির্দ্ধারণ করা হবে নির্বুদ্ধিতা। প্রাথমিক নির্বাচনই হ'ল এ ব্যাপারে আসল পরীক্ষা। কারণ, প্রাথমিক নির্বাচন তফসিলি জাতিভূক্তদের বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীর সাহায্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। প্রাথমিক নির্বাচনে কি ঘটেছিল। আমার বিরোধী বন্ধুদের প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেওয়া যাক। পঞ্জাবে তিনটি নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বম্বেতেও তিনটি নির্বাচনী কেন্দ্রে প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রী মোহনলাল সাকসেনা : কতগুলির মধ্যে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমাকে শেষ করতে দিন।

সভাপতি : ওঁকে বলতে দিন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কেন্দ্রীয় প্রদেশে পাঁচটি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে তিন। সংযুক্ত প্রদেশগুলিতে দুটি। (বাধাদান) যদি আমার মাননীয় বন্ধু সত্য জানতে চান, তাঁর জানা উচিত যে, প্রাথমিক নির্বাচন বাধ্যতামূলক নয়। পাঁচজন প্রার্থী না হ'লে প্রাথমিক নির্বাচন হতে পারেনা এবং তফসিল জাতির কেউই প্রাথমিক নির্বাচন চায়না কারণ তা প্রচুর খরচ সাপেক্ষ এবং অর্থের যোগান দেওয়ার মতো কালো টাকা আমাদের নেই। (বাধাদান) সব মিলিয়ে বাইশটি প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাদের সবকটিতেই কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। আমি সভাকে বলতে চাই যে, ঐ বাইশটি প্রাথমিক নির্বাচনের মধ্যে ১৯টি জিতেছে সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন।

দেওয়ান চমনলাল : পঞ্জাবে কতগুলি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এক মিনিট অপেক্ষা করুন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে — আমি সমস্ত পরিসংখ্যান দিতে পারবনা কারণ আমার সময় খুব অল্প.....

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য : এ আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : বোম্বাই শহরে দু'টি নির্বাচন কেন্দ্রে প্রাথমিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে একটি ছিল বাইকুলা কেন্দ্র। তফসিল সঙ্ঘের প্রার্থী পায় ১১,৩৩৪ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী পান ২০৯৬ ভোট। বোম্বাই শহরের শহরতলী কেন্দ্রে তফসিল সঙ্ঘের প্রার্থী পায় ১২,৮৯৯ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী পায় কেবলমাত্র ২০৮৮। মধ্যপ্রদেশ — আমি আরার দু'টি কেন্দ্রকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করছি.....

শ্রী এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : কালোবাজারি হয়নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : নাগপুর কেন্দ্রে তফসিল সঙ্ঘের ১,৯৩৩ ভোট পায়, কংগ্রেস প্রার্থী পান ২৭০টি ভোট। ভাণ্ডারা জেলায় ফেডারেশন প্রার্থী পান ৩,১৮৭ ভোট, এবং কংগ্রেস প্রার্থী ও অন্যান্য নির্দল প্রার্থীদের নিয়ে পান ৯৭৬ টি ভোট। সংযুক্ত প্রদেশের আগ্রা কেন্দ্রে তফসিল সঙ্ঘের প্রার্থী ২,২৪৮ টি ভোট পান, যেখানে কংগ্রেস এবং অন্যান্য সকলে মিলিতভাবে পান ৮৪০। পঞ্জাবে লুধিয়ানা ফিরোজপুর কেন্দ্রে আমি একটি উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করছি— তফসিল সঙ্ঘের ১৯০০ টি ভোট পায় এবং কংগ্রেস পায় ৫০০ ভোট।

দেওয়ান চমনলাল : পঞ্জাবে কোনও তফসিল জাতের প্রার্থী ছিলেন না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাননীয় বন্ধুবর কি আমায় বলতে দেবেন, আমি মনে করি এ ব্যাপারে তাঁর চেয়ে বেশি জানি।

দেওয়ান চমন লাল : আমার মাননীয় বন্ধু জানেন যে, একজনও প্রার্থী ছিলেন না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : তফসিলি সঙ্ঘের যারা.....

দেওয়ান চমনলাল : এ কথা সর্বৈব মিথ্যা।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মাননীয় বন্ধু এ কথা প্রত্যাহার করবেন, স্যার আমি অধ্যক্ষের কাছে স্বাধিকার রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি।

দেওয়ান চমনলাল : আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি যে পঞ্জাবে তাঁর ফেডারেশনের একজনও প্রার্থী ছিলেন না একথা অস্বীকার করতে।

মাননীয় সভাপতি : শান্তি, শান্তি। মাননীয় সদস্য যখন তথ্য দিচ্ছেন তখন বিতর্কে অযথা উত্তাপ সঞ্চার করার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছিল এবং উত্তর চাওয়া হয়েছিল। তাঁর যা কিছু বলার আছে তা ধৈর্য্য সহকারে শোনা উচিত। তিনি যা বলেছেন তা সত্য কিনা সে সম্পর্কে আমি উদ্বিগ্ন নই কিন্তু সভার কোনও সদস্যেরই তাকে সর্বৈব মিথ্যা বলার অধিকার নেই — যা একটু আগেই জনৈক মাননীয় সদস্য বলেছেন।

দেওয়ান চমনলাল : স্যার, আমি একথা প্রত্যাহার করে নিয়ে পরিবর্তে তাকে "একরাশ পারিভাষিক অযতার্থতা" বলে অভিহিত করছি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : মাদ্রাজ থেকে আমি একটি কেন্দ্রের কথা বলব তা হ'ল — আমলপুরম। ফেডারেশন প্রার্থী পান ১০,৫৪০ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী ২,৬৮৩। এই হ'ল প্রাথমিক নির্বাচনের ফলাফল। এবং যদি কেউ সত্যিকারের পরীক্ষা করতে চান, সেই পরীক্ষা প্রাথমিক নির্বাচনেরই পরীক্ষা হওয়া উচিত। আমি বিরোধীপক্ষের মাননীয় বন্ধুদের বলতে চাই, এই নির্বাচনে তাঁরা যা করেছেন তার যদি কোনও মূল্য থাকে, তা আমি যার জন্য লড়াই করে আসছি তাকেই সপ্রমাণিত করেছে — তা হল নির্বাচন পদ্ধতি হ'ল প্রতারণা এবং তফসিল জাতের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী চাই।

আমার মাননীয় বন্ধু পণ্ডিত মালব্য, আর একটি বিষয় প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে, হিন্দু সম্প্রদায় তফসিল জাতের প্রতি যথেষ্ট মনোনিবেশ করছে এবং তারা তফসিল জাতের নৈতিক এবং বস্তুগত উন্নয়নে প্রচুর অর্থ প্রদান করতে পারেন। স্যার আমি জানিনা.....

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য : বৈধতার প্রশ্ন স্যার। আমি কি জানতে পারি, যে কোনও মাননীয় সদস্য এই সভাকে যদি অন্য কোনও সদস্য সম্পর্কে ভ্রান্ত তথ্য, অসত্য উদ্ধৃতি এবং বিভ্রান্তিকর বক্তব্য রাখতে থাকেন, যে সদস্যের বক্তব্য ইতিমধ্যেই পেশ করা হয়ে গেছে এবং যিনি ঐ অসত্য বিবৃতি এবং পারিভাষিক অযতার্থতার উত্তর দিয়ে তা অনাবৃত করে দেওয়ার সুযোগ হয়তো পাবেন না — এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সেই সদস্যের কি সুযোগ রয়েছে?

মাননীয় সভাপতি : প্রশ্নটি প্রকল্পিত এবং আমি মনে করি না এর উত্তর দেওয়ার কোনও প্রয়োজন আছে। কিন্তু ঘটনার বিবৃতি এক জিনিস এবং বিবরণ

আর এক এবং মাননীয় সদস্যের ঘটনা সম্বন্ধে বিবৃতি এবং তার বিবরণের মধ্যে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, তফসিলি জাতের কল্যাণ এবং নৈতিক ও বস্তুগত দিক দিয়ে। উন্নয়ন সম্পর্কে হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসাহের বিষয়ে আমার মাননীয় বন্ধু আলোকপাত করেছেন সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করছিলাম। আমি যা বলতে চাই তা হল এই সভার চার দেওয়ালের ভেতরে যা ঘটছে তার ভিত্তিতে যদি বিচার করা যায় তাহলে যেকোনও সৎ লোকের পক্ষেই আমার মাননীয় বন্ধুর বিবৃতির সঙ্গে একমত হওয়া কঠিন হবে। একথা সত্যি, যে আমি খুব অল্প সময়ের জন্য এই সভার সদস্য আছি। কিন্তু এই সভার কার্য বিবরণী আমি নিয়মিত পাঠ করে আসছি, এবং পড়ার মতো এমন কিছুই বাকি নেই যা আমি পড়িনি। আর, স্যার, অতীতের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি, আমার মনে হয় একথা ঠিক, যদি বলি, খুবই কম ক্ষেত্রে বিরোধী দলের কোনও সদস্য এখানে উপবিষ্ট সরকারের কোনও সদস্যকে তফসিলি জাতের ওপর প্রতিটি গ্রামে প্রতিদিন যে নির্যাতন, অত্যাচার, শোষণ চালানো হয় সে সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন করেছেন। আমি কার্যবিবরণীতে একথা দেখিনি। আমি দেখিনি যে, কোনও মাননীয় সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন .....

শ্রী অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার : আপনি বলবেন, এটা প্রাদেশিক বিষয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : .....সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কয়েকটি জিনিস করা উচিত। আমার মনে আছে, একটি ক্ষেত্রে, মাননীয় বিরোধী সদস্যরা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে এক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, আমার মনে হয় সেটা ১৯৩২ অথবা ১৯৩৪ সাল হবে, ঠিক কবে ভূলে যাচ্ছি.....

জনৈক মাননীয় সদস্য : ১৯৩৩।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : .....যখন মন্দিরে প্রবেশ বিষয়ে একটা বিল আনা হয়। আর ভাইসরয় যখন অনুমোদন দিতে অস্বীকার করেন, তখন কি শোরগোল না হয়েছিল। কোনও কোনও ব্যক্তি অনশন করেন এবং বিলটি পেশ করার অনুমতি দেওয়া না হ'লে আত্মহত্যার হুমকি দেন। আর যখন অনুমতি দেওয়া হ'ল, তখন কি ঘটল? ঘটনা হ'ল, এই ভদ্রমহোদয়েরা তখন বিলটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁরা একে বর্জন করেন। তাঁরা শ্রী রঙ্গ আয়ারকে তাঁর শিশু হাতে বিসর্জন করলেন। তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্য তাঁদের ধিক্কার জানান। আমার মনে আছে কেবলমাত্র দু'টি ক্ষেত্রে যখন এই প্রশ্ন.....

জনৈক মাননীয় সদস্য : আপনি বিতর্কটি পড়েননি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সভায় কি ঘটেছিল সে সম্পর্কে আমি সমস্ত কিছু পড়েছি। আমি দেখেছি, কেবলমাত্র দু'বার এই সভা তফসিলি জাতের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছে। একটি হ'ল ১৯১৬ সালে। যখন শ্রী মানেকজি দাদাভাই, বর্তমানে অপর সভার সভাপতি, তফসিলি জাতের অভিযোগ অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব পেশ করেন এবং মাননীয় বিরোধী সদস্য যিনি এই বিতর্কের সূত্রপাত করেন, সেই বিতর্কের কার্য বিবরণীতে চোখ বোলান, তিনি দেখতে পাবেন, যে সেই প্রস্তাবের সবচেয়ে চরম বিরোধিতা যিনি করেন, তিনি তাঁর বাবা। অপর ঘটনাটি ঘটে ১৯২৭ সালে, যখন প্রয়াত লর্ড বার্কেনহেড তফসিলি জাতকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করেন তাদের সংবিধানের মাধ্যমে রক্ষা করার কথা বলেন। আমার বিরোধী বন্ধুরা, যখন আমি আমার অস্তিত্বকে রাজনৈতিক বিষয় করে তোলার চেষ্টা করি, কেবলমাত্র তখনি আমার প্রতি স্নেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। যদি আমি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কথা বলি, যদি আমি চাকুরিতে সংরক্ষণের কথা বলি, যদি আমি শিক্ষাক্ষেত্রে অনুদানের দাবি জানাই, তখন তাঁরা আমার অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। অন্যথায় আমি তাঁদের কাছে মৃত...

জনৈক মাননীয় সদস্য : কিছু নয়।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ..... আর সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, কারণ তাঁরা বলেন আমি হিন্দু। যদি মৈত্রী এর মূল্য হয়, তাহ'লে আমি বলতে পারি আমি তাঁদের আপন ভাই নয় তাঁদের দূর সম্পর্কের ভাই।

আর একটি কথা আমি বলতে চাই। তা হ'ল আমি একথা অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে বলতে চাই। আমি আমার হিন্দু বন্ধুদের বলতে চাই যে, আমি তাঁদের দানের ওপর নির্ভর করে বাঁচতে চাইনা। আমি এই দেশের নাগরিক। অন্যান্য সম্প্রদায় তাদের নিজেদের জন্য যে সমস্ত সুবিধা ও অধিকার পাচ্ছে সরকারের কাছ থেকে তা দাবি করার অধিকার আমার রয়েছে। আমি দান ভিক্ষা চাইনা; দান ভিক্ষার উদ্দেশ্য হ'ল আমাকে এবং আমার সম্প্রদায়ের মনোবল ভেঙে দিয়ে দাসত্বে বন্দী করা। তফসিলি জাত তাদের নিজেদের অধিকারেই দাঁড়াতে চায়। এবং আমি একথা সভাকে জানাতে দ্বিধা করছিনা যে তাদের দাবির বিরোধিতা করা হলে তারা তাদের দাবি আদায় করার জন্য রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করবেনা।

*গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া প্রেস কলকাতায় শ্রমিক ধর্মঘট

মাননীয় সভাপতি : আমি, শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জির কাছ থেকে একটি মুলতুবি প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি যাতে সভার কাজ মুলতুবি রেখে জনস্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টি হ'ল : "গভর্নমেন্ট অব্ ইন্ডিয়া প্রেস, কলকাতার শ্রমিকদের দাবি মেটাতে সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে, শ্রমিক ধর্মঘট।"

আমি দেখছি যে, মাননীয় সদস্য, দু'তিন দিন আগে, বিষয়টির ওপরে একটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, এবং প্রশ্নটি স্বল্প মেয়াদি নোটিশের প্রশ্ন হিসেবে উত্তর পাবার আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রম দফতরের মাননীয় সদস্য সেই প্রশ্নটিকে স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন হিসেবে তা গ্রহণ করেননি। সেই সময়ে আসলে কোনও ধর্মঘট চলছিল না। বর্তমান নোটিশে ধর্মঘটের অভিযোগ রয়েছে। তখন প্রশ্ন ছিল আসন্ন ধর্মঘটের কোনও ধর্মঘট হয়েছে কি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : (শ্রমিক সদস্য) এ ব্যাপারে আমার কাছে কোনও তথ্য নেই।

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি : (চট্টগ্রাম এবং রাজশাহি বিভাগ! অ-মুসলমান গ্রামীন) আমার কাছে নিশ্চিত তথ্য রয়েছে যে ধর্মঘট চলছে। গতকালের ফ্রি প্রেস জার্নালে এ সম্পর্কে একটি খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

মাননীয় সভাপতি : তথ্যের উৎস হ'ল ফ্রি প্রেস জার্নাল?

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি : বিরোধী দলনেতা একটি তারবার্তাও পেয়েছেন।

মাননীয় সভাপতি : মাননীয় সদস্য কি ধর্মঘটের ধরণ সম্পর্কে বলতে পারবেন? সমস্ত প্রেস-ই কি ধর্মঘট করছে?

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৪, ৪ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৫২২-২৪।

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি : হ্যাঁ স্যার। প্রায় ১২০০ শ্রমিক যোগ দিয়েছেন।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : পরিস্থিতি হ'ল এই। কলকাতা প্রেস-এর শ্রমিকরা ১৩ই মার্চ ধর্মঘটের একটি নোটিশ দেয়। অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রেসও একই ধরণের ধর্মঘটের নোটিশ দেয়। কলকাতা প্রেস-এর ১৩টি দাবির একটি তালিকা দিয়েছেন, আর সরকার তাদের সবকটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করে। প্রেস-এর শ্রমিকদের কাছে নিম্নলিখিত সুবিধা অনুমোদন করে— গেজেটভুক্ত ছুটির যেসব দিনে প্রেস বন্ধ, সেইসব দিনে উপস্থিতির ক্ষতিপূরণে ছুটি, টুকরো কাজের শ্রমিকদের এফিসিয়েন্সি বার-এর শ্রেণীর উচ্চতর পদে পদোন্নতি ত্বরান্বিত, বর্ধিত মহার্ঘ্যভাতা ১৯৪৫-এর পয়লা জানুয়ারির পরিবর্তে ১৯৪৪-এর পয়লা জুলাই থেকে কার্যকর; পেনশন গোনার সময় অর্দ্ধেক মহার্ঘ-ভাতা বেতন হিসেবে ধরে নেওয়া; নিচু শ্রেণীর শ্রমিকরা গড় বেতনের অর্দ্ধেক পর্যন্ত পেনসন হিসেবে পাবেন; ধর্মঘটের সম্পূর্ণ মেয়াদ গড় বেতনে ছুটি হিসাবে গণ্য হবে এবং অনিশ্চিত কারণ বশত: ছুটি থেকে কাটা হবে। প্রেস শ্রমিকদের বর্তমান বেতন ও কাজের শর্তাবলিতে অনিয়ম সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার উদ্দেশ্যে একজন অফিসার অন স্পেশ্যাল ডিউটি-কে নিয়োগ করা, কাজের সময় ডে-শিফটের ক্ষেত্রে দিনের শিফ্টে ৪৮ থেকে ৪৪ ঘন্টা, এবং রাতের শিফ্টে ৪৪ থেকে ৩৮-এ কমিয়ে আনা; টুকরো কাজের শ্রমিকদের বেতনভোগী কর্মীদের সম সংখ্যায় স-বেতন ২৩ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে। বেতনক্রমের পুণর্নির্দ্ধারণ অথবা ভর্তুকির হার বৃদ্ধি, ইত্যাদি সংক্রান্ত অন্যান্য দাবিগুলি সম্পর্কে, সরকার সবকটি সরকারি প্রেস-এর সব শ্রমিকদের জানিয়েছে যে, এই বিষয়টি, মাহিনা কমিশনের রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। অতএব সরকার, এই দাবিগুলি সম্পর্কে এখনই কোনও ঘোষণা করার মতো অবস্থায় নেই।

দিল্লি প্রেস-এর ধর্মঘট সম্পর্কে আমি সভাকে জানাতে চাই যে, শ্রমিকরা এইসব সুবিধাগুলি গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের কাজে ফিরে গেছেন। কলকাতা প্রেস-এর কর্মীরা কেনো একই মনোভাব গ্রহণ করবেন না আমি তার পেছনে কোনও যুক্তি দেখিনা। এইমাত্র আমি অফিস থেকে জানতে পারি যে, একটি দাবি, যা অবিলম্বে মেটাবার জন্য তাঁরা চাপ দিচ্ছেন, ৪৪ ঘন্টা থেকে সময় ৪০ ঘন্টা করা উচিত। আমি এই মূহূর্তে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলতে পারছিনা, কিন্তু বিষয়টি বিবেচনা করতে আমি প্রস্তুত আছি। আমি মনে করিনা মূলতুবি প্রস্তাবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে কাজের কাজ কিছু হবে।

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি : স্যার মাননীয় সদস্যের জানার কথা যে তাঁর দফতরের আঞ্চলিক কমিশনার ৪২ ঘন্টার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এবং তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ও ৪৪ ঘন্টার ওপরেই অনড় থাকেন। এছাড়া, স্যার, বেঙ্গল গভর্নমেন্ট প্রেসের কর্মীরা সপ্তাহে ৪০ ঘন্টা কাজ করেন।

সভাপতি : সেটাতো গুণাগুণের ওপর জেরা বিশেষ। আমি এখন যা জানতে চাই, তাহ'ল মাননীয় শ্রম সদস্যের কাছে যা জানা গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে কি'ভাবে এই বিষয়টি সর্বসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রী সত্যপ্রিয় ব্যানার্জি : স্যার, এতো জন শ্রমিক এই বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল, আর এতো বিপুল সংখ্যায় শ্রমিক এবং তাঁদের ভরণীয়বর্গে অনাহারের মুখে দাঁড়িয়ে তাঁদের জীবন বিপন্ন, স্যার, আর তা যদি জরুরি নাগরিক সমস্যা না হয় তাহলে অন্য কি হতে পারে?

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (গুন্টুর এবং নেলোর : অ-মুসলমান গ্রামীন) : স্যার আমি কি একটা আবেদন জানাতে পারি। সম্ভব হ'লে দপ্তরের কোনও বিশেষ অফিসারকে পাঠিয়ে শ্রমিকদের কাছে এই সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করা হলে, তাদের পক্ষে ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়া থেকে নিবৃত্ত হওয়া সম্ভব। যাই হোক না কেন ১৩০০ শ্রমিকের ধর্মঘট খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এমনকি ওখানে সরকারের সব কাজ বন্ধ থাকার দিক থেকে দেখলেও গুরুত্বপূর্ণ।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি জানি কলকাতায় একজন শ্রম কমিশনার নিযুক্ত রয়েছেন। যাঁকে শ্রম দফতর, শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কি করা যায় তা দেখতে নির্দেশ দিয়েছে।

শেঠ গোবিন্দ দাস : (কেন্দ্রীয় প্রদেশ: হিন্দি বিভাগ : অ-মুসলমান) মাননীয় সদস্য বলেছেন বিভিন্ন প্রেস থেকে ধর্মঘটের নোটিশ পাওয়া গেছে। কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও কি ধর্মঘট বা ধর্মঘটের আশঙ্কা রয়েছে?

মাননীয় সভাপতি : আমি মনে করিনা, বর্তমান বিষয়ের ক্ষেত্রে এর কোনও সম্পর্ক আছে। বিষয়টির ধরণ এমন যে, আমি মনে করিনা আমি মূলতুবি প্রস্তাবের সম্মতি দিতে পারি।

৬৪

*কারখানা সংশোধনী বিধেয়ক

সভাপতি : সভা এখন কারখানা বিল নিয়ে বিচার বিবেচনা করবে।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি এই বিষয়টি নিয়েই বলতে চাই। আমার মাননীয় সহকর্মী এই বিষয়টি নিয়ে আমাকে বলতে অনুরোধ করেছেন। আর আমি এ ব্যাপারে বলার যোগ্য, কারণ এই সরকারের প্রত্যেক সদস্যই সামগ্রিক ভাবে সরকারের হয়ে বলতে পারেন।

দেওয়ান চমনলাল : (পশ্চিম পঞ্জাব : অ-মুসলমান) স্যার, আমার এ ব্যাপারে কিছু বলার আছে অবশ্য, যদি না মাননীয় সদস্য পরে আমার বলার ব্যাপারে সম্মত হন।

সভাপতি : উনি সম্মত হলেও নিয়মানুযায়ী আমি মাননীয় সদস্য বিতর্কের জবাবি ভাষণের পরে আপনাকে বলতে দিতে পারি না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : ইতিমধ্যেই এতো কিছু বলা হয়েছে যে আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

মাননীয় সভাপতি, যে বিতর্ক এতক্ষণ চলেছে তাতে আমার পক্ষে বলার মতো আর খুব কম-ই অবশিষ্ট আছে। কারণ বিলের বিরুদ্ধে একপক্ষ যা বলেছে, তার উত্তর অপর পক্ষ কার্যকর ভাবেই দিয়েছে, এবং নিশ্চয়-ই এই পর্যায়ে, যা ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে, আমার পক্ষে তার পুনরাবৃত্তি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি শুধুমাত্র আমার বন্ধু মাননীয় শ্রী ভাদিলাল লালুভাইয়ের সমালোচনার জবাব দিতে। আমি তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। আর আমি বলতে বাধ্য যে, এই বিলের সম্বন্ধে তাঁর কি অভিযোগ তা আমি বুঝে উঠতে অপারগ। আমি জানি, এবং অন্যান্যরা জানেন যে আজ বস্ত্রের এক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রয়েছে, আর কারখানা আইনে, কাজের সময় সম্বন্ধে বিলের শর্তগুলির বিষয়ে সংশোধনী নিয়ে আমরা যাই করিনা কেন, বস্ত্র নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার যেন অবনতি না হয়। আমার বন্ধুর প্রতি আমার

---

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ৪ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৫২৬-২৭।

উত্তর হল, আমরা শুধুমাত্র বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ নিয়েই বিবেচনা করছিনা। অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের অভাবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে তাও আমরা বিবেচনা করছি, এবং ভারত সরকার শুধুমাত্র সূতিবস্ত্র শিল্পকে সাহায্য করবে এমন একটি সংশোধনী আনেনি কিন্তু তা এতো ব্যাপক ভাবে রচনা করা হয়েছে যে, অন্যান্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলিকেও সাহায্য করবে। আমি জানিনা, যা তাঁকে সাহায্য করবে তাই নয়, অন্যান্য অনেক শিল্পকেই সাহায্য করবে, আইনের এমন একটি ধারা সম্পর্কে কেনো তিনি সন্তুষ্ট নন। আমি এখনো পর্যন্ত তাঁর মন্তব্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছিনা।

তিনি আরও দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা আমার মনে হয়, আমার উত্তরের দাবি রাখে। একটি মন্তব্যে তিনি বলেছেন — আমার কাছে তাঁর ভাষণ রয়েছে — যে এই ছাড় ভারত সরকারের নিজের-ই এই আইনে দেওয়া উচিত ছিল, প্রাদেশিক সরকারগুলির ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। আমার কাছে এই সমালোচনার দু'টি উত্তর রয়েছে। প্রথমতঃ আমার মাননীয় বন্ধুর জানা আছে যে, ছাড় দেওয়া বর্তমানে প্রচলিত সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার অধীন; যদিও শ্রম যৌথ তালিকাভূক্ত, সেই ব্যবস্থা ভারত সরকারকে শুধুমাত্র আইন প্রণয়নের অধিকার দিয়েছে, তা ভারত সরকারকে আইন প্রয়োগের অধিকার দেয়নি। সব প্রয়োগই আবশ্যিক ভাবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে, অতএব আমরা যদি এই আইনে সরাসরি ছাড় না দিয়ে থাকি তার কারণ হ'ল, তা কেন্দ্রীয় সংসদের ক্ষমতার বাইরে। তিনি যে দাবি করেছেন তা মেটানোর দ্বিতীয় অসুবিধা হল এই: বস্ত্রশিল্পের মতো কোনও একটি মাত্র শিল্পকে বেছে নিয়ে আইনে ছাড় দেওয়ার কথা উল্লেখ করা ভারত সরকারের পক্ষে অসম্ভব, যদি না এক-ই সঙ্গে অন্যান্য যে সব শিল্পে একই ধরণের ছাড়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেগুলির তালিকা উদ্ধৃত করা হয়। শ্রম দফতরের পক্ষে অন্যান্য শিল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুমান করে, সেই শিল্পের জন্য নির্দিষ্ট ধারার উল্লেখ করা একেবারেই অসম্ভব। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে এ ধরণের ছাড় অনুমোদন করার ক্ষমতা অবিলম্বে দেওয়া হলেও তারা তা দেবেনা, যদি তার কথা ঠিক ঠিক বুঝে থাকি। বিভিন্ন প্রদেশের শ্রমিকরা এ ধরণের ছাড় অনুমোদন করার পথে প্রাদেশিক সরকারগুলির পক্ষে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। আমি এই আশঙ্কার ভাগিদার নই, কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি সন্দেহাতীতভাবে শ্রম দফতরের দেওয়া, এ ধরণের ছাড় দেওয়ার বিপক্ষের যুক্তি মেনে চলার সময় সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও প্রয়োজনের কথা মনে রাখবে এবং

অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। অতএব তাঁর প্রথম দাবি, আমি মনে করিনা, আমি মেটাতে পারব। কারণ তা আইনসম্মত হবেনা, এবং দ্বিতীয়ত, আমি জানিনা, সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতি কেন আস্থা রাখা যাবে না।

অন্য যে প্রশ্নটি তিনি উত্থাপন করেছেন তা হ'ল শিল্প এবং অসামরিক সরবরাহ দফতর এই ব্যবস্থার দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত কি'না। আমি মনে করিনা, এ প্রশ্ন তোলা তাঁর উচিত ছিল, কারণ ভারত সরকার যেভাবে কাজ করে, তা যদি তিনি একটু বিবেচনা করতেন, তাহলে দেখতেন যে, এই সভায় এমন কোনও ব্যবস্থা আসতেই পারেনা, যদিনা তাতে কর্ম পরিষদের আগে থেকেই সম্মতি থাকত যাতে শিল্প এবং অসামরিক সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যের বক্তব্য রাখার পুরো অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি এ ব্যাপারে শিল্প এবং অসামরিক সরবরাহ দফতর যে আবেদন জানিয়েছে তা শ্রম দপ্তর সবচেয়ে বেশি বিবেচনা করেছে এবং তাদেরই চাপে এই বিলের পাঁচ নম্বর ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, যখন শ্রমের সময় সীমিত করা সম্পর্কিত ধারাগুলি অত্যাবশ্যক এবং প্রয়োজন এবং স্থগিত রাখা যাবেনা, তবুও এ দেশের অবস্থা অনুযায়ী কয়েকটি ব্যবস্থাও মনে রাখা প্রয়োজন এবং তাদেরই প্রচণ্ড চাপের ফলে এই ধারাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। আশা করি আমার মাননীয় বন্ধু এবার সন্তুষ্ট হবেন যে, শিল্প এবং অসামরিক সরবরাহ দফতরকে এই বিল নিয়ে কোনওভাবেই তাড়াহুড়ো করতে হয়নি এবং এই ব্যবস্থার প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। স্যার, আমি প্রস্তাব করছি।

মাননীয় সভাপতি : প্রশ্ন হল : সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী "কারখানা আইন ১৯৩৪-কে আরও সংশোধন করার কথা, বিবেচনা করা হোক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

মাননীয় সভাপতি : আমি খণ্ড ২ প্রথমে এবং খণ্ড ১ শেষে গ্রহণ করব। খণ্ড ২-এর একটি সংশোধনী এনেছেন শ্রী ভাদিলাল লালুভাই এবং শ্রী রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার।

শ্রী ভাদিলাল লালুভাই : আমি কয়েকটি মন্তব্য করতে চাই। ড. আম্বেদকর বলেছেন যে, আইনে ছাড়ের কথা নেই। কিন্তু যেভাবে সংশোধনীর খসড়া করা হয়েছে, হতে পারে তা আইনের আওতায় আসবে। আমি জানতে চাই যে, আইনের খণ্ড ২ আমার করা খসড়াটিই আইনের আওতায় আসবে কিনা।

মাননীয় সভাপতি : মাননীয় সদস্য ঠিক কি বুঝাতে চাইছেন আমার কাছে তা পরিষ্কার নয়।

শ্রী ভাদিলাল লালুভাই : মাননীয় সদস্য বলেছেন, আইনে ছাড়ের কোনও সুযোগ নেই। তিনি যদি খণ্ড ২, আমার আনা সংশোধনী পড়ে দেখেন তাহলে তিনি দেখবেন, এর আইনগত কোনও বাধা নেই। আমি জানতে চাই আমার আনা সংশোধনীর আইনগত বাধা আছে বলেই কি তিনি আমার আনা সংশোধনীটির বিরোধিতা করতে চান অথবা তার অন্য কোনও কারণ আছে।

মাননীয় সভাপতি : আমার মনে হয়, মাননীয় সদস্য তাঁর ভাষণে এ বিষয়ে যথেষ্ট বুঝিয়ে বলেছেন। এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনা। তিনি বলেছেন, আইনি বাধা তার একটি যুক্তি। এছাড়া আরও তাঁর যুক্তি ছিল যে, তাঁর মতে, যা প্রয়োজন সরকার তা করবেন। আমি কি ঠিক বলেছি?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : হ্যাঁ স্যার।

মাননীয় সভাপতি : সংশোধনী উত্থাপিত হল।

বিলের খণ্ড ৪-এ যেখানে "সাড়ে দশ ঘন্টা, অথবা যেখানে কারখানা ঋতুভিত্তিক, সাড়ে এগারো ঘন্টার পরিবর্তে "বারো" শব্দটি বসবে।"

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার আমি দুঃখিত, আমি এই সংশোধনীটির বিরোধী। এক্ষেত্রে দু'টি আপত্তি আছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি। একটি আপত্তি সাধারণ। এই সংশোধনীর মাননীয় উত্থাপক মনে হচ্ছে, এই মত পোষণ করেন যে, কোনও বিশেষ শিল্পের নিয়োগকর্তা তাঁর কারখানায় শ্রমিক নিয়োগের কোনও পরিকল্পনা করে থাকেন। তাহলে আইনটি এমনভাবে রচিত হওয়া উচিত যাতে প্রচলিত প্রথার সঙ্গে মানানসই হয়। এটা এমন একটা অবস্থা যা আমি গ্রহণ করতে রাজি নই। অনেক নিয়োগকর্তাই অনেক উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন, যেগুলি প্রাথমিক ভাবে নিয়োগকর্তাদের স্বার্থে, আর আমি মনেকরি রাষ্ট্রের পক্ষে এ ধরণের আইনত বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করা ভুল হবে যে, যেকোনও আইনই তারা রচনা করুন, আইন প্রচলিত প্রথার সঙ্গে মানানসই হবে এবং প্রচলিত প্রথা খারাপ হলেও আইনের সেই প্রথাকে পরিবর্তন করা উচিত হবে না। এই সংশোধনীটিকে কেন গ্রহণ করতে পারছিনা তার স্বপক্ষে এই হ'ল আমার প্রথম যুক্তি।

এই সংশোধনীর বিপক্ষে আমার দ্বিতীয় যে যুক্তি তা বিষয়টির প্রত্যক্ষ বিবেচনা থেকে উদ্ভূত। আমার মাননীয় বন্ধুকে যদি ঠিক বুঝে থাকি, যেভাবে তিনি তাঁর শ্রমিক নিয়োগ করে থাকেন, তা আমার মনে হয়, সহজে এইভাবে বর্ণনা করা যাবেঃ তাঁর অধীনে, আমার মনে হয়, শ্রমিকদের দু'টি বাহিনী রয়েছে, যা ব্যাখ্যার প্রয়োজনে ধরে নেওয়া যেতে পারে 'ক' বাহিনী এবং 'খ' বাহিনী! আর যেভাবে তিনি তাদের নিয়োগ করতে চাইবেন তা কতকটা এইভাবে: 'ক' বাহিনী সকাল ৮টায় কাজ শুরু করবে এবং বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজ করবে। বিকেল চারটেয় 'খ' বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং 'খ' বাহিনী আবার সন্ধ্যা আটটা পর্যন্ত কাজ করবে। সন্ধ্যা আটটায় 'ক' বাহিনীকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং 'খ' বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে রাত বারোটা পর্যন্ত। আমি যদি তাঁকে ঠিকমতো বুঝে থাকি, এটা হবে তাঁর শ্রমিকদের কাজে লাগানোর পদ্ধতি...

শ্রী টি. এ. রামলিঙ্গম চেট্টিয়ার : একেবারে ঠিক।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমার মনে হয়, এই ব্যবস্থা মূলগত ভাবে স্প্রেডওভার অর্থাৎ কাজের সময় নির্দ্ধারণ সংক্রান্ত নীতির বিরোধী। কি এই স্প্রেডওভার নীতি? তা হ'ল এই যে, যতোটা সম্ভব কোনও শ্রমিককে যাতে, আইন অনুযায়ী নির্দ্ধারিত তার পূর্ণ সময়ের চেয়ে বেশি সময় কারখানা চত্বরে কাটাতে না হয়। এই বিলে আমরা পূর্ণ সময় হিসেবে ন' ঘন্টা নির্দ্ধারিত করছি। সংশোধনীটি গৃহীত হলে শ্রমিকদের, কারখানা চত্বরে, আরও তিন ঘন্টা বেশি সময় কাটাতে হবে, যা, আমার বিনীত নিবেদন হ'ল, স্প্রেডওভারের সাধারণ নীতির সঙ্গে সঙ্গতিসূচক নয়। কারখানা, অনুমতি পেলে বলি, কোনও বাগান নয়, এবং নিশ্চয়-ই আজকাল সেখানে এতো স্বাচ্ছন্দ নেই, যতোটা সেখানে থাকা উচিত। শ্রমিককে কারখানা ছেড়ে যেতে দেওয়া উচিত যাতে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সে তার বাড়ি ফিরে যেতে পারে। মুক্ত বায়ু সেবন করতে পারে। এবং যতোটা পারে স্বাচ্ছন্দ ভোগ করতে পারে, এবং আইন যে অবসর তাকে দিয়েছে তার সবচেয়ে ভালো সদ্ব্যবহার করতে পারে — আর সেটাই হ'ল খুব বাঞ্ছনীয়। এই কারণে আমি মনে করি, এই সংশোধনীটি ভাল সংশোধনী নয়, অতএব আমি তা গ্রহণ করতে পারছিনা...

* * * * *

***মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর** : সভা এবং স্থায়ী কমিটির সদস্যদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা ছাড়া এই পর্যায়ে আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনা — যারা এই ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য আমার সঙ্গে এতো বেশি সহযোগিতা করেছেন। এই প্রস্তাবের ওপর যেসব বক্তা তাঁদের ভাষণ প্রসঙ্গে অনেক পরামর্শ দিয়েছেন, সে সম্পর্কে বলতে হ'লে আমি শুধুমাত্র যা বলতে পারি তা হ'ল যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাকে নিঃসন্দেহে এই পরামর্শগুলি মনে রাখতে হবে। মাননীয় বন্ধু দেওয়ান চমনলাল যেমন বলেছেন, কারখানা কমিশন যে সময়ে তার রিপোর্ট দিচ্ছে, আমরা সেই সময়ে বাস করছিনা। সময় এগিয়ে গেছে। পৃথিবী এগিয়েছে এবং আমাদের দেখাতে হবে যে, আমরাও, অন্যান্য আধুনিক দেশের মতো যেসব নৈতিক মানদণ্ডের ওপর আমাদের শিল্প-সংক্রান্ত সম্পর্ক ভিত্তি করে গড়ে উঠতে হবে, তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁরা যা কিছু বলেছেন তা মনে থাকবে, এবং তাঁদের পরামর্শ যে কার্যকর হবে সে ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

স্যার, আমার প্রতি সৌজন্য প্রকাশের জন্য আমি সভাকে ধন্যবাদ জানাই।

মাননীয় সভাপতি : প্রশ্ন হ'ল :

"সংশোধিত আকারে বিলটি গৃহীত হক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

□ □ □

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড ৫, ৪ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৫৪০

৬৫

*অভ্রখনি শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে, অভ্র খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজকর্মগুলির জন্য অর্থ যোগান দেবার উদ্দেশ্যে তহবিল গঠনের বিলটি বিবেচনার জন্য গৃহীত হোক।"

এই বিলের গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি তিন নম্বর খণ্ডের নিহিত, যেখানে অভ্রের রপ্তানির ওপর শুল্ক আরোপের প্রস্তাব রয়েছে, যাতে অভ্রখনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠন করা যায়। তহবিলের সাহায্যে যে ধরণের কল্যাণমূলক কাজকর্ম করা হবে তার প্রকৃতি এই বিলের দু'নম্বর খণ্ডে দেওয়া হয়েছে। আমার পক্ষে, এই ধারাগুলি সভায় পড়ে শোনানোর প্রয়োজন নেই। বেশি বলবার আগে আমি সভাকে বলতে চাই, কেন ভারত সরকার বিলের তিন নম্বর খণ্ডে যেমন বর্ণিত হয়েছে, সে ধরণের একটি তহবিল গঠনের প্রয়োজন অনুভব করল এবং আমি মনে করিনা, অভ্র খনি শ্রমিক, এবং অভ্র প্রস্তুতকারী শিল্প শ্রমিকদের অবস্থার ওপর একটি কমিটির রিপোর্টের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করার চেয়ে ভাল আমি কিছু করতে পারি। অধ্যাপক আদরকর ঐ রিপোর্টটি প্রস্তুত করেছেন। তিনি বিষয় অনুসন্ধানকারী কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি রিপোর্টের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি।

এই রিপোর্টের ২৭ পাতায় অধ্যাপক আদরকর বলেছেন :

"আমরা কোনও খনিতেই প্রস্রাবাগার বা শৌচাগার দেখিনি। খনি আইনের এই লঙ্ঘণের ঘটনার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ৫০০ ফুট নিচে কাজ করার সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হলে শ্রমিকেরা কি করেন তা ভাবা মুশকিল।

*বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ৯ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৭৪৫-৪৭।

ভাল পানীয় জলের অভাবও অভ্র খনি শিল্পের এক চরম দুরবস্থা। ডাক্তাররা জানান যে, ডিসপেপসিয়া, আন্ত্রিক গোলোযোগ ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে দেখা দেওয়ার কারণ হল শ্রমিকদের পানীয় জলে ক্ষতিকারক খনিজের উপস্থিতি। আগেই বলেছি, কয়েকটি বড় বড় সংস্থা খনিতে ট্রাকে করে জল নিয়ে যায়। কিন্তু সাধারণত: পাঁচ ছয় মাইল দূরের নোংরা জলা থেকে জল তুলে আনার জন্য মহিলাদের কাজে লাগানো হয়। জল আনা হয় এবং তা ভরে রাখা হয় নোংরা মাটির কলসি অথবা ড্রামে। এমনকি, এই জলের যোগানও অপ্রতুল। ধোয়ার জন্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কোনও জল-ই দেওয়া হয়না। সমস্যাটি খুব-ই গভীর এবং তার দিকে অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।”

আবাসন সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়েছে :

“শ্রমিকদের যে ঘরগুলিতে রাখা হয় তার সঠিক বর্ণনা করা কোনও বিশেষণের পক্ষেও সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে যেগুলি বেশি অস্থায়ী তাদের পাতার তৈরি তাঁবুর মতো দেখায় যেগুলি শক্ত বাঁশ অথবা কাঠের খুঁটিতে আটকানো থাকে। সঠিক বাড়ি বলতে দু’ধরণের হয় : আমরা তাদের আলাদা ভাবে বিবরণ দিতে পারি :—

(১) পুরোপুরি বাঁশ এবং ঘাস দিয়ে তৈরি। আমরা একজন খনি মালিকের, তার শ্রমিকদের জন্য একটি বাড়ি দেখি যা ঠিক এমনি এবং তার ছাদ ছিল সবুজ পাতার। সাধারণ ভাবে তা গরুর খোঁয়াড়ের মতো দেখাত। তার দরজা জানালার প্রায় কোনও প্রয়োজনই ছিলনা কারণ তা সবদিক থেকেই খোলা ছিল। এই ছাউনিতে সপরিবারে, দু’টি সন্তান সহ একটি পরিবার আরও দশজন শ্রমিকের সঙ্গে থাকতেন। কোনও পারিবারিক গোপনীয়তা ছিলনা। চুলাগুলি ছিল আলাদা। মেঝেতে ঘাস পাতা ছিল এবং তার ওপর রাত্রে শ্রমিকেরা শুতো। অবশ্য আবাসনের জন্য কোনও ভাড়া নেওয়া হত না। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে পরিবারটি ঘরে বসবাস শুরুর পরেই অন্য আট দশ জনকে ঐ ঘরে থাকতে দেওয়া হয়। শ্রমিকরা যেহেতু কোনও ভাড়া দিচ্ছে না অতএব তার কোনও মুখ গোমড়া করারও অধিকার নেই।

(২) ঘর অপেক্ষাকৃত ভাল। তাদের সংখ্যা খুব-ই কম এবং সাধারণতঃ সেগুলি দ্বারবান, খালাসি এবং ছুতোর মিস্ত্রিদের জন্য নির্দিষ্ট। এক লাইনে এক কামরার ঘরও রয়েছে এবং সেগুলি বিনা ভাড়ার। তাদের দেওয়াল হয় ছ্যাঁচা বেড়ার অথবা কাঁচা ইঁটের আর তাদের ছাদ হ’ল কাঠের বিমের। সেগুলি বন্ধ

ঘর, দরজাও রয়েছে কিন্তু হাওয়া চলাচল খুব কম। এখানে বলা দরকার যে, এই কুঠরিগুলি সাধারণ শ্রমিকদের জন্য নয়, সেগুলি আরও উঁচু পদের দক্ষ শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত। এখানে বলা দরকার যে, এখানেও কোনও শৌচাগার বা প্রস্রাবাগার নেই। ফলে এখানে যারা থাকেন তারা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খোলা জায়গায় যান। যে কথা আগেই বলা হয়েছে, এর ফলে তাদের গোদ (?) বা রক্তশূন্যতার মতো রোগ দেখা দেয়। শ্রমিকেরা এই আবাসনগুলিতে থাকতে চাননা যদিও মালিকেরা তাদের রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। শ্রমিকেরা বরং একদিকে চার থেকে ছয় মাইল হাঁটতে রাজি কিন্তু তাঁরা এ অনুনয় রাখতে রাজি নন। তাছাড়া তাদের নিজেদের ঘর তাদের আবাসনগুলির চেয়ে অনেক ভালভাবে তৈরি।"

আর একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করব, যেটিতে অভ্র খনিগুলিতে যেসব পেশাগত এবং অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব রয়েছে সেগুলির কথা বলা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"অভ্র খনিতে কর্মরত শ্রমিকেরা যেসব অসুখে ভোগেন সেগুলি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় যেমন (ক) যেগুলি খনন কাজ এবং কাজের পরিবেশের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধযুক্ত (খ) এবং অন্যান্য যেগুলির খনি এলাকার গঠন প্রকৃতি এবং গাছগাছালির থেকে উদ্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা বিহার এলাকা থেকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ করেছি।

(ক) নিম্নলিখিত রোগগুলি প্রথম শ্রেণীভুক্ত :—

(1) সিলিকসিস — এই রোগটি ফুসফুসের— স্ফটিকের বড় পাথর মেশিনের সাহায্যে ড্রিল করার ফলে, যে ধুলো ওড়ে তা শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলেই এই রোগের উৎপত্তি। মেশিনের ড্রিলের মুখ আট কোনা এবং তার মধ্যে দিয়ে একটা ফুটো সরাসরি চলে গেছে সম্পূর্ণ ড্রিলের মধ্য দিয়েই। মেশিনের সাহায্যে ড্রিল ঘোরানো হয় এবং স্ফটিকের গুঁড়ো প্রবল বেগে ড্রিলের ফুটো দিয়ে বার হয়ে সরাসরি ড্রিলারের শরীরে আঘাত করে। মুহূর্তে স্ফটিকের গুঁড়োর ঘন আবরণ ড্রিলারকে ছেয়ে ফেলে এবং সে সারাক্ষণ সেই ধুলো শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে। স্ফটিকের ছোট ছোট কনাগুলি তার দেহে প্রবেশ করে এবং তার ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। সিলিকসিসের প্রথম উপসর্গ হ'ল ব্রঙ্কাইটিস এবং তা ধীরে ধীরে সত্যিকারের সিলিকসিসের রূপ নেয়। এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি, কিন্তু

শ্রমিকদের মাত্রাতিরিক্ত উপস্থিতির জন্য তা আগেভাগে নির্ণীত হয় না। এই শ্রমিকেরা কৃষির মরশুমে চাষবাষের কাজে চলে যায় বলে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তারা বেঁচে যায়। যদি কোনও ড্রিলার টানা এক বছরের জন্য কাজ করে সে এই রোগের হাত থেকে বাঁচতে পারেনা এবং বছর পাঁচেকের মধ্যেই সে মারা যেতে পারে। একজন মালিক জানিয়েছেন যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি তার সেরা ষোলো জন ড্রিলারকে হারিয়েছেন। মনে হয়, এই রোগ, যা প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাণঘাতী তা থেকে ড্রিলারদের বাঁচানোর একমাত্র উপায় হল ভারতীয় খনি আইনের আওতাভুক্ত আদেশের বলে শুকনো মেশিন ড্রিলিং বন্ধ করে দেওয়া। খ্রিস্টিন মাইনিং কোম্পানি নিজে থেকেই তাদের কয়েকটি খনিতে ভিজিয়ে মেশিন ড্রিলিং ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু অন্য কোনও সংস্থাই এই যুদ্ধের সময়ে এ ধরণের কোনও পরিকল্পনা মাথায় আনছেনা। অবশ্য একথা এখানে বলা প্রয়োজন প্রায় সব কর্তৃপক্ষই বিধিবদ্ধ ভাবে শুকনো ড্রিলিং পদ্ধতি বন্ধ করার পক্ষেই তাদের মত ঘোষণা করেছেন।”

তারপর ডিসপেপসিয়া, বাত, ব্রঙ্কাইটিস এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকা পড়ে শোনানোর প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না। কিন্তু রিপোর্টের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদটির প্রতি আমি সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই :—

“কল্যাণমূলক কাজকর্মের অভাব চোখে পড়ার মতো। ক্যান্টিন, শিশু কল্যাণ, বিনোদন, জামা-কাপড় ধোয়া বা অন্যান্য সুবিধের কথা খনি অঞ্চলে সম্পূর্ণ আশ্রুত। বড় সংস্থাগুলি যেমন, খ্রিস্টিন মাইনিং কোম্পানি, চতুরাম হরিলরাম কোম্পানি এবং ইন্ডিয়ান মাইকা সাপ্লাই কোম্পানি, চিকিৎসা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে।”

এরপর তাঁরা বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন :—

“চিকিৎসা সাহায্য যেখানেই দেওয়া হোক, তা বিনামূল্যে। শিশু বা প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য কোনও বন্দোবস্ত করা হয়নি।”

এখন আমি দীর্ঘক্ষণ ধরেই এই রিপোর্টের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে যেতে পারি, যাতে বুঝা যাবে যে, অভ্র খনিগুলির শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ সত্যিই অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং সরকারের হস্তক্ষেপ করে সরকারের এই অভ্র খনি শ্রমিকদের ব্যাপারে কিছু করার সময় এসেছে।

পরবর্তী প্রশ্ন হ'ল, এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেবার সবচেয়ে ভাল উপায়। এ বিষয়ে বলতে গেলে দুটি উপায় আছে। একটি উপায় হ'ল কর্তৃপক্ষের ওপর দায় বাধ্যতামূলক ভাবে চাপিয়ে দেওয়া এবং কয়েকটি কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দেওয়া, এবং তা কার্যকর করার ব্যাপার কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দেওয়া, আর তা অনুসন্ধান করার ক্ষমতা সরকারের নিজের হাতে রাখা — দেখা যাতে কর্তৃপক্ষের হাতে যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে তারা তা যথাযথ ভাবে পালন করছে। দ্বিতীয় উপায় হল, কল্যাণমূলক কাজগুলির দায়িত্ব সরকারের নিজের হাতে নেওয়া আর তার খরচ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নেওয়া। আমার মতে প্রথম উপায়টি নিখুঁত নয়, এর দু'টি কারণ আছে। কারণ বিভিন্ন মালিকের, কল্যাণমূলক কাজের খরচ বইবার মতো বিভিন্ন ক্ষমতা রয়েছে। তাহলে ছোট সংস্থার মালিকদের, আইনে বর্ণিত প্রয়োজনীয় মান বজায় রাখা সম্ভব নাও হতে পারে। দ্বিতীয়ত সরকারের পক্ষে এতো বিশাল সংখ্যক ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা সম্ভব হবে না, যারা সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে নজর রাখবে যে নির্দ্ধারিত মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা। অতএব সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, সরকারের নিজের হাতে কাজের দায়িত্ব নিয়ে এবং শিল্পদ্যোগীদের সেই কল্যাণমূলক কাজগুলির ব্যয়ভার বহন করতে বাধ্য করাই হবে তুলনায় ভাল পদ্ধতি। স্যার, এই নীতির ওপরেই অভ্র শিল্পের খনি শ্রমিক কল্যাণের আইনটির ভিত্তি করা হয়েছে। যদি অনুমতি দেন তো বলি, ভারত সরকারের কথা বলতে হলে, এটি একটি নতুন নীতি যা তারা গ্রহণ করেছে। সভা অবগত আছে যে, যুদ্ধের সময়, কয়লা খনিতে কর্মরত মানুষদের জন্য কল্যাণমূলক কাজের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। অধ্যাদেশের দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় যে নীতি রয়েছে, তা অধ্যাদেশের নীতিগুলির থেকে অভিন্ন। যে নীতির ওপর ভিত্তি করে এই ব্যবস্থাগুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বিশদ ভাবে বলা।

স্যার, আর একটি বিষয় আছে যার সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করতে চাই। মাননীয় সদস্যারা লক্ষ্য করবেন, বিলের অধীনে দু'টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, কারা কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেবে কারা এই তহবিল চালাবে এবং কিভাবে অর্থ ব্যায় করা হবে। একটি উপদেষ্টা কমিটি হবে মাদ্রাজ প্রদেশের জন্য এবং অপরটি হবে বিহার প্রদেশের জন্য। কয়েকজন সদস্য মনে করতে পারেন, যে অপর একটি অভ্র উৎপাদনকারী এলাকাকে যথা, রাজপুতানাকে বিবেচনা থেকে বাদ দিতে সরকার কোনও কারণ দেখালেন না কেন। আমি সভার কাছে ব্যাখ্যা

করতে চাই, ঠিক কি কারণে আমরা রাজপুতানার জন্য তৃতীয় একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে মনে করেছি। রাজপুতানা, বর্তমানে অভ্র শিল্পে খুব-ই ছোট স্থান অধিকার করে আছে এবং আমি সে ব্যাপারে সভাকে কিছু পরিসংখ্যান জানাতে চাই। ভারতে অভ্র খনির কথা ধরুন। আমার কাছে ১৯৪১ সালের পরিসংখ্যান রয়েছে। বিহারে ১৯৪১ সালে খনির সংখ্যা ছিল সর্বমোট ৬২৩। তাদের মধ্যে যেগুলিতে সারা বছর কাজ হ্‌ত, সেগুলির সংখ্যা ছিল ২৯৭। মাদ্রাজে সংখ্যা ছিল ১০৮ তার মধ্যে সারা বছর যেগুলিতে কাজ হ্‌ত তাদের সংখ্যা ছিল ৪৭, অপরদিকে রাজপুতানায় যদিও মোট সংখ্যা ছিল ৬২, যেগুলিতে সারা বছর কাজ হ্‌ত তাদের সংখ্যা ছিল ৮। শ্রমিকদের সংখ্যা ধরে আমার কাছে ১৯৪৩ সালের পরিসংখ্যান রয়েছে। পরিসংখ্যান হ'ল এইরকম। বিহারে অভ্র খনিগুলিতে মোট শ্রমিকসংখ্যা হ'ল ৮১,৪৩১; মাদ্রাজে ১৮,৩৭৯; রাজপুতানায় মাত্র ১৫,০০০। সেই জন্য ভাবা হ'ল রাজপুতানার জন্য পৃথক একটি কমিটি না করাই ভাল। কারণ খুব স্বাভাবিক। এইসব পরামর্শদাতা কমিটিগুলির জন্য প্রশাসনিক খাতে প্রচুর অর্থ ব্যায় হয়। এবং আমি চাইনা যে, তহবিলের অর্থ শুধুমাত্র প্রশাসনিক কাজেই আমাদের সাধ্যের বাইরে ব্যায়িত হোক। অতএব আমরা প্রস্তাব করছি যে, একটি কমিটি না রেখে ব্যয় সঙ্কোচ করা ভাল এবং বিষয়টি অন্যভাবে সংস্থান করা ভাল। স্যার, আমি জানিনা এই বিলের অন্য কোনও ধারা রয়েছে কিনা যার বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। সভায় দেখা যাবে যে, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এবং আমিও এই বিলটিকে বিধিবদ্ধ করতে অত্যন্ত আগ্রহি।

আমি মাননীয় সদস্যদের নামে একটি সংশোধনী পেয়েছি যার আসল উদ্দেশ্য হ'ল এই বিলটিকে সিলেক্ট কমিটির কাছে পাঠানো। আমি বিলটিকে সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে ইচ্ছুক নই, বলা যায় আমি বিরোধী। কারণ, আমি মনে করি না, বিলটি এতো বিতর্কিত বা জটিল যাতে সিলেক্ট কমিটির তাকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে সময় ব্যয় করতে হয়। তা সত্ত্বেও, সভার সদস্যরা বিষয়টি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাবার জন্য এতোটা আগ্রহী হলে, যদি তাঁরা একমত হন যে, সিলেক্ট কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া অথবা নির্দেশ দেওয়া উচিত, যাতে অধিবেশন শেষ হবার আগেই তারা বিলটি সভায় ফেরত পাঠায়, যাতে বিলটি দ্বিতীয় বারের জন্য আমি সভায় পেশ করতে পারি, এ ধরনের কোনও সংশোধনীর ক্ষেত্রে আমি প্রতিবাদ জানাব না। স্যার, আমি প্রস্তাব পেশ করছি।

মাননীয় সভাপতি : প্রস্তাব পেশ হ'ল : "অভ্র খনি শ্রমিকদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পে অর্থের যোগান দেওয়ার লক্ষ্যে একটি তহবিল গড়ার প্রস্তাব করে এই বিলটি আলোচনার জন্য গৃহীত হোক।"

মাননীয় আহমেদ ই.এইচ. জাফর (বোম্বে দক্ষিণ ডিভিশন : মুসলমান গ্রামীন) : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি : বিলটি মাননীয় শ্রী অশোক রায়, মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর, কুমারী মনিবেন কারা, শ্রী এস.সি. যোশি, বাবু রাম নারায়ণ সিং, শ্রী আর. ভেঙ্কটসুব্বা রেড্ডিয়ার, শ্রী গৌরীশঙ্কর শরণ সিং, শ্রী এ.করুণাকর মেনন, অধ্যাপক এন.জি.রঙ্গ, শ্রী জিওফ্রে ডব্লু. টাইসন, শ্রী মদনধারি সিং, ড: জিয়াউদ্দীন আহমেদ, খান বাহাদুর হাফিজ, এম. গজনফরুল্লা, শ্রী মহম্মদ নাওম্যান, এবং প্রস্তাবের উত্থাপক কে নিয়ে গঠিত সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি পাঠানো হোক এবং নির্দেশ দেওয়া হোক যে, ১৫ই এপ্রিল ১৯৪৬-এর মধ্যে যেন প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এবং যতো জন সদস্যের উপস্থিতি বৈঠকের জন্য প্রয়োজন, তার সংখ্যা হবে পাঁচ।

মাননীয় সভাপতি : ১৫ তারিখ কি ঠিক আছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : না, তা খুব দেরি হয়ে যাবে।

* * * * *

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি বলিনি যে আমি রাজপুতানাকে বাইরে রাখব। আমি একটি পৃথক কমিটি গঠন করব।

দেওয়ান চমনলাল : আমি শুনিনি যে, আমার মাননীয় বন্ধু একটি পৃথক কমিটি গঠন করবেন। আমি তাঁকে "অন্য কোনও উপায়" বলতে শুনেছি। এখন আমি আনন্দিত। যতদূর সম্ভব এই ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজপুতানাকে বাদ রাখা হ'ল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : ওখানে এই তহবিলের সাহায্যে সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে।

দেওয়ান চমনলাল : বিহার এবং মাদ্রাজের অর্থ কি রাজপুতানার শ্রমিকদের সাহায্যার্থে নেওয়া হবে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমরা অন্য কোনও সংস্থা, অন্য কোনও সংগঠনকে শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য নিযুক্ত করতে পারি। তহবিল থেকে অর্থ যোগান দেওয়া হতে পারে।

* * * * *

***মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :** এই বিলের বিরুদ্ধে যেসব সমালোচনা করা হয়েছে তার উত্তর দিতে আমি খুব বেশি সময় নেব না। তিনজন বক্তা যে সব বিষয় উত্থাপন করেছেন তার সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে আমি আমার মতামত জানিয়ে দিতে চাই। প্রথমে আমার বন্ধু শ্রী টাইসন উত্থাপিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে চাই। আমার প্রস্তাবের সমর্থনে আমি যে ভাষণ দিয়েছি তাতে অভ্রের উদ্বৃত্ত মজুত ভাণ্ডার অথবা অতিরিক্ত সেস বসানোর প্রস্তাব এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রী রুবেন-এর প্রতিবেদন সম্পর্কে আমি কোনও উল্লেখ করিনি। স্যার, আমি ইচ্ছাকৃত ভাবেই এই বিষয়গুলির উল্লেখ করিনি কারণ আমি জানতাম আমার বন্ধু শ্রী টাইসন এই বিষয়গুলি উত্থাপন করবেন এবং আমাকে তার উত্তর দিতে হবে। আমি তা করিনি। তার কারণ আমি সভার সময় বাঁচাতে চেয়েছিলাম।

এখন, স্যার, এ বিষয়ে অবস্থান হ'ল এই যে, যদিও অধ্যাপক আদরকর প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে শ্রম দফতর এবং ভারত সরকার সমাজকল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এই সিদ্ধান্ত অধ্যাপক আদরকরের প্রতিবেদন তৈরির অনেক আগেই শ্রম দফতর নিয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, শ্রম দফতরের নেওয়া সিদ্ধান্তকে বিচারপতি শ্রী রুবেন অভ্র শিল্পের ওপর তাঁর প্রতিবেদনে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি নিজেই তাঁর প্রতিবেদনে পরামর্শ দিয়েছেন যে, উৎপাদিত অভ্র অথবা তাঁর রপ্তানির ওপর সাধারণ শুল্ক আরোপ করা হোক এবং সংগৃহীত সেসের ৫/১২ ভাগ, সংগৃহীত সাধারণ সেস অভ্র খনিগুলির শ্রম কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। অতএব এই ব্যবস্থা নিতে গিয়ে আমরা কোনওমতেই শ্রী রুবেনের প্রতিবেদন থেকে বিচ্যুত হচ্ছিনা। আমরা যা করেছি তা হ'ল, শ্রী রুবেনের মতানুসারে কেবলমাত্র একটি সেস ধার্য করে তা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিতরণ ও বরাদ্দ করার পরিবর্তে আমরা কল্যাণের জন্য একটি পৃথক তহবিল গঠন করা এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু ব্যবস্থার জন্য শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে আর একটি তহবিল থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করেছি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ হ'ল স্বাভাবিক যে, কল্যাণমূলক তহবিলের প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকবে একটি পৃথক সংস্থা আর অন্য উদ্দেশ্যে গঠিত তহবিল পরিচালনা করবে অপর একটি সংস্থা। এখানেই, আমার মাননীয় বন্ধু শ্রী টাইসন দেখতে পাবেন যে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত শ্রী রুবেনের প্রতিবেদনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিসূচক।

---

*আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড ৫, ৯ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৭৫৭-৫৯

অতিরিক্ত সেসের ক্ষেত্রে, আমার মাননীয় বন্ধু দেখতেই পাবেন, আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে সেস অত্যন্ত কম মাত্রায় ধার্য করেছি। রুবেনের প্রতিবেদনে ছয় শতাংশ হারে ঐ সেস ধার্য করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল.....

শ্রী জিওফ্রে ডব্লু. টাইসন : শ্রম অথবা সাধারণ?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : সাধারণ। পরবর্তী কালে এই বিষয়টি নিয়েই বিচার বিবেচনা করার দরকার যে সেসের মাত্রা কি হবে? যাতে সেসের সাহায্যে কল্যাণমূলক এবং অন্যান্য কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়।

দেওয়ান চননলাল : আমার মাননীয় বন্ধু ঠিক কতটা আশা করছেন?

মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকর : অপেক্ষা করুন, আমি একটু পরেই এ বিষয়ে আসছি। উদ্বৃত্ত মজুত ভাণ্ডার সম্পর্কে আমি সভাকে জানাতে চাই যে, ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকার বাহাদুরের দীর্ঘদিন ধরে অভ্রের উদ্বৃত্ত মজুত ভাণ্ডারের বিলি ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চালিয়ে আসছে, যে ভাণ্ডার মজুত রয়েছে প্রাদেশিক সরকারের কাছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই মজুত উদ্বৃত্তের বিলি বন্টনের ফলে অভ্র শিল্পের কোনও ক্ষতি হবে না। আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে আর কিছুদিনের মধ্যেই, ভারত সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারের বন্দোবস্তে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে তা জনসাধারণকে জানানোর উদ্দেশ্যে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। আমি একথাও জানাতে চাই যে এই ব্যবস্থার প্রতি অভ্র শিল্পের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি সভাকে জানাতে চাই যে, শিল্পের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সম্মতি নিয়েই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রশ্নের প্রথম অবতারণা করি আমি ১৯৪৪ সালের ২৯শে এপ্রিল কোডারমায় এক সম্মেলণে, যে সম্মেলণে আমি পৌরহিত্য করি এবং অভ্র শিল্পের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন, আর আমি আনন্দ অনুভব করি যে, শিল্প সামগ্রিক ভাবে আমার কল্যাণ তহবিল গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। সবশেষে, ১৯৪৫ সালের ১৯শে ডিসেম্বর তৃতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। ধানবাদে এই সম্মেলণে পৌরহিত্য করেন শ্রম দফতরের সচিব, যেখানে অভ্র উৎপাদক এবং সরকারের মধ্যে এক চূড়ান্ত সমঝোতা হয়। আমি জানাতে চাই যে, শিল্পের ওপর শুল্ক বসাতে আমাদের প্রস্তাব অভ্র উৎপাদণের ক্ষেত্রের সুযোগ গ্রহণ করতে শিল্পকে নিরুৎসাহ করেছে বলে মনে

হয়নি, আমি দেখছি যে গত কয়েক মাসের মধ্যে আমার জানা তিনটি নতুন কোম্পানি তিনটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে। উদাহারণস্বরূপ মাইকান্টিক অ্যান্ড মাইকা প্রোডাক্টস কো. লি. নামে মাদ্রাজের একটি কোম্পানি পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে একটি নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে। অপর একটি কোম্পানি কলকাতা থেকে সরস্বতী মাইকা ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড পাঁচ লক্ষ্য টাকার মূলধন নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং আমি খ্রিস্ট্রিয়ান মাইনিং ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-ও অভ্রের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যে অভ্রের খনি স্থাপনের জন্য শেয়ার ছাড়ার আবেদন করেছি। এই ঘটনাগুলি একথাই দেখায় যে, সেস ধার্য করা কি শিল্প সংস্থাগুলির চোখে দুঃখজনক নয়। এবং আমি মনে করি যে তারা বিশ্বাস করে যে, শিল্পের পক্ষে কল্যাণমূলক সসের বোঝা বহন করা সম্ভব হবে।

আমার বন্ধু দেওয়ান চমনলাল যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সে ব্যাপারে বলতে গিয়ে আমি প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই জন্যে যে, যে রিপোর্টটি তিনি আগেই চেয়েছিলেন তার কোনও প্রতিলিপি তাঁকে দিতে না পারার জন্য আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি, এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। রিপোর্টটি হাতে পেলে তিনি যা করতেন তা হ'ল, বড় জোর যে দৈর্ঘের ভাষণ তিনি দিয়েছেন তার দ্বিগুণ দৈর্ঘের ভাষণ দিতেন।

এখন প্রশ্ন, এই সেস থেকে কত রাজস্ব আদায় হবে। আমি সভাকে নির্দিষ্ট কোনও সংখ্যা দিতে পারছি না। তার কারণ খুবই স্বাভাবিক। অভ্রের উৎপাদন নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকে না। যেমন, আমার কাছে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত পরিসংখ্যান রয়েছে। ১৯৩৪ সালে উৎপাদিত অভ্রের মূল্য ছিল ৬,৩০,৫২৫ টাকা। যখন ১৯৪৪ সালে তা ছিল ২,৭৩,০১,৪৫৮ এবং অন্তবর্তী সময়ে বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন পরিসংখ্যান রয়েছে। অতএব আমার পক্ষে সভাকে নির্দিষ্ট কোনও পরিসংখ্যান দেওয়া নিষ্প্রয়োজন অতএব যুদ্ধ পরবর্তী কালে শিল্পে স্থিতিশীলতা আসার জন্য আমাদের কিছুটা সময় দেওয়া উচিত। কিন্তু ১৯৪৪ সালের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে হিসাবে করে আমি দেখেছি, সেস হবে পাঁচ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। অবশ্য আমি মনে করি যে, তা টাকার অঙ্কে বড় কিছু নয়। ব্যক্তিগত ভাবে, আমি যা বলতে চাই তা হ'ল, আমি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি একটি নীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। যদি পরে দেখা যায় যে তহবিল যথেষ্ট নয়, তাহলে দায়িত্বে সরকারের যে সদস্য থাকবেন তাঁর পক্ষে এগিয়ে এসে সেস বাড়িয়ে

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করে সমাজ কল্যাণমূলক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, যা অন্য কোনও ভাবেই সম্ভব হবেনা।

অভ্র ক্রয় মিশন, যার সম্বন্ধে আমার বন্ধু উল্লেখ করেছেন, এই যে বিলটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কহীন, অতএব ঐ অভ্র ক্রয় মিশনের কার্যকলাপ সম্পর্কে ওঠা কোনও প্রশ্ন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। কিন্তু আমার বন্ধুকে আমি জানাতে চাই যে, এ সম্পর্কে যতোটা জানতে পেরেছি, এই দেশে অভ্র উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্পপতিরা তাঁদের নিজেদের কোনও ক্ষতি তো করেনইনি বরং আমি নিশ্চিত যে, তাঁরা সাধারণের চেয়ে বেশিই লাভ করেছেন।

আমার বন্ধু দেওয়ান চমনলাল খনি আইনের প্রশাসনিক শিথিলতা নিয়ে অনেক সময় অতিবাহিত করেছেন। তিনি শিশুদের নিয়োগ সম্পর্কে এবং মহিলাদের নিয়োগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আগেই বলেছি, এ সম্পর্কে আমি অবহিত, এবং শ্রম দফতর অভ্র খনি শ্রমিকদের সম্পর্কে দেওয়া শ্রী আদয়করের রিপোর্টে উল্লেখিত সমস্ত ত্রুটিগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে প্রস্তুত আছে। আর সরকারের হাতে সময় থাকলে, এমনকি এই অধিবেশনেই এই ক্ষতিকর ব্যবস্থাগুলি দূর করতে একটি বিল আনা যেতে পারে। তা করতে দেরি হবেনা বলে আমি নিঃসন্দেহ।

আমার বন্ধু রামনারায়ণ সিংয়ের উত্থাপিত বিষয়ে এবার আসছি। তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তাহল এই যে, এই ব্যবস্থাটি অত্যন্ত বিলম্বিত। তিনি বলেছেন, এই অভ্র শিল্প ছিল, ক্ষতিকর ব্যবস্থাগুলি ছিল, সরকারও ছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। আমি তাঁকে একটা কথাই বলতে চাই যে, তিনি একটা কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন যে, তিনিও ছিলেন এবং বহু বছর ধরে। তিনি যদি সুযোগ পাওয়া মাত্রই সরকার এবং শিল্পপতিদের বিবেককে শক্তি যোগাতে এবং সংগঠিত করতে পারতেন, তাহলে যে বিলম্বের অভিযোগ তিনি করছেন তা কখনোই ঘটত না। আশা করি, তিনি মানবেন কখনও না হওয়ার চেয়ে বরং দেরিতে হওয়া ভাল।

এই তহবিলের প্রশাসনিক ব্যাপার সম্বন্ধে, আমার মনে হয় তিনি যা বলতে চেয়েছেন তা হ'ল প্রশাসন প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আমি দুঃখিত, আমি এই নীতি গ্রহণ করতে পারছি না। এই আইন কেন্দ্রীয় আইন। এই আইনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারেরই। তহবিলও কেন্দ্রীয় আইনের

বলেই গঠিত। এই তহবিল গঠন করা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে হয়, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সমস্ত তহবিল প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বরাদ্দ করা অন্যায্য কাজ হবে। সেখানে সেই বরাদ্দ প্রদেশের সাধারণ রাজস্বের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হবে এবং ব্যয় করা হবে— অবশ্যই প্রাদেশিক সরকারগুলির ইচ্ছানুযায়ী খামখেয়ালিপনা অনুযায়ী নয়। আমার মতে, যেহেতু তহবিলটির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, যেহেতু তহবিলটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত এবং যেহেতু একটি ট্রাস্ট হিসাবে ভারত সরকার চালাবেন, এটি সর্ব উপায়েই বাঞ্ছিত — শুধু বাঞ্ছিতই নয় প্রয়োজনীয়। যে কেন্দ্রীয় সরকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই তহবিলটির পরিচালনার ব্যাপারে নিজের হাতে রাখা উচিত। এক-ই সঙ্গে আমি আমার মাননীয় বন্ধুকে বলতে চাই সম্ভবত তিনি কয়লাখনি শ্রম কল্যাণ তহবিল কিভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখেন নি। অতএব আমি তাঁকে এ ব্যাপারে কয়েকটি বিস্তারিত তথ্য দিতে চাই, কারণ কয়লাখনি শ্রম কল্যাণ তহবিল পরিচালনাকেই মডেল হিসাবে ধরা হবে — এমনকি কেবলমাত্র মডেল-ই নয় তার ধাঁচেই এই তহবিল পরিচালনা করা হবে। কয়লাখনি শ্রম কল্যাণ তহবিলের ক্ষেত্রে, পরিচালন ভার সাধারণত একজন কমিশনারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যিনি সাধারণত একজন প্রাদেশিক অফিসার, যাঁকে প্রাদেশিক সরকারের কাছে ধার নেওয়া হয়েছে। তাঁকে জানাতে চাই, যে ব্যক্তি কয়লা খনি কল্যাণ তহবিল পরিচালনা করছেন সেই অফিসারকে বিহার সরকারের কাছ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে। আর তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন অভ্র তহবিলের ক্ষেত্রে একজন অফিসারকে ধার দেওয়ার জন্যে আমরা বিহার সরকারের কাছে আবেদন জানাব। আমি যে কথা বললাম এবং বিলেও যার সংস্থান রয়েছে, কমিটি এমন ভাবে গঠন করা হবে যাতে অভ্র শিল্পের যে সব প্রতিনিধি বিহার এবং মাদ্রাজ থেকেও থাকবেন তাঁরা স্থানীয় ব্যক্তি হবেন এবং স্থানীয় পরিস্থিতি জানবেন। তাছাড়া, কয়লা খনি কল্যাণ তহবিলের গঠন অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী যে আদেশ দেওয়া রয়েছে যে প্রাদেশিক সরকারগুলি পরামর্শদাতা কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য তাদের প্রতিনিধি পাঠাবে। অভ্র পরামর্শদাতা কমিটির ক্ষেত্রেও একই নিয়ম অনুসৃত হবে। আমরা নিয়মে সেই সংস্থান রাখব, এই কমিটিগুলি প্রতি তিন মাসে একবার মিলিত হয়, আলোচ্যসূচী প্রস্তুত হয় এবং পরামর্শ নেওয়া হয়। উৎপাদক, মালিক; শ্রমিক এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির থেকেও লোক নেওয়া হয়। পরামর্শদাতা কমিটির কাছে বাৎসরিক বাজেট পেশ করা হয়। তাদের পরামর্শ নেওয়া হয়।

তাঁদের পরামর্শ পাওয়ার পর যেসব ক্ষেত্রের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে তহবিল থেকে কাজ শুরু করা হয়।

আমি বিশ্বাস করি আমার বন্ধু রামনারায়ণ সিং এখন বুঝতে পারবেন যে, কেন্দ্র কোনও অরাজকতার সৃষ্টি করবে না। উৎপাদক, শ্রমিক এবং প্রাদেশিক সকারগুলির মধ্যে তহবিলের পরিচালনার ব্যাপারে অনেক বিকেন্দ্রীকরণ, অনেক সহযোগিতা রয়েছে। স্যার, আমি মনে করি, এই বিলের ওপর বক্তৃতাগুলিতে এমন কোনও বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে আমি যার উত্তর দিইনি এবং আমি মনে করি এ বিষয়ের ওপর আমার আর কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

মাননীয় সভাপতি : প্রশ্ন হল :

"এই বিল সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক যা গঠন করা হয়েছে এঁদের নিয়ে মাননীয় শ্রী অশোক রায় মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর, শ্রীমতী মনিবেন কারা, শ্রী এস.সি. যোশি, বাবু রামনারায়ণ সিং, শ্রী এ. করুনাকরণ মেনন, অধ্যাপক এন.জি. রঙ্গ, শ্রী জিওফ্রে ডব্লু. টাইসন, শ্রী মদনধারি সিং, ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, খান বাহাদুর হাফিজ, এম. গজনফরুল্লা, শ্রী মুহম্মদ নাওম্যান এবং উত্থাপক, তাঁদের বারোই এপ্রিলের ১৯৪৬, এর মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে এবং মিটিং হওয়ার জন্য উপস্থিতির সংখ্যা হতে হবে পাঁচ।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হ'ল।

□ □ □

৬৬

*শিল্পে নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : মাননীয় সভাপতি, আমি প্রস্তাব করছি।

"শিল্প সংস্থায় কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিয়োগের শর্তাবলী সরকারি ভাবে সুনির্দিষ্ট করতে চেয়ে আনা বিলটি অলোচনার জন্য গৃহীত হোক।"

স্যার, এটা খুব-ই সহজ ব্যবস্থা এবং আমি যা দেখতে পাচ্ছি, এতে কোনও মতবিরোধ নেই। এই বিলের উদ্দেশ্য হল কোনও দায়িত্বশীল শর্তাবলী এবং ঐ উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনও অফিসারের লিখিত বিবৃতি এবং তা নথিভূক্ত করণ, এবং কোনও নির্দিষ্ট সংস্থায় নিযুক্তির শর্তাবলীর রেজিস্টার প্রস্তুত করা। নিযুক্তির শর্তাবলীর যথার্থতা এবং যৌক্তিকতার ন্যায়বিচার এই বিলের উদ্দেশ্য নয়। এই বিলের অধীনে প্রত্যেক নিয়োগকর্তাই যেকোনও নিযুক্তির শর্তাবলী আরোপ করতে পারেন। এই বিলে যা করতে চাওয়া হয়েছে তাহল এই যে, কোনও নিয়োগকর্তা, তাঁর সংস্থার কর্মীদের নিযুক্তির শর্তাবলী নির্দ্ধারণ করার পর তার সরকারের একজন অফিসারের হাতে তুলে দেবেন, আর সেই অফিসার নিযুক্তির সেইসব শর্তগুলির পর্যালোচনা করবেন, তাঁর রেজিস্টারে নথিভুক্ত করবেন, এবং সেই রেজিস্টারই শর্তবলি কি ছিল তা নির্দ্ধারিত করার ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে। অন্যভাবে বলতে হলে, বিলটিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণের একটি নিয়ম বলা যেতে পারে, যাতে করে যদি বিলটি পাস হয়, যদি শর্তাবলী কি ছিল সে নিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ এবং শ্রমিকদের মধ্যে কোনও বিরোধ উপস্থিত হয়। আইন যে তথ্য প্রমানকে স্বীকৃতি দেবে তা হল, নথি ভুক্ত প্রমাণ, কর্তৃপক্ষকে সার্টিফাইয়িং অফিসারের দেওয়া একটি প্রত্যায়িত কপি, এবং মৌখিক তথ্য প্রমাণাদি গ্রাহ্য হবে না। সভা যদি এই বিলের ১২ নম্বর খণ্ডের

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড ৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৯১৪

প্রতি দৃষ্টি দেয়, তাহলে তারা দেখবে যে, এই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভাবে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

" কোনও মৌখিক প্রমাণ, যার ফলে এর সঙ্গে যুক্ত হওয়া, অথবা ভিন্ন হওয়া বা কার্যকর আদেশের বিরুদ্ধে যেতে পারে, এমন হলে তা কোনও আদালতে গ্রাহ্য হবে না।"

এটাই আসলে নতুন বিলের উদ্দেশ্য। এর সঙ্গে নতুন কোনও নীতি জড়িত নয়। বম্বেতে এ ধরনের একটি আইন এখনই রয়েছে আর এই বিল যা করতে চেয়েছে তা হল ঐ আইনের ধারাগুলিকেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কার্য্যকর করতে।

বিলটিতে অনেকগুলি ধারা রয়েছে যেগুলি কেবলমাত্র পদ্ধতির বিষয়, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শর্তাবলী পাওয়ার পরে, সার্টিফাইং অফিসার কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শর্তাবলী পাওয়ার বিষয়টি নিয়ে কিভাবে অগ্রসর হবেন তাই নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে। কোনও সার্টিফিকেট দেওয়ার আগে তাঁকে ঐ সংস্থায় নিযুক্ত শ্রমিকদের বিজ্ঞপ্তি দিতে হবে এবং তাদের কথা শুনতে হবে। কর্তৃপক্ষও যদি দেখেন যে, যেসব শর্তাবলী তিনি দিয়েছেন সেগুলি এই আইনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে সঙ্গতিসূচক এবং সার্টিফাইং অফিসার তাঁকে তা সত্ত্বেও সার্টিফিকেট দিচ্ছেন না, তাহলে তাঁর আদালতে আপীল করে সেই অফিসারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করানোর অধিকার রয়েছে।

সভার সময় যখন এতো কম তখন আমি এই বিলের প্রতিটি ধারা বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কিন্তু এই বিল শুধু প্রয়োজন তাই নয় কোনও জরুরি বলে সরকার মনে করছে তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি। এই বিলটি অপর আর একটি ব্যবস্থা— যেটি সরকার আনার কথা বিবেচনা করছেন তার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, সেই বিলটির বিষয় হল স্বাস্থ্য বিমা, যা সরকার আগামী অধিবেশনে নিয়ে আসতে চান। স্বাস্থ্য বিল একজন কর্মীকে তার অধিকার সম্পর্কে কিছু সুবিধে প্রদান করে ; স্বাস্থ্য বীমা তহবিল অর্থ দেওয়ার ব্যাপারে এ কিছু দায়বদ্ধতা এনে দেয়। এই অধিকার এবং দায়িত্ব অত্যন্ত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, উদারহণস্বরূপ বেতনের সঙ্গে, যা কর্মীরা বিভিন্ন সংস্থায় পাবেন। এখন, বিরোধ দেখা দিতে পারে। যেহেতু একজন কর্মী এই তহবিলে অর্থ দিতে বাধ্য। বিমা তহবিল থেকে একজন কর্মী কি ধরনের সুবিধা পেতে পারেন সে ব্যাপারেও বিরোধ দেখা দিতে পারে। সরকার মনে করেন

যে, একজন কর্মীর শর্তাবলী প্রত্যায়িত এবং নথিভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে যখন-ই বিরোধ উপস্থিত হবে, আমাদের সামনে বেতন এবং অন্যান্য যে শর্তসমূহে কর্মীরা বাঁধা পড়ে আছে। সেগুলি প্রস্তুত থাকবে। সত্যি বলতে কি, স্বাস্থ্য বিমা তহবিলের কাজ করানো অত্যন্ত কঠিন হবে, যতক্ষণ না আমরা শিল্প সংস্থায় কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন তুচ্ছ আপত্তি বিরোধ বা সন্দেহের উর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারছি।

এই কথা বলে আমি বিলটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

* * * * *

***মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর :** মাননীয় সভাপতি, বিলটির অনুমোদন চেয়ে আমি যে প্রস্তাব পেশ করেছি, তা যে এমন বিতর্কের সূত্রপাত করবে তা আমি ভাবতে পারিনি। আমি না বলে পারছিনা যে, আমি বিশেষত বিস্মিত হয়েছি আমার মাননীয় বন্ধু ড: স্যার জিয়াউদ্দিন আহমেদের বক্তৃতা শুনে। আমার আশঙ্কা যে, মধ্যাহ্নভোজের সময় তিনি অপাচ্য কিছু খেয়েছিলেন, যার ফলেই তিনি এ ধরনের বক্তৃতা দিলেন, কারণ আমরা জানি যে জিয়াউদ্দীন আহমেদ শ্রম আইন প্রণয়নের অন্যতম প্রবক্তা এবং এই সভায় আমাকে বলেছিলেন আরও অনেক বেশি ব্যাপক শ্রম আইন অবিলম্বে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিতে। আজ তিনি তাঁর পরিচিত সুরের সম্পূর্ণ বিপরীত সুরে ভাষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমি আনন্দিত যে, এই বিষয়ে তাঁর উত্থাপিত প্রসঙ্গের জবাব আমার বন্ধু শ্রী সিদ্দিকি সম্পূর্ণভাবে দিয়েছেন তাই সভাতে অবার তার পুনরাবৃত্তি করা আমার পক্ষে সমীচীন হবে না।

কেবলমাত্র তাঁর একটি প্রসঙ্গের বিষয়-ই আমি উত্তর দিতে চাই। তিনি বলেছেন যে বিলটির সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট নোটিশ পাননি। এ বিষয়ে অবস্থান হল এই: যে আলোচ্যসূচিতে বিলটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তা মাননীয় সদস্যদের কাছে গত শুক্রবার ৬ তারিখে প্রচারিত করা হয়। সেই আলোচ্যসূচিতে বিলটি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রথম বিবেচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় হিসাবেই নয়, সেখানে একটি ফুটনোটও যোগ করা হয়েছিল যাতে নিশ্চিত ভাবে বলা হয়েছিল যে বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হবে, শুক্রবার ১২-ই এপ্রিল ১৯৪৬, আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রথম বিষয় হিসেবে। আমি জানি না ছ'দিনের নোটিশ যথেষ্ট নয় বলে বিবেচিত হবে কিনা।

বিলটি সম্পর্কে বলতে হলে, আমি আশা করেছিলাম যে, ১৫ মিনিটের মধ্যেই আমি এর নিষ্পত্তি করতে পারব। কিন্তু বাস্তবে দেখছি যে আমরা এখনও অবধি

* আইনসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড ৫, ১২ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৩৯২৬

এই বিলের ওপর প্রায় এক ঘণ্টা পনেরো মিনিট ব্যয় করেছি এবং তাই আমি বুঝতে পারছি না কি করে কেউ বলেন যে আমি বিষয়টি নিয়ে এই সভায় তাড়াহুড়ো করছি।

আমার বন্ধু শ্রী ইনস্‌কিপ বলেছেন যে বিষয়টি নিয়ে তাঁর মক্কেলদের সঙ্গে আলোচনা করার মতো যথেষ্ট নোটিশ তিনি পাননি। আমি না বলে পারছি না যে তিনি অতীত ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ভুল বুঝেছেন। বিলটি স্থায়ী শ্রম কমিটির সামনে পেশ করা হয় ১৯৪৪ সালে। কমিটি সম্পূর্ণভাবে একমত ছিল এবং কমিটি পরামর্শ দেয় যে, বিলটি এতো প্রয়োজনীয় এবং নির্বিরোধী প্রকৃতির যে সরকার, তা অধ্যাদেশের আকারেও পাশ করিয়ে নিতে পারে, যা আমরা করিনি। তারপর বিষয়টি ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে আলোচিত হয়।

আর একটি প্রসঙ্গ যা তিনি উত্থাপন করেছেন তা হল যে, বিলটি এখন যে আকারে সভায় পেশ করা হয়েছে, ঠিক সেই আকারে শ্রম সম্মেলনে পেশ করা হয়নি। আমি তাঁকে বলতে চাই, তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভুল। সরকার ত্রি-পাক্ষিক সম্মেলনে বিলটি যে আকারে পেশ করেছিল তার কোনও পরিবর্তন ঘটায় নি।

আমার বন্ধু অধ্যাপক রঙ্গ ছোট ছোট কল-কারখানার আইনটি কতোটা প্রয়োগ করা যাবে সে সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। আমার বন্ধু শ্রী গুইল্ট—ও বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বলেছেন যে আমার তা ব্যাখ্যা করা উচিত। কেউ যদি এই বিলের ১ নম্বর খণ্ডের (৩) উপখণ্ড পড়ে থাকেন নিশ্চয়-ই এমন কোনও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী থাকবেন না যে বিলটি কেবলমাত্র যেসব শিল্প সংস্থা ১০০ বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগ করে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, কারণ সেই খণ্ডেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার থাকবে এই বিলের কার্য্যকারিতাকে সেই সবক্ষেত্রে প্রসারিত করার "যেসব শ্রেণীর শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে যথাযথ সরকার সময়ে সময়ে সরকারি গেজেটে নোটিশ জারি করে, এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করবে। অতএব সরকার যে সব সংস্থা একশো-র কম লোক নিয়োগ করেছে, তাদের ক্ষেত্রেও এটি কার্য্যকর করার ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছে। অতএব, এটি কেবলমাত্র যেসব শিল্প সংস্থা একশো বা তার বেশি লোক নিয়োগ করে প্রাথমিক ভাবে তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং যেসব সংস্থা কম সংখ্যায় লোক নিয়োগ করে, তাদের বাদ রাখা হবে না এমন আশঙ্কা অমূলক এবং ভিত্তিহীন।

দেওয়ান চমনলাল : আমি কি এক মিনিটের জন্য এ বিষয়ে কিছু বলতে পারি? দুই-এর পাতায় 2 (e) (ii) ধারায় শিল্প সংস্থার সংজ্ঞা হিসাবে বলা হয়েছে, এর অর্থ একটি কারখানা, যার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কারখানা আইনের দ্বিতীয় ভাগে (i) নম্বর ধারায়। আমি ধরে নিচ্ছি কারখানার যে সংজ্ঞা সেখানে দেওয়া হয়েছে, তা কারখানা আইনের আওতাধীন, কিন্তু কুড়ি জনের একটি কারখানা "শিল্প সংস্থার" যে সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে তার আওতায় আসবে না।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : কিন্তু সরকার তাকে কুড়ি জনের একটি কারখানার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারে।

দেওয়ান চমনলাল : তা পারে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তা করা উচিত।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : যাদের এক'শ জন করে আছে অমরা তাদের দিয়ে শুরু করছি।

শ্রী লেসলি গুইল্ট : কম থেকে শুরু করছেন না কেন?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আরও কম সংখ্যা দিয়ে শুরু করার ব্যাপারে সরকারের কোনও বাধা নেই।

দেওয়ান চমনলাল : যদি ভারতীয় কারখানা আইন এমন কোনও সংস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, যার কর্মী সংখ্যা কুড়ি, তাহলে কেন এক-ই ভাবে অপর একটি শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে এই বিলের আওতাধীনে প্রযোজ্য হবে না?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : এখন যেমন রয়েছে তাতে এই আইনে এমন কিছু নেই, যাতে যেসব কারখানা কুড়ি জনকে নিয়োগ করেছে তাদের ক্ষেত্রেও সরকার দায় দায়িত্ব দিতে পারবেন না। আমরা অন্তত শুর করতে চেয়েছি। এছাড়া প্রশাসনিক যন্ত্রকেও অনেক বড় হতে হবে যদি প্রতিটি কারখানার ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করতে হয়। সার্টিফাইং অফিসার এবং আবেদন কর্তৃপক্ষ অনেক বেশি সংখ্যায় হবে, এবং কোনও প্রাদেশিক সরকার-ই সেই প্রশাসনিক যন্ত্র দিতে সক্ষম হবে না। অত্যন্ত সাধারণ ভাবে শুরু করার প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা প্রসারিত করার ক্ষমতা নিজেদের কাছে রাখলেই হল।

বক্তৃতাগুলিতে উত্থাপিত এই প্রস্তাবের ওপর আর কোনও প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

স্যার, আমি প্রস্তাব করছি :

মাননীয় সভাপতি : প্রশ্ন হল:

"বিলটি সংশোধিত আকারে গৃহীত হোক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

□ □ □

৬৭

*অভ্রখনি শ্রমিক-কল্যাণ তহবিল বিধেয়ক

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর (শ্রম সদস্য) : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি:

"অভ্র খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করার লক্ষ্যে রচিত বিল সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী গৃহীত হোক।"

বিলটি বাস্তবিক পক্ষে যেমন ছিল প্রায় তেমন ভাবেই সিলেক্ট কমিটির থেকে প্রকাশ পেয়েছে, যে পরিবর্তনগুলি সুপারিশ করা হয়েছে তা এতোই অকিঞ্চিতকর যে আমি মনে করি যে সভাকে তা জানিয়ে সভার সময় নেওয়া আমার পক্ষে ভুল হবে। অতএব আমি প্রস্তাবটি পেশ করা ছাড়া আর কিছুই করব না।

মাননীয় সহ-সভাপতি : প্রশ্ন হল:

"অভ্র খনি শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কাজকর্মের জন্য অর্থ সংস্থানের উদ্দেশ্যে তহবিল গঠন করার লক্ষ্যে রচিত বিল সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অনুয়ায়ী গৃহীত হোক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

* * * * *

মাননীয় সহ সভাপতি : প্রশ্ন হল:

"দু'নম্বর খণ্ড বিলের অংশ হিসাবে গৃহীত হোক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

দু'নম্বর খণ্ড বিলের সঙ্গে যুক্ত হয়। তিন এবং চার নম্বর খণ্ডগুলি বিলের সঙ্গে যুক্ত হল।

মাননীয় সহ সভাপতি : খণ্ড ৫।

---

* বিধানসভা বিতর্ক (কেন্দ্রীয়), খণ্ড-৫, ১৫ এপ্রিল ১৯৪৬। পৃ: ৪০২৪।

পণ্ডিত মুকুট বিহারি লাল ভার্গব (আজমীর মারওয়ারা : সাধরণ) : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি:

"বিলের ৫ নম্বর খণ্ড ৩(এ) উপখণ্ডের 'তহবিল' শব্দের পরে 'এবং' শব্দের আগে নিম্নলিখিত অংশটি অন্তর্ভুক্ত হোক :—"যেহেতু কোনও অফিসার সূর্য্যাস্ত থেকে সূর্য্যোদয় পর্যন্ত কোনও বেসরকারি আবাস গৃহে প্রবেশের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না এবং যদি সেই আবাস গৃহে মহিলারা থাকেন, গৃহে প্রবেশ সম্পর্কে বাসিন্দাদের যথাযথ নোটিশ দিতে হবে।"

মাননীয় সহ-সভাপতি : মাননীয় সদস্য এই সংশোধনীটির নোটিশ সবেমাত্র দিয়েছেন। তা এখনও সদস্যদের মধ্যে বিতরিত হয়নি।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি এর বিরোধিতা করছি।

মাননীয় সহ-সভাপতি : আমার আশঙ্কা এই সংশোধনীটি খুবই দেরিতে পৌঁছেছে এবং এই পর্যায়ে তার অনুমতি দেওয়া সম্ভব নয়।

অধ্যাপক এন. জি. রঙ্গ : (গুন্টুর এবং নেলোর : অ-মুসলমান গ্রামীন) এতে আপনার কোনও আপত্তি আছে?

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : আমি খুব কঠোর ভাবে এর বিরোধিতা করছি।

মাননীয় সহ-সভাপতি : মাননীয় সদস্য কি ৫ নম্বর খণ্ড সম্বন্ধে বলতে আগ্রহী?

পন্ডিত মুকুট বিহারি লাল ভার্গব : না, স্যার।

মাননীয় সহ-সভাপতি : প্রশ্ন হল:

"৫ এবং ৬ নম্বর খণ্ড বিলের অংশ হিসাবে গণ্য হোক।"

প্রস্তাবটি গৃহীত হল।

৫ এবং ৬ নম্বর খণ্ডগুলি বিলে যুক্ত হল। ১ নম্বর খণ্ড বিলে যুক্ত হল।

শিরোনাম এবং মুখবন্ধ বিলে যুক্ত হল।

মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর : স্যার, আমি প্রস্তাব করছি।

"বিলটি সংশোধনী সহ গৃহীত হোক।"

মাননীয় সহ-সভাপতি : প্রস্তাব পেশ হল:

"সংশোধনী সহ বিলটি গৃহীত হোক।"

□ □ □

৬৮

*বিবিধ : তফসিলি ছাত্রদের জন্য ছাত্রবৃত্তি

তফসিলি জাতের ছাত্রদের শিক্ষাগত এবং অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ব্রিটিশ ভারত নিবাসী এই শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যারা ম্যাট্রিকুলেশন পর্যায়ের পরে বিজ্ঞান বা কারিগরি বিষয়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে চায়, তাদের ১৯৪৬-৪৭ সালে বৃত্তি দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বৃত্তিগুলি কেবলমাত্র ভারতেই দেওয়া হবে। পর্ষদ এ বছর বিদেশে শিক্ষার জন্য কোনও বৃত্তি দেবে না।

পঠন-পাঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণের সমস্ত খরচই বহন করার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে। শর্টহ্যান্ড টাইপিং-এর ক্ষেত্রে কুড়ি টাকা মূল্যের স্বল্পকালীন মেয়াদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

যে সমস্ত শিক্ষাক্রমের জন্য অর্থ অনুদান দেওয়া হবে সেগুলি হল:

(১) বিজ্ঞান সহ ইন্টারমিডিয়েট (২) বি. এস. সি. (পাশ বা সাম্মানিক), (৩) এম. এস. সি. (৪) ইঞ্জিনিয়ারিং (৫) কারিগরি, (৬) ডাক্তারি, (৭) কৃষি, (৮) শিক্ষক প্রশিক্ষণ (৯) শর্টহ্যান্ড এবং টাইপরাইটিং।

ইন্টারমিডিয়েট কলা বিভাগ এবং স্নাতক পর্য্যায়ের কোর্সগুলির ছাত্রীরা এই বৃত্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যদি তারা মুচলেকা দেয় যে তাদের অনুমোদিত কোর্সের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পর তারা টিচার্স ট্রেনিং কোর্স গ্রহণ করবে। তারা যদি সেই শর্ত পালন না করে তবে তাদের বৃত্তির টাকা ফেরত দিতে হবে।

---

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, মার্চ ১৫, ১৯৪৬। পৃ: ৩১০

@ দামোদর উপত্যকা প্রকল্প সম্পর্কে টি. ভি. এ (টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষ) বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষের দু'জন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার রস এম. রিগেল এবং মিস্টার ফ্রেড সি. শ্লেম্মার কেন্দ্রীয় কারিগরি বিদ্যুৎ পর্ষদের মাইথন, অলেয়ার এবং পাঞ্চেত প্রকল্পের ব্যাপারে পরামর্শ দিতে ভারতে এসে পৌঁছেছেন। এগুলি হল দামোদর প্রকল্পের প্রথম তিনটি বাঁধের স্থান, যেগুলির জন্য এখন প্রাথমিক নক্শা এবং খুঁটিনাটি হিসাব নিকেশ করা হচ্ছে। মাইথন প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং নক্শা এখন তুলনামূলকভাবে অগ্রবর্তী পর্যায়ে রয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বেশ কিছু আঞ্চলিক তথ্য এখনও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

চারটি প্রতিবেদন : মিস্টার রিগেল এবং মিস্টার শ্লেম্মারের ভারতে আট সপ্তাহের বেশি থাকার আশা নেই, ওয়াশিংটনে বিদেশ দফতরের অনুমতি নিয়ে, টেনেসি ভ্যালি কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারকে তাদের সেবার সাহায্য দিচ্ছে। দু'জন ভারতীয় বিশিষ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার আশা রয়েছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় যখন, "বেশি খাদ্য ফলাও প্রচারাভিযান"-এর সঙ্গে যুক্ত সেচ প্রকল্পগুলির নির্মাণে ব্যতিক্রমী প্রয়াস চালানো হচ্ছে তখন এই কাজে ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারদের যোগ দেওয়া কঠিন।

এই কর্মীদল চারটি প্রতিবেদন দেবে। দু'টি কেন্দ্রীয় কারিগরি শক্তি পর্ষদকে, এবং তাতে থাকবে যে নক্শা গ্রহণ করা হবে পর্ষদের দেওয়া সেই প্রস্তাবটির খুঁটিয়ে পরীক্ষা এবং বাঁধগুলির নির্মাণ কাজের কর্মসূচি অপর দু'টি রিপোর্ট দেওয়া হবে ভারত সরকারের কাছে তাতে থাকবে বিস্তারিত ভাবে কার্যকর নক্শাগুলি প্রস্তুত করার এবং নির্মাণ কাজের পদ্ধতির বিষয়ে সুপারিশ

*শ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল

শিল্প শ্রমিকদের জন্য কল্যাণমূলক অছি তহবিলের বিষয় নিয়ে শ্রম সদস্য, মাননীয় ড: বি. আর. আম্বেদকরের পৌরোহিত্যে গত ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত স্থায়ী শ্রম কমিটির অষ্টম অধিবেশনে আলোচনা হয়। তহবিলের অর্থের যোগান দেবে কর্তৃপক্ষ কিছু পরিমাণ লভ্যাংশের ভিত্তিতে এবং শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি তার প্রশাসনিক দায়িত্বভার নেবে, এই মর্মে একটি প্রস্তাবের পর্যালোচনা করা হয়। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি সমস্ত শ্রেণীর

@ ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, এপ্রিল ১, ১৯৪৬। পৃ: ৪০৩

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, এপ্রিল ১৫, ১৯৪৬। পৃ: ৪৫২

নিয়োগকর্তার পক্ষে বিধি দ্বারা বাধ্যতামূলক করা উচিত কিনা তা নিয়েও আলোচনা হয়। অন্যান্য যেসব বিষয় নিয়ে কমিটি আলোচনা করে সেগুলি হল অনিয়ন্ত্রিত কারখানাগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আইন কতোটা বাঞ্ছনীয়, বাণিজ্য বিরোধ আইনের সংশোধনী, শিল্পে কতোটা বেকারির দেখা দিতে পারে। ধর্মঘট এবং লক-আউটের সময় কর্ম বিনিময় কেন্দ্রগুলির মনোভাব এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন প্রস্তাবিত খনি শ্রমিকদের সনদ। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির প্রতিনিধি ভারতীয় রাজ্য এবং কর্মী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা ঐ বৈঠকে যোগ দেন। লালা কৃপা নারায়ণ, শ্রী শান্তিলাল মঙ্গলদাস, শ্রী ভগবানদাশ সি. মেহতা, মাননীয় শ্রী এইচ. ডি. টাউনেন্ড এবং রায় বাহাদুর শ্যামানন্দন সহায় নিয়োগকর্তাদের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, এবং শ্রী এন. এম. যোশি, শ্রী এন. ডি. ফাড়কে, শ্রী ভি. এস. করণিক, শ্রী এ. কে. মুখার্জি, শ্রী আর. আর. ভোলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

*শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা : রেগে কমিটির রিপোর্ট

বারোই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪ ভারত সরকার নিযুক্ত শ্রম অনুসন্ধান কমিটি শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে সংগৃহীত সব তথ্য ৩৫টি রিপোর্টের, কুড়ি লক্ষ শব্দে সম্বলিত করেছে। শ্রী ডি. ভি. রেগে, আই. সি. এস. ঐ কমিটির চেয়ারম্যান এবং ড. এস. আর. দেশপাণ্ডে, ড. আহমেদ মুক্তার, এবং অধ্যাপক বি. পি. আদরকর সদস্য। মাননীয় ড. বি. আর. আম্বেদকর-এর কুড়িটি রিপোর্ট, কেন্দ্রীয় আইনসভায় গত ন'ই এপ্রিল পেশ করেন।

কমিটি সংগৃহীত ঐ-সব তথ্য ৩৮টি বাছাই করা শিল্পে শ্রমিকদের বেতন, আয়, নিয়োগ, আবাসন, এবং সামাজিক অবস্থা সম্পর্কিত। ঐ শিল্পগুলি হল, **খনি**—কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, সোনা, অভ্র, লোহা এবং লবণ : **বাগান**—চা, কফি, রবার, **কারখানা**—তুলো, পাট, রেশম, পশম, খনিজ তেল, বন্দরে ইঞ্জিনিয়ারিং, সিমেন্ট, দেশলাই, কাগজ, কার্পেট বোনা, চটশিল্প, চামড়ার কারখানা এবং চর্মশিল্প, চিনামাটির বাসন, ছাপার কারখানা, কাঁচ, রাসায়নিক এবং ওষুধপত্র, চাঁচ-গালা, বিড়ি প্রস্তুতীকরণ, অভ্র, চিনি, তুলো, তুলোর বিজ পৃথক করা এবং সুতোর গুলি প্রস্তুত করা এবং ধানকল। **পরিবহন**—ট্রাম এবং বাস এবং গেজেটভুক্ত নয় এমন রেলকর্মী ; **অন্যান্য ধরন**—বন্দর শ্রমিক, পুরশ্রমিক, কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগ, এবং রিক্সাচালক। আশা করা যায় শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং ভারত সরকারের শ্রম আইনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এর ফলে সাহায্য পাওয়া যাবে।

* ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, এপ্রিল ১৫, ১৯৪৬। পৃ: ৫৬৮

নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি

দেখা গেছে যে শ্রমিকদের সমস্যাগুলির আঞ্চলিক ভিত্তিতে নয় শিল্পের ভিত্তিতে ছড়িয়ে আছে বলে কমিটি সারা ভারত পরিভ্রমণ করে শিল্পের ভিত্তিতে নমুনা সংগ্রহের পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। তাদের কাজের দু'বছরের মধ্যে কমিটির সভাপতি ও সদস্যরা সারা দেশ ঘুরে ৬৫টি শিল্প কেন্দ্র ঘুরেছেন—শ্রীনগর থেকে ত্রিচিনোপল্লি, কোয়েটা থেকে শিলং-এর দূরবর্তী অঞ্চলগুলি ঘুরেছেন। বিভিন্ন বাগান এবং খনি সহ ৫২৮টি কেন্দ্রে সরজোমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিভিন্ন শিল্পের কমপক্ষে ১,৬৩১টি সংস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। শত শত প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নপত্র বিভিন্ন শিল্প সংস্থা, প্রাদেশিক এবং রাজ্য সরকারি অফিসার, মালিক এবং মালিকদের সংগঠনগুলির কাছে বিতরণ করা হয়। কমিটি কি পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করেছে, তার ধারণা পাওয়া যায় একটি তথ্য থেকে। তা হল এই যে, কেবলমাত্র বেতন-সংক্রান্ত আদমশুমারে ৩৪,০৮০টি ফর্ম পাওয়া গেছে।

কমিটি ১৬ জন সুপারভাইজার এবং ৪৫ জন অনুসন্ধানকারীর একটি দল নিযুক্ত করে যারা তদর্থক ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের কাজ করে। এই কর্মীরা কেবলমাত্র বিভিন্ন কেন্দ্রে সরজামিনে তথ্য সংগ্রহের কাজই করেন নি, তারা আরও কিছু সম্ভাব্য ক্ষেত্র থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেন। তাঁদের অনুসন্ধানের সময় তাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে, নিয়োগকর্তা, শ্রমিক অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

নিরীক্ষার জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক কেন্দ্র বেছে নেওয়া হয়, যাতে দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত এক-ই শিল্পের শ্রমিকদের অবস্থার কথা জানা যায়। কোনও সংস্থাকে বেছে নেওয়া হয়েছে সাধারণত তার গুরুত্ব এবং আয়তনে ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে এবং তা বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের আওতায় পড়ে কিনা তার ভিত্তিতে।

প্রধানত শ্রম আইনের সুরক্ষা, বেতন, শ্রমিকদের আয়, কাজের শর্ত, ঋণের বোঝা, বয়স, মৃত্যু সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, কল্যাণমূলক কাজকর্ম এবং সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, ইত্যাদি সম্পর্কে।

কমিটিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে প্রাদেশিক এবং রাজ্য সরকারগুলির স্থানীয় সংস্থা, বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলি।

শ্রম, খনি এবং শক্তি দফতর

শ্রম, খনি এবং শক্তি বিভাগ নিয়ে একটি নতুন দফতর ৮-ই এপ্রিল গঠিত হলে শ্রম দফতরের বিভাজন কার্যকর হয়।

শ্রম, খনি এবং শক্তি দফতরের অধীন হলে কেন্দ্রীয় পূর্ত দফতর কেন্দ্রীয় প্রকল্পের রূপায়ণ, পূর্ত ইঞ্জিনিয়ারিং, খনি এবং খনিজ, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া, প্রধান সেচকার্য, কেন্দ্রীয় জলপথ, সেচ এবং নৌ-চলাচল কমিশন, বিদ্যুৎ এবং স্টেশনারি ও মুদ্রণ।

যেসব বিভাগ শ্রম দফতরের অধীনেই থাকবে সেগুলি হল, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়, শ্রমিক কল্যাণ, শ্রমিক সম্পর্ক এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা শ্রম আইন প্রণয়ন এবং কার্যকর করা, সেনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী এবং মহিলাদের পুনর্বাসন, কারিগরি এবং পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রকল্প, শ্রম আইন এবং সংখ্যাতত্ত্ব, গবেষণা ও অনুসন্ধান।

দু'টি দফতরেরই দায়িত্বে থাকবেন শ্রম সদস্য মাননীয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকর। কয়লা উৎপাদন অবশ্য সাময়িক ভাবে শিল্প এবং সরবরাহ সদস্যের দায়িত্বে থাকবে।

মাননীয় শ্রী এইচ. সি. প্রায়র পূর্ত, খনি এবং শক্তি দফতরের সচিব হবেন এবং শ্রম দফতরের সচিব হবেন শ্রী এস. লাল।

*দামোদর প্রকল্প

পঞ্চান্ন কোটি টাকার দামোদর নদী প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অবিলম্বে শুরু করার সম্ভাবনা দ্রুত খতিয়ে দেখার বিষয়টি ভারত সরকারের শ্রম সদস্য মাননীয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের পৌরহিত্যে এপ্রিলের ২৩ এবং ২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাংলা ও বিহারের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সুপারিশ করা হয়।

বহু উদ্দেশ্যসাধক ঐ প্রকল্পের লক্ষ্য হল, দামোদর এবং তার শাখানদীগুলির বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সারা বছর জলসেচ এবং বিদ্যুতের সুবিধা উপত্যকার ৪০,০০,০০০ লক্ষ মানুষকে যোগান দেওয়া এবং নৌ-চলাচলেরও সুবিধা যোগানো। সমগ্র প্রকল্প আটটি বাঁধ এবং জলাধার নিয়ে গঠিত হবে, যেগুলির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে ৪৭,০০,০০০ একর ফুট জল ধরে রেখে ৮,০০,০০০ একর জমিতে জলসেচ এবং ৩,৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

মাইথন বাঁধ

কেন্দ্রীয় কারিগরি শক্তি পর্ষদের রিপোর্ট পর্যালোচনা করার পর এবং টেনেসি ভ্যালি অথরিটির দুই ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার রস রিগেল এবং ফ্রেড সি. শ্লেন্মার এবং

*ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, জুন ১, ১৯৪৬। পৃঃ ৬৮২

তাদের সহযোগী রায় বাহাদুর এ. এন. খোসলা এবং মহিশূর রাজ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এম নরসিমহাইয়ার রিপোর্ট পাবার পর সম্মেলন, সম্পূর্ণ প্রকল্পটি যতো দ্রুত সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। দামোদরের শাখানদী বরাকরের ওপর তিলাইয়া (কোডারমার কাছে) এবং মাইথন, মূল নদীর সঙ্গে সঙ্গম স্থলে ঠিক ওপরে বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব সম্মেলন গ্রহণ করে।

সম্মেলন অবশ্য মনে করে, বৃহত্তর মাইথন বাঁধটির নির্মাণ কাজ শুরুর সময় ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত একমাত্র বিকল্প হিসাবে পেছিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ বাংলা ও বিহার সরকার উভয়ের পক্ষেই, ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারদের সঙ্গে চুক্তি করার ব্যাপারে নিশ্চিত দায়িত্ব গ্রহণ যথেষ্ট সময়াভাবে সম্ভবপর নয়, ১৯৪৬-এর অক্টোবরে শুরু করতে হলে যা এখনই করা উচিত। এই পেছিয়ে দেওয়ার ফলে অবশ্য, মাঝ-বরাকর এলাকায় আর একটি জলাধার নির্মাণের পরিবর্তে মাইথন বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রস্তাবটি খুঁটিয়ে বিবেচনা করার সময় পাওয়া যাবে।

তিলাইয়া বাঁধের কাজ শুরু করার ব্যাপারে অবশ্য প্রতিবন্ধকতা অনেক কম বলে মনে হয়। এর দ্রুত নির্মাণ শুধুমাত্র সেচের জলের যোগান-ই দেবে না এবং পুনর্বাসন সমস্যার সমাধনের সুবিধে করে দেবে না, তা মাইথন বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিও যোগাবে। অতএব সম্মেলন অন্যান্য বাঁধগুলির আগে তিলাইয়া বাঁধের কাজ শুরুর সম্ভাবনার দ্রুত অনুসন্ধানের পরামর্শ দেয়।

বাংলা এবং বিহার সরকারের প্রতিনিধিরা বলেন যে, তাঁদের সরকার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে পারবেন না এবং এই জন্য তাঁরা প্রকল্পের কাজ রূপায়ণের উদ্দেশ্যে একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের পরামর্শ দেন। ভারত সরকার বলেন যে, ওড়িশার রাজ্যপালের প্রাক্তন পরামর্শদাতা শ্রী বি. কে. গোখেলকে প্রশাসনিক দিকটি দেখার জন্য নিযুক্ত করার প্রস্তাব করছেন এবং ছ'মাসের মধ্যে দামোদর উপত্যকা কর্তৃপক্ষের জন্য একটি প্রকল্প রচনা করতে বলছেন।

অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ

জলাধার নির্মাণের জন্য অধিগৃহীত জমির জন্য সম্পূর্ণ এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেই ক্ষতিপূরণ যতোটা সম্ভব টাকার পরিবর্তে বস্তুর সাহায্যে দেওয়া উচিত—জমির বদলে জমি। প্রশাসনের দায়িত্ব প্রাপ্ত অফিসার পুনর্বাসনের একটি বিস্তারিত প্রকল্প রচনা করবেন যাতে যাদের জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে তারা যতোটা স্বাচ্ছন্দে তাদের পুরোনো জমিতে তাদের জীবন নির্বাহ করতেন, নতুন জমিতে অন্ততপক্ষে যেনে ততটাই স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারেন।

সম্মেলন এ বিষয়ে সম্মত হয় যে, অনুসন্ধান এবং জরিপের কাজের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ভাগ করে নেওয়া হবে। সাধারণ তদারকির কাজ হবে কেন্দ্রীয় কারিগরী শক্তি পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এবং জলসেচ ও নৌ-চলাচলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় জলপথ, জলসেচ এবং নৌ-চলাচল কমিশনের তত্ত্বাবধানে।

*তফসিলি জাত এবং কেন্দ্রীয় চাকুরি

ভারতের গেজেট-এ ১৫ই জুন, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারত সরকার তফসিলি জাতের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ৮$\frac{১}{৩}$ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১২$\frac{১}{২}$ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যাতে জনসংখ্যার অনুপাতের সঙ্গে তা সঙ্গতিসূচক হয়।

১৯৪৩ সালের ১১-ই অগাস্টের প্রস্তাবের চার নম্বর অনুচ্ছেদের নিয়ম (১) এবং (২) সেই অনুসারে নিম্নে বর্ণিত ভাবে সংশোধিত হলঃ—

"(১) কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব শূন্যপদ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতীয়দের সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে, সেই সকল শূন্য পদের ১২.৫ শতাংশ পদ তফসিলি জাতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।"

"(২) যেসব চাকুরিতে স্থানীয় এলাকা বা আঞ্চলিক বিভাগ নিয়োগ করে এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে করে না, যথা—রেলওয়ে, ডাক ও তার বিভাগ, শুল্ক বিভাগের চাকরি, আয়কর বিভাগ ইত্যাদির অধ্যস্তন পদে সেই সব ক্ষেত্রে তফসিলি জাতের জন্য সর্বমোট ১২.৫ শতাংশ সংরক্ষণ পেতে হলে প্রতি স্থানীয় বা আঞ্চলিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত এবং সংশ্লিষ্ট স্থান বা অঞ্চলের প্রাদেশিক সরকারে চাকুরিতে নিয়োগের নিয়মের ভিত্তিতে তফসিলি জাতের অনুপাত নির্দিষ্ট করতে হবে।"

□ □ □

*ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন, জুলাই ১৫, ১৯৪৬। পৃ: ৩৪

আম্বেদকর রচনা-সম্ভার : অষ্টাদশ খণ্ড

অনুবাদে

- দেবাশিস সেনগুপ্ত : প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।
- ড. সজল বসু : প্রাক্তন ফেলো, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ অ্যাডভান্স স্টাডি, সিমলা ; সিনিয়র ফেলো, ভারতীয় সমাজ-বিজ্ঞান পর্ষদ্ ; বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।
- সন্তোষ দেবনাথ : ইন্ডিয়ান ইনফরমেশন সার্ভিসের সদস্য ; ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক ; বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা সম্পাদক ; কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।
- সত্যজিৎ দত্ত : কলকাতা দূরদর্শনের বার্তা বিভাগের সহ-সম্পাদক ; প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক।

অনুমোদনে

- আশিস সান্যাল : কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, শিশু সাহিত্যিক ও অনুবাদক। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় বহু গ্রন্থের রচয়িতা। বহু সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন এবং বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন।

নির্ঘণ্ট